জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের
শহীদ স্মারক

২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

চতুর্থ খণ্ড

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

স্বাধীনতা এনেছি
সংস্কারও আনবো
আকাশের মতো বাঁধাহী

দ্বিতীয় স্বাধীনতার শহীদ যারা

জুলাই-২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

সম্পদ ও সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ প্রিয় বাংলাদেশ বিগত সাড়ে ১৫ বছরেরও বেশি সময় ফ্যাসিবাদী শাসনের নিপীড়নে জর্জরিত ছিল। দুঃসহ এই পরিস্থিতি থেকে জাতিকে মুক্ত করে জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এ ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান। এ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ রাজপথে নেমে আসে। আন্দোলন স্তব্ধ করতে নির্বিচারে গুলি চালানোর আদেশ দেন ফ্যাসিস্ট সরকারের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরই জেরে শত শত ছাত্র ও নানা পেশার মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১০ হাজারের বেশি মানুষ কোনো না কোনো অঙ্গহানির শিকার হয়েছেন। নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে কোনো সরকারের এভাবে নির্বিচারে হত্যাকান্ড ঘটানোর দৃষ্টান্ত যেমন নজিরবিহীন, তেমনি ফ্যাসিবাদ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা যে সাহসী ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে এমন কোনো নজির বিশ্বে বিরল। এই প্রেক্ষাপটে ছাত্র-জনতার এই অবিশ্বাস্য ত্যাগ ও কুরবানিগুলো তথ্য আকারে সংগ্রহে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

এই বাস্তবতায়, জুলাই-আগষ্ট মাসের গণঅভ্যুত্থানে দেশের বিভিন্ন জেলায় শাহাদত বরণকারী ভাই-বোনদের তথ্য নিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'র উদ্যোগে দশ খন্ডে "দ্বিতীয় স্বাধীনতার শহীদ যারা" শীর্ষক এই স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকগণ মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, প্রয়োজনীয় ডিজাইনসহ সম্পাদনা করেছেন এবং ছাপার কাজ সম্পন্ন করেছেন, তাদের সকলের পরিশ্রম ও সময়দান আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন।

সময়কে ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে আমরা কিছুটা তাড়াহুড়ো করেই কাজটি করেছি। তাই মুদ্রণ সংক্রান্ত ক্রটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। পরবর্তী সংস্করণে আপনাদের পরামর্শ ও মতামতের আলোকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংযোজিত হবে। এখানে আরো একটি সীমাবদ্ধতাও প্রসঙ্গত স্বীকার করা প্রয়োজন। আমরা যখন পুস্তকাকারে এই বইটি প্রকাশ করছি, তখনও জুলাই বিপ্লবের শহীদের তালিকা দীর্ঘতর হচ্ছে। যারা আহত ছিলেন তাদের অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করায় তারা আহতের তালিকা থেকে এখন শহীদের তালিকায় চলে আসছেন। এ তালিকা সামনের দিনে আরো দীর্ঘ হবে বলে আমাদের আশংকা। কেননা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বেশ কিছু আহতের অবস্থা এখনো আশংকাজনক। তাই আগামীতেও বইটির কলেবর ও তথ্য স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তিত হতে পারে।

দেশকে ফ্যাসিবাদের কালো থাবা থেকে মুক্ত করার জন্য; দেশের মানুষগুলোকে মুক্ত পরিবেশে নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করলেন আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। যারা আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন আল্লাহ তাদের দ্রুত সুস্থতা দান করুন। আমিন।

বাংলাদেশ
জামায়াতে ইসলামী

আমীরে জামায়াতের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি সোনার বাংলাদেশ বিগত প্রায় দুই দশক ধরে আইনের শাসন, সুশাসন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের সাথে প্রতারণা করে একটি সমঝোতার নির্বাচন করে ক্ষমতায় আসে ২০০৮ সালে। এরপর থেকেই তারা পরিকল্পিতভাবে দেশকে বিরাজনীতিকরণ ও বিরোধীমতশূণ্য করার অপপ্রয়াস শুরু করে।

বিগত ১৫ বছরের আওয়ামী দুঃশাসনে ভিন্নমতের মানুষগুলোকে অসহনীয় নির্যাতন করে দমন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড, রিমান্ডের নামে অত্যাচার, ক্রসফায়ার, বিতর্কিত বিচারের মাধ্যমে বিরোধী নেতাদের হত্যা, গুম, খুন, আয়নাঘর, অপহরণ, বাক স্বাধীনতা হরণ, সভা-সমাবেশের অধিকার কেড়ে নেওয়া, বিরোধী দলগুলোর অফিস অবরুদ্ধ করা, রাষ্ট্রীয়ভাবে নাগরিকদের কোণঠাসা করা কিংবা আইন সংশোধন করে ভিন্নমতের মানুষগুলোকে বিচারের মুখোমুখি করার মাধ্যমে পুরো বাংলাদেশ জুড়ে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতি তৈরি করে রাখা হয়েছিল। পাশাপাশি, আলেম-ওলামাসহ সমাজের শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোর চরিত্রহনন, দেশকে একদলীয় কায়দায় শাসন, বিদেশে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার, দেশের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস বা দুর্বল করার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ এই অন্যায্য কর্মকান্ডগুলো বাস্তবায়ন করেছে। এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ অন্য সব বিরোধী দল সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদ ও আন্দোলন করেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় জামায়াতের শীর্ষ ১১ নেতাকে হত্যা করা হয়েছে।

তিনটি প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে জোরপূর্বক ক্ষমতা ধরে রেখেছে। নিজেদের দুর্নীতি ও অনাচার আড়াল করার জন্য ক্ষমতা ধরে রাখার কোনো বিকল্পও তাদের সামনে ছিল না। আর সে কারণেই জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেও তারা কার্পণ্য করেনি। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসেই বিডিআর বিদ্রোহের নামে দেশপ্রেমিক ৫৭ জন সেনা অফিসারকে হত্যা করেছিল। ট্রাইবুনালে আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে রায়কে কেন্দ্র করে জনঅসন্তোষ দমাতে সারা দেশে গুলি করে একই দিনে দুশোরও বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। ২০১৩ সালের ৫ মে ঢাকার শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের ওপর আওয়ামী সরকার গণহত্যা চালিয়েছিল। এর বাইরে পুরো ১৫ বছর জুড়ে নিয়মিতভাবেই দেশজুড়ে তাদের হত্যা, অপহরণ ও ক্রসফায়ার চলমান ছিল।

দেশের মানুষ আওয়ামী অনাচারের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বারবার। কিন্তু আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকার অত্যন্ত নির্মমভাবে জনগণের সেই স্বতঃস্ফুর্ত আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে চেয়েছে। এভাবেই সময়ের চাকার আবর্তনে ২০২৪

সাল আমাদের মাঝে উপনীত হয়। এ বছরের একদম ২০২৪-এর শুরুর দিকে আওয়ামী লীগ বিতর্কিত ডামি নির্বাচন সম্পন্ন করে চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় আসে। তারা ধরেই নিয়েছিল স্বঘোষিত ভিশন অনুযায়ী ২০৪১ সাল পর্যন্ত এভাবেই তারা মসনদে থেকে যাবে।

কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নামে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে শুরু হয় ছাত্র আন্দোলন। প্রাথমিক অবস্থায় সরকারি চাকুরিতে কোটা পদ্ধতির সংস্কারের দাবিতেই শুরু হয়েছিল এ আন্দোলন। কিন্তু সরকার বরাবরের মতোই দমন পীড়নের মাধ্যমে এই আন্দোলনটিও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। তারা ছাত্রলীগের গুন্ডাদের দিয়ে ক্যাম্পাসগুলো থেকে আন্দোলনকারীদের বিতাড়িত করে। আর পুলিশ, র‍্যাব ও আইন শৃংখলা বাহিনী দিয়ে নির্বিচারে আন্দোলনরত ছাত্রজনতার ওপর গুলি বর্ষণ করে। এতে শতশত মানুষ নিহত হয় আর আহত হয় ২৫ হাজারের বেশি মানুষ। অঙ্গহানি হয় ১০ হাজারের বেশি মানুষের।

এত রক্ত, এত লাশ এই জনপদ কোনো আন্দোলনের ইতিহাসে আর দেখেনি। নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে একটি সরকার যেভাবে গুলি করেছে, নির্যাতন করেছে, লাশ পুড়িয়ে আলামত গায়েব করেছে তেমনটা অনেক যুদ্ধাক্রান্ত দেশেও দেখা যায় না। শেখ হাসিনার সরাসরি হুকুমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো দলীয় কর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ন হয়ে নির্যাতন অব্যাহত রাখে এবং "দেখামাত্র গুলি" নীতি প্রয়োগ করতে থাকে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, সরকারদলীয় মিডিয়াগুলো এই অমানবিক কার্যক্রমের তথ্য ও ছবি আড়াল করে যায়। সরকারের পোষ্য এ মিডিয়াগুলো বরং সরকারি বয়ানের আলোকে কথিত স্থাপনা ধ্বংসের ছবি ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে মায়াকান্না দেখায়। ফলে, এই জুলুম ও জুলুমের ভিকটিমদের দুর্বিষহ নির্যাতনের বিবরণীগুলো মূলধারার অনেক মিডিয়াতেই পাওয়া যায়নি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেই কেবল এই ফুটেজ ও বর্বরতার দৃশ্যগুলো মানুষ দেখার সুযোগ পেয়েছে। যদিও দফায় দফায় ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের মাধ্যমে সরকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওপরও খড়গ চাপিয়ে দিয়েছিল।

এই বাস্তবতায় জুলাই বিপ্লবের শহীদ ও আহতদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আমরা একটি সংকলন বের করার সিদ্ধান্ত নেই। যেহেতু এসব তথ্য ও ছবি অনেক গণমাধ্যমই আন্দোলন চলাকালীন সময়ে এড়িয়ে গিয়েছে, তাই আমাদেরকে পৃথক টিম ও দল তৈরি করে তৃণমূল পর্যায়ে প্রেরণ করার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। এরপরও সাংগঠনিক দিকনির্দেশনার আলোকে আমাদের নেতাকর্মীরা সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে এবং কষ্ট সহ্য করে ৩৬ জুলাই'র আত্মত্যাগের ঘটনাগুলো পুস্তকবন্দী করার উদ্যোগ নিয়েছে। সমগ্র বিশ্বকে এই আওয়ামী সরকারের শেষ সময়ের এই হত্যাকান্ড ও জুলুম সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে অবহিত করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এ সংকলনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে মুদ্রণ সংক্রান্ত কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। সময় ও সুযোগের অপর্যাপ্ততার কারণে অনেক তথ্য সন্নিবেশিত করাও সম্ভব হয়নি। আশা করি, এই বইয়ের মধ্য দিয়ে সংকলিত বিষয়গুলো জানার পাশাপাশি শহীদ, আহত-পঙ্গু, নির্যাতিত ও কারারুদ্ধ ভাই-বোনদের এবং তাদের পরিবারের কল্যাণে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকলেই এগিয়ে আসবেন।

আল্লাহ আমাদের সমস্ত নেক আমল ও দোয়া কবুল করুন। আমাদের ছাত্র-ছাত্রী ও জনতার কুরবানিকে আল্লাহ কবুল করুন। এত ত্যাগের বিনিময়ে যে দুঃশাসন বিদায় নিয়েছে, তা যেন আবার ভিন্ন কোনো মোড়কে ফিরে না আসে। সকলে একতাবদ্ধ থেকে যেন আমরা দেশ ও জাতিকে সব ধরনের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করতে পারি। এত ত্যাগের বিনিময়ে আসা 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' সফল ও স্বার্থক হোক। আমিন।

ডা. শফিকুর রহমান
আমীর
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
২০২	শহীদ মো: সাগর আহম্মেদ ৪র্থ খন্ড (ঢাকা বিভাগ)	৭-১০
২০৩	শহীদ মো: সিরাজুল বেপারী	১১-১৪
২০৪	শহীদ সামচু মোল্যা	১৫-১৭
২০৫	শহীদ মুহাম্মদ জান শরিফ (মিঠু)	১৮-২০
২০৬	শহীদ মো: কামরুল ইসলাম সেতু	২১-২৩
২০৭	শহীদ মো: রিয়াজ হোসেন	২৪-২৬
২০৮	শহীদ মো: আব্দুল আহাদ	২৭-২৯
২০৯	শহীদ তামিম শিকদার	৩০-৩২
২১০	মো: মঈনুল ইসলাম	৩৩-৩৫
২১১	শহীদ সাবিদ হোসেন	৩৬-৩৮
২১২	শহীদ বাবু মোল্লা	৩৯-৪১
২১৩	শহীদ দীপ্ত দে	৫২-৪৪
২১৪	শহীদ মো: মনিরুজ্জামান মোল্যা	৪৫-৪৮
২১৫	শহীদ মামুন সরদার	৪৯-৫১
২১৬	শহীদ ইসমাইল হোসেন রাব্বি	৫২-৫৫
২১৭	শহীদ মো: রফিকুল ইসলাম	৫৬-৫৮
২১৮	শহীদ রুমান বেপারী	৫৯-৬১
২১৯	শহীদ হাসিবুর রহমান	৬২-৬৪
২২০	শহীদ তাওহীদ সন্যামাত	৬৫-৬৮
২২১	শহীদ সোবাহান মুন্সী	৬৯-৭১
২২২	শহীদ মো: আল আমিন	৭২-৭৪
২২৩	শহীদ বাঁধন	৭৫-৭৭
২২৪	শহীদ মো: রিয়াজুল তালুকদার	৭৮-৭৯
২২৫	শহীদ মো: জুনায়েত হোসেন	৮০-৮১
২২৬	শহীদ মামুন মিয়া	৮২-৮৩
২২৭	শহীদ মো: মনোয়ার হোসেন	৮৪-৮৬
২২৮	শহীদ মো: দুলাল	৮৭-৮৯
২২৯	শহীদ আশরাফুল হাওলাদার	৯০-৯২
২৩০	শহীদ তাহমিদ ভুঁইয়া	৯৩-৯৬
২৩১	শহীদ মো: জোনায়েদ	৯৭-১০০
২৩২	শহীদ মো: আযিযুল মিয়া	১০১-১০৩
২৩৩	শহীদ ডা: সজিব সরকার	১০৪-১০৬
২৩৪	শহীদ মো: সিয়াম	১০৭-১১০
২৩৫	শহীদ মো: সুজন মিয়া	১১১-১১৩
২৩৬	শহীদ তামিন হৃদয়	১১৪-১১৬
২৩৭	শহীদ মো: সুজন মিয়া	১১৭-১১৯
২৩৮	শহীদ আনোয়ার মিয়া	১২০-১২১

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
২৩৯	শহীদ আরমান মোল্লা	১২২-১২৩
২৪০	শহীদ মো: রাছেল মিয়া	১২৪-১২৬
২৪১	শহীদ মো: লাল মিয়া	১২৭-১২৯
২৪২	শহীদ মারুফ মিয়া	১৩০-১৩১
২৪৩	শহীদ একরামুল হক সাজিদ	১৩২-১৩৪
২৪৪	শহীদ মো: ইমন	১৩৫-১৩৭
২৪৫	শহীদ হাফেজ সাদিক	১৩৮-১৩৯
২৪৬	শহীদ ফিরোজ তালুকদার	১৪০-১৪১
২৪৭	শহীদ আহনাফ আবীর আশরাফুল্লাহ	১৪২-১৪৩
২৪৮	শহীদ সাজ্জাদ হোসেন সজল	১৪৪-১৪৭
২৪৯	শহীদ শেখ জাহাঙ্গীর আলম	১৪৮-১৫০
২৫০	শহীদ মিরাজুল ইসলাম অর্ণব	১৫১-১৫৪
২৫১	শহীদ আরাফাত মুন্সি	১৫৫-১৫৮
২৫২	শহীদ গনি মিয়া	১৫৯-১৬১
২৫৩	শহীদ মোবারক	১৬৩-১৬৫
২৫৪	শহীদ মো: রাসেল গাজী	১৬৬-১৬৮
২৫৫	শহীদ মো: মিঠু বিশ্বাস মারুফ	১৬৯-১৭১
২৫৬	শহীদ নাফিসা হোসেন মারওয়া	১৭২-১৭৯
২৫৭	শহীদ মেহেদী হাসান	১৮০-১৮২
২৫৮	শহীদ নাজমুল মিয়া	১৮৩-১৮৫
	(রাজশাহী বিভাগ)	
২৫৯	শহীদ মো: শাখিল আনোয়ার	১৮৬-১৮৯
২৬০	শহীদ মো: বিপ্লব মন্ডল	১৯০-১৯২
২৬১	শহীদ মো: মাহফুজ আলম শ্রাবণ	১৯৩-১৯৬
২৬২	শহীদ মো: রাসেল রানা	১৯৭-২০০
২৬৩	শহীদ আস সবুর	২০১-২০৪
২৬৪	শহীদ মো: বায়েজিদ বোস্তামী	২০৫-২০৯
২৬৫	শহীদ মো: রায়হান আলী	২১০-২১৩
২৬৬	শহীদ মো: তারিক হোসেন	২১৪-২১৮
২৬৭	শহীদ মো: মিনারুল ইসলাম	২১৯-২২৩
২৬৮	শহীদ মো: সাকিব আনজুম	২২৪-২২৭
২৬৯	শহীদ মো: রায়হান আলী	২২৮-২৩২
২৭০	শহীদ সাইফুল ইসলাম আলিফ	২৩৩-২৩৫
২৭১	শহীদ রেজাউল হক সরকার	২৩৬-২৩৮
২৭২	শহীদ মো: মাহবুব হাসান নিলয়	২৩৯-২৪১
২৭৩	শহীদ জুলকার নাইন	২৪২-২৪৪
২৭৪	শহীদ মো: খোকন সরদার	২৪৫-২৪৮

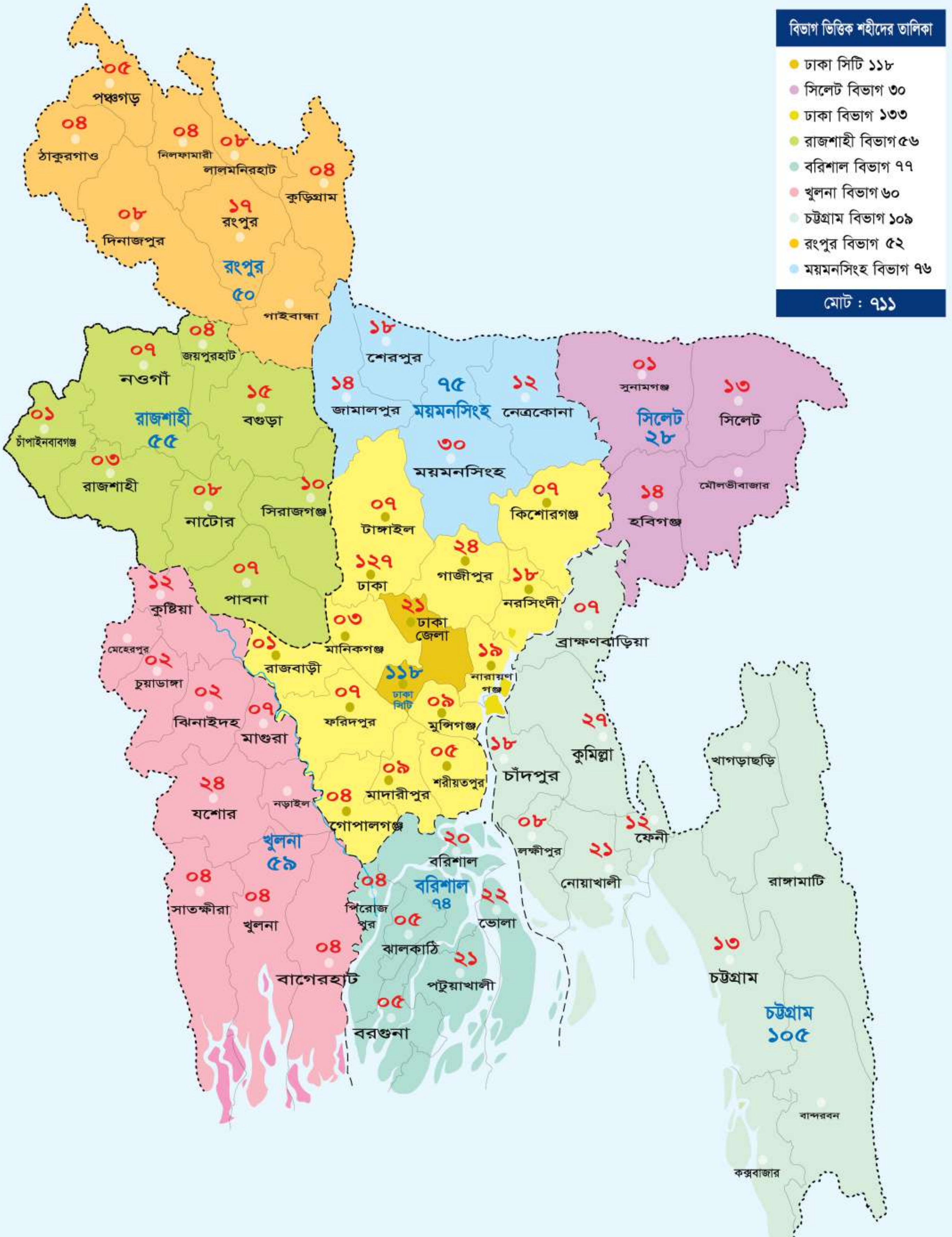
বিভাগ ভিত্তিক শহীদের তালিকা
ঢাকা সিটি ১১৮
সিলেট বিভাগ ৩০
ঢাকা বিভাগ ১৩৩
রাজশাহী বিভাগ ৫৬
বরিশাল বিভাগ ৭৭
খুলনা বিভাগ ৬০
চট্টগ্রাম বিভাগ ১০৯
রংপুর বিভাগ ৫২
ময়মনসিংহ বিভাগ ৭৬
মোট : ৭১১
০৫ পঞ্চগড়
০৪ ঠাকুরগাও
০৪ নিলফামারী
০৮ লালমনিরহাট
০৪ কুড়িগ্রাম
০৮ দিনাজপুর
১৭ রংপুর
রংপুর ৫০
গাইবান্ধা
০৪ জয়পুরহাট
০৭ নওগাঁ
১৫ বগুড়া
০১ চাঁপাইনবাবগঞ্জ
রাজশাহী ৫৫
০৩ রাজশাহী
০৮ নাটোর
১০ সিরাজগঞ্জ
০৭ পাবনা
১৮ শেরপুর
১৪ জামালপুর
৭৫ ময়মনসিংহ
১২ নেত্রকোনা
৩০ ময়মনসিংহ
০১ সুনামগঞ্জ
১৩ সিলেট
সিলেট ২৮
মৌলভীবাজার
১৪ হবিগঞ্জ
০৭ টাঙ্গাইল
০৭ কিশোরগঞ্জ
২৪ গাজীপুর
১২৭ ঢাকা
১৮ নরসিংদী
২১ ঢাকা জেলা
০৩ মানিকগঞ্জ
০১ রাজবাড়ী
১৯ নারায়ণগঞ্জ
১১৮ ঢাকা সিটি
০৭ ফরিদপুর
০৯ মুন্সিগঞ্জ
০৫ শরীয়তপুর
০৯ মাদারীপুর
০৪ গোপালগঞ্জ
০৭ ব্রাহ্মণবাড়িয়া
২৭ কুমিল্লা
১৮ চাঁদপুর
খাগড়াছড়ি
০৮ লক্ষীপুর
১২ ফেনী
২১ নোয়াখালী
রাঙ্গামাটি
১৩ চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম ১০৫
বান্দরবন
কক্সবাজার
১২ কুষ্টিয়া
মেহেরপুর
০২ চুয়াডাঙ্গা
০২ ঝিনাইদহ
০৭ মাগুরা
২৪ যশোর
নড়াইল
খুলনা ৫৯
০৪ সাতক্ষীরা
০৪ খুলনা
০৪ বাগেরহাট
২০ বরিশাল
০৪ পিরোজপুর
বরিশাল ৭৪
২২ ভোলা
০৫ ঝালকাঠি
২১ পটুয়াখালী
০৫ বরগুনা

শহীদ মো: সাগর আহম্মেদ

ক্রমিক : ২০২

আইডি : ঢাকা বিভাগ ৭০

পরিচিতি

শহীদ মো: সাগর আহমেদ ২০০৩ সালের ১২ ডিসেম্বরে রাজবাড়ি জেলার বালিয়াকান্দি থানার অন্তর্গত বিলটাক পুড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মো: তোফাজ্জেল হোসেন এবং মাতার নাম মোছাম্মদ গোলাপী বেগম। গ্রামের সবার কাছে সাগর আহমেদ ছিল একজন আদর্শবান ছেলে। ছোটবেলা থেকেই সৎ চরিত্রবান এবং মেধাবী ছেলে হিসেবে পরিচিত ছিলেন সবার কাছে। লিয়াকত আলী স্মৃতি স্কুল এন্ড কলেজে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন তিনি। এরই মাঝে সকল শিক্ষকের মন জয় করে নিয়েছেন সাগর আহমেদ। এসএসসি পরীক্ষার বিদায় নেয়ার সময় সকল শিক্ষক তার জন্য দোয়া করেছিল। রাজবাড়ি সরকারি কলেজের শিক্ষকরা তাকে অত্যন্ত ভালো ছাত্র হিসেবে চিনতো। ঢাকা মিরপুর বাংলা কলেজে পড়ালেখার পাশাপাশি তিনি একটি হোটেলে কাজ করতেন। যেন কৃষক বাবার কাছ থেকে লেখাপড়ার খরচ না নেওয়া লাগে। সাগর আহমেদ ছোটবেলা থেকেই ন্যায়ের পথে চলায় দৃঢ়সংকল্প। অবশেষে ন্যায়ের পথে থেকেই তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। ঐ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ১৯ জুলাই ২০২৪ সালের সন্ধ্যায় তিনি ফ্যাসিবাদী আওয়ামীলীগ সরকারের গুণ্ডা পুলিশ বাহিনীর গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন।

শহীদ সাগর আহম্মেদের বন্ধুর মাধ্যমে তার শাহাদাতের বৃত্তান্ত বর্ণনা

সাগর আহমেদ ঢাকা বাংলা কলেজে পড়ালেখার পাশাপাশি একটি খাবার হোটেলে কাজ করতেন। পরিবারকে না জানিয়েই তিনি হোটেলে কাজ করতেন। শহীদ সাগর আহম্মেদ মনে করেছিলেন পরিবার জানলে দুঃখ পাবে তাই তিনি পরিবারকে না জানিয়েই কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রতিমাসে দরিদ্র কৃষক বাবার কাছ থেকে লেখাপড়ার খরচ বাবদ কয়েক হাজার টাকা নিতে হতো। এতে করে বাবা অনেক কষ্ট পেত এবং পরিবার অনেক সময় অর্থনৈতিক ঋণের ভিতর জড়িয়ে যেত। তাই তিনি হোটেলে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন, যেন নিজের খরচ নিজেই জোগাড় করতে পারেন। অনেকদিন পর সাগর আহম্মেদ বাড়িতে গেলেন। তার পিতা তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন সাগর একটা সত্য কথা বলবে বাবা? সাগর আহমেদ বললেন অবশ্যই বলব সত্য কথা কেন বলবো না। আমি কি কোনদিন মিথ্যা কথা বলেছি বাবা? সাগরের বাবা বলল তুমি অনেক শুকিয়ে গেছ তোমার শরীর অনেক চিকন হয়ে গেছে তুমি ঢাকাতে কি কর শুধু লেখাপড়া করলে তো শরীর-স্বাস্থ্য এরকম হওয়ার কথা না। সাগর অনেকটা লজ্জায় পড়ে গেল এবং চোখ দিয়ে পানি বের করে বলল বাবা আমি লেখাপড়ার পাশাপাশি হোটেলে কাজ করি এবং বাসায় যেতে অনেক রাত হয় তাই শরীর এরকম হয়ে গেছে। তার পরিবার হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো এবং বলল কাজ না করলে হয় না তুমি কাজ করে তোমার শরীর নষ্ট করে ফেলেছ এটা আমাদের জন্য কষ্টকর। জবাবে সে বলল আমি কাজ করি শুধু আমার জন্য নয় অনেক মানুষের জন্য। যেমন হোটেলে কাজ করে ফেরার পথে হোটেলের বেঁচে যাওয়া খাবার আমি প্যাকেটে করে নিয়ে যাই এবং সেই খাবার ঢাকা শহরের ফুটপাতে থাকা বিভিন্ন গরিব দুঃখী মানুষদের খাওয়াই। এতে আমার অনেক আনন্দ হয়। বাবা বললেন তোমার যা ভালো লাগে তুমি তাই কর তবে নিজের দিকে খেয়াল রেখো। ১৯ জুলাই ২০২৪ আসরের নামাজের পর সাগর আহম্মেদের বাবা সাগরকে ফোন দেয় খোঁজখবর নেয়। তাঁর বাবা ফোন দিয়ে বলে কেমন আছ সাগর। আন্দোলনের কি অবস্থা ঢাকাতে। সাগর বলে বাবা আন্দোলনের অবস্থা ভালো আজকে আমরা যে জায়গায় আছি এখানে চারজন মারা গেছে এখন পর্যন্ত। সাগরের বাবা তাকে সাবধানে থাকতে বলেন। সাগর আহমেদ বৈষমবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে তার ছবি এবং ভিডিও পাওয়া যায় ছাত্রদের সাথে। তিনি প্রতিটা সময় আন্দোলনের সামনের সারিতে থাকতেন।

সাগর আহমেদ ১৯ জুলাই ২০২৪ জুম্মার পর দুপুর ৩ টায় মিরপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলে তার এক বন্ধুর সাথে অংশগ্রহণ করেন। আন্দোলনে কর্মসূচির এক পর্যায়ে সাগর আহম্মেদ সামনের সারিতে চলে যায়। সাগর আহম্মেদ সাধারণ ছাত্র-জনতার অনেক সামনে এগিয়েছিল। অনেকটা শহীদ আবু সাঈদের মতই ঘটনা ঘটেছিল সাগর আহম্মেদের। তিনি সাহসিকতার সাথে আন্দোলনকারীদের সামনে থেকে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। সন্ধ্যা ৫:৫০ টার দিকে মিরপুর ১০ আজমল হসপিটাল এর সামনে আন্দোলন চলতে থাকে। সশস্ত্র পুলিশ আওয়ামীলীগের বিপরীতে নিরস্ত্র সাধারণ ছাত্র-জনতা ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলে। পুলিশ বৃষ্টির মত গুলি করতে থাকে এদিক ওদিকে। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন দিকে ছুটোছুটি করতে থাকে। রাস্তায় কয়েক জন ছাত্র আহত হয়ে পড়ে থাকে। আহতদের সহযোগিতা করার জন্য কারো এগিয়ে যাওয়ার সাহস হচ্ছে না। সাগর আহম্মেদ এবং আরো কয়েকজন আন্দোলনকারী আহতদের সহযোগিতায় এগিয়ে গেল। সকল ভয়ভীতি দূর করে আন্দোলন অব্যাহত রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে সকলেই। একপর্যায়ে বিবেকহীন পশু সমতুল্য পুলিশ অতর্কিত গুলি চালায় নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের উপর। সন্ধ্যা ৬ টার দিকে সাগর আহম্মেদ আন্দোলনরত অবস্থায় বুকের বাম পাশে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তৎক্ষণাৎ তাকে পার্শ্ববর্তী মিরপুর আজমল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্মরত ডাক্তার তাকে ঢাকা সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। পরবর্তীতে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেলে যাওয়ার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তারপরেও সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। নিকটস্থ কেউ না থাকায় অনেক লাশের ভিতর সে হারিয়ে যায়। অবশেষে লাশের স্তুপ এর মধ্য থেকে তার পিতা তার পাঞ্জাবি দেখে তাকে সনাক্ত করতে পারেন। যে ছেলে ঢাকায় এসেছিল অনেক বড় স্বপ্ন নিয়ে সেই ছেলে এখন বাড়িতে ফিরে গেলেন আরও বড় স্বপ্ন পূরণ করে শাহাদাতের মর্যাদা নিয়ে। তারপরেও পিতা-মাতার কষ্ট থেকেই যায়।

শহীদ সাগর আহম্মেদের পিতার বক্তব্য

সাগর ছিল আমার একমাত্র ছেলে। সে ছাড়া আমি কিভাবে বাঁচবো। আমার একটা মেয়ে আছে মেয়েকে বিয়ে দিলে আমার পরিবার ফাঁকা হয়ে যাবে। আমার সবচেয়ে বড় কষ্ট এজন্যই যে আমার ছেলে ছিল সমাজের সবচাইতে ভালো ছেলে। গ্রামের সবাই তাকে ভালো ছেলে বলে চিনতো। নামাজ রোজা সহ সকল ভাল কাজ সে সবসময় করত। এলাকার কারো রক্ত লাগলে সেই আগে এগিয়ে যেত। এজন্য আমরা ওকে বকাঝকাও করতাম তবুও সে ভালো কাজেই লেগে থাকতো। আমি আমার ছেলে হত্যার বিচার চাই এবং আমার ছেলের জন্য সবার কাছে দোয়া চাই, আল্লাহ যেন তাকে ভালো রাখেন।

জানাজার নামাজে পুলিশের বাধা

শহীদ সাগর আহম্মেদের জানাজায় হাজার হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করবে কিন্তু বালিয়াকান্দি থানার পুলিশ সাগর আহম্মেদের গ্রাম ঘিরে রেখেছিল যেন খুব বেশি লোক জানাজায় অংশগ্রহণ করতে না পারে। স্বৈরাচারী আওয়ামীলীগ সরকারের পুলিশের ভয় ছিল সাগর আহম্মেদের জানাজায় হাজার হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করে সরকার বিরোধী আন্দোলন করতে পারে। তাই তারা শহীদ সাগর আহম্মেদের পরিবারে চাপ সৃষ্টি করে ভয় ভীতি দেখায় যেন দ্রুত জানাযা শেষ করা হয়। পরিবারের ইচ্ছা ছিল জানাজা হবে আসরের পরে কিন্তু পুলিশের চাপের কারণে বিকেল ৩ টায় জানাজার নামাজ শেষ করা হয়।

শহীদ সাগর আহম্মেদের শিক্ষা জীবন

গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করার পর লিয়াকত আলী স্মৃতি স্কুল এন্ড কলেজর বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এসএসসি পাশ করেন। এরপর রাজবাড়ি সরকারি কলেজে মানবিক বিভাগ থেকে এ গ্রেড নিয়ে কৃতিত্বের সাথে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঢাকায় ইউসিসি কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার প্রস্তুতি নেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স হয়ে গিয়েছিল কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা কোটা না থাকায় ভর্তি সুযোগ হলো না। তার চেয়ে কম নাম্বার পেয়ে অন্য একজন মুক্তিযোদ্ধার নাতি ছেলে ভর্তির সুযোগ পায়। অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বাংলা কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়া শুরু করেন। মৃত্যুকালীন সময় সাগর আহমেদ অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে পড়াশোনা করতেন। তার স্বপ্ন ছিল বিসিএস ক্যাডার হওয়া। প্রশাসনের দুর্নীতি দেখেই তার ভালো লাগতো না। তাই শহীদ সাগর আহম্মেদ মনে করেছিলেন বিসিএস পরীক্ষায় ভালো ভাবে উত্তীর্ণ হয়ে প্রশাসনের ভিতরে ঢুকবে। কিন্তু তার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিল সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী।

পারিবারিক অবস্থা

সামান্য কৃষি জমি ও অন্যের জমিতে কৃষি শ্রমের মাধ্যমে ৪ সদস্যের পরিবারের খরচ চালান শহীদ সাগর আহম্মেদের বাবা তোফাজ্জেল হোসেন। শহীদ সাগর নিজের পড়ার খরচ নিজেই চালাতেন। দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়া মেয়ের খরচ চালিয়ে সংসার চালাতে টানাটানি হলেও উচ্চ আত্ম-সম্মানবোধ সম্পন্ন তোফাজ্জাল হোসেন কারো সাহায্য নিতে চান না। তিনি বলেন আল্লাহর রহমতে আমরা অনেক সুখে আছি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ সাগর আহম্মেদ
Name: MD. SAGOR AHMED
পিতা: মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন
মাতা: গোলাপী বেগম
Date of Birth: 12 Dec 2003
ID NO: 9162322953

এক নজরে শহীদ মো: সাগর আহম্মেদ

নাম	: মো: সাগর আহম্মেদ
জন্ম তারিখ	: ১২-১২-২০০৩
জন্মস্থান	: বিল টাক পুড়া, বালিয়াকান্দি, ফরিদপুর
পেশা	: ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত মিরপুর বাংলা কলেজ অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: বিল টাক পুড়া, ইউনিয়ন: নারুয়া, থানা: বালিয়াকান্দি, জেলা: রাজবাড়ি
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বিল টাক পুড়া, ইউনিয়ন: নারুয়া, থানা: বালিয়াকান্দি, জেলা: রাজবাড়ি
পরিবার	
পিতার নাম	: মো: তোফাজ্জেল হোসেন
মাতার নাম	: গোলাপী বেগম
বোন	: মোসা: মুশমী বেগম (১৮) লিয়াকত আলী স্কুল এন্ড কলেজ বালিয়াকান্দি, দ্বাদশ শ্রেণী, মানবিক
আহত হওয়ায় ও সময়, স্থান	: ১৯-০৭-২০২৪ সন্ধ্যা ৬:০০ মিনিট
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ১৯-০৭-২০২৪, সন্ধ্যা ৬:০৮ মিনিট, মিরপুর ১০, আজমল হাসপাতালের গেটে
আঘাতকারীর	: আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসী পুলিশ
জানাজা	: ২০-০৭-২০২৪ বিকেল ৩:০০ টায়
কবরস্থান	: বিল টাক পুড়া কবরস্থান
প্রস্তাবনা	: শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান দেয়া।
	: শহীদের পিতাকে সমবায় কৃষি খামার করে দেয়া।
	: শহীদের বোনের উচ্চশিক্ষার খরচের যোগান দেয়া।

শহীদ সিরাজুল বেপারী

ক্রমিক : ২০৩

আইডি : ঢাকা বিভাগ ৭১

পরিচিতি

শহীদ সিরাজুল বেপারী তাইজুদ্দিন মুন্সীডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ফরিদপুর জেলার কোতোয়ালি থানায় এই গ্রামের অবস্থান। ছোটকাল থেকেই তিনি একটু সহজ সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম এবং শিরিন আক্তার দম্পতির ঘরে ১৯৯৫ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েই লেখাপড়া জীবনের ইতি টানেন। তারপর উপার্জনের তাগিদে ঢাকাতে চলে আসেন। মোটর কার গ্যারেজে কাজ নেন। অনেক পরিশ্রম এবং মনোযোগের সাথে অন্যের গ্যারেজে কাজ করে অবশেষে তিনি ভালো মানের একজন মেকানিক হয়ে ওঠেন। ঢাকার স্বনামধন্য লোকজন তার কাছে গাড়ি মেরামত করতো। গত দুই বছর আগে তিনি পিংকি খাতুনের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের ঘরে এখন পর্যন্ত কোন সন্তান আসেনি। তবে অনেক স্বপ্ন ছিল সুন্দর করে সংসার সাজানোর। অবশেষে সকল স্বপ্ন ভেঙ্গে দিল আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী। ৫ আগস্ট ২০২৪ দুপুরে পরাজিত হওয়ার পরও এরকম ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটাবে কেউ কল্পনাও করেনি। সিরাজুল বেপারীকে পুলিশ রাত ১০:৩০ মিনিটে গুলি করে হত্যা করে।

শাহাদাতের ঘটনা

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের কারচুপির নির্বাচনে দুই তৃতীয়াংশ আসনে জিতে আওয়ামীলীগ সরকার গঠন করে। এরপর থেকে আর দলটি ক্ষমতা থেকে বের হতে চায়নি।একতরফা বা

জালিয়াতির নির্বাচন, বিরোধীদের ও বিরুদ্ধ মত দমন, অনিয়ম আর দুর্নীতি, আমলা আর প্রশাসনের ওপর নির্ভর করে দলটির টিকে থাকা, এই পতনের পেছনে মূল কয়েকটি কারণ হিসেবে উঠে আসছে।

১৫ বছরে বেশিরভাগ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ ধ্বংস করে দিয়েছিল। এসব প্রতিষ্ঠান সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও তারা নিজেরা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের যে ক্ষমতার ভিত্তি, তার কোনটাই টেকসই ছিল না। কারণ তারা জনগণ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

ফলে মানুষের একটা ক্যাটালিস্ট বা স্ফুলিঙ্গের দরকার ছিল। সেটাই শিক্ষার্থীদের আন্দোলন দিয়ে শুরু হয়েছে। ফলে সরকার বিরোধী একটা আন্দোলন যখন জোরালো হয়ে ওঠে, সেই আন্দোলন ঘিরেও মানুষের ক্ষোভের জন্ম হয়, তখন সেনাবাহিনী, কারফিউ বা পুলিশের পরোয়া না করে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার হাজার হাজার মানুষ গণভবনের উদ্দেশ্যে পথে নেমে এসেছিলেন। ১৫ বছরের একটা পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, জিনিসপত্রের দাম, গণপরিবহনের অব্যবস্থাপনা, লুটপাট, ব্যাংকিংয়ের অনিয়ম সব কিছু নিয়ে ক্ষুব্ধ মানুষ কোটা আন্দোলনের একটা উপলক্ষ্য করে পরিবর্তনের আশায় বজ্রকণ্ঠে হুংকার দিয়ে রাজপথে নেমে এসেছে।

১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে হত্যার পর আওয়ামীলীগ যে বিপর্যয়কর অবস্থায় পড়েছিল, প্রায় ৫০ বছরের মাথায় দলটি আবার সেই একই অবস্থায় পড়েছে।কিন্তু পুরো পরিস্থিতি কীভাবে এবং কেন এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছালো, যাতে বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষ দলটির বিরুদ্ধে এভাবে রাজপথে নেমে আসলো? কেন ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে থাকা শেখ হাসিনাকে দেশ থেকে পালিয়ে যেতে হলো?

শেখ হাসিনা পালিয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু কয়েক হাজার মায়ের বুক খালি করে পালাল। অনেক শিশুকে এতিম করল এবং অনেক মা-বোনকে বিধবা করল। ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে স্বৈরাচার শেখ হাসিনা পালানোর পরেও তার নির্দেশে তার পোষা কিছু সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী সিরাজুল বেপারীর মত কয়েকশো মানুষকে হত্যা করল। এতেই বোঝা যায় স্বৈরাচার শেখ হাসিনা কত বড় সন্ত্রাসী মনোভাব নিয়ে বাংলাদেশ শাসন করেছে।

সেদিন রাতের ঘটনা

প্রতিদিনের মতো সিরাজুল ইসলাম তার ঢাকার বাড্ডায় মোটর ওয়ার্কশপে কাজ করে ঘরে ফিরবেন। রাত ৮:৩০ মিনিটে গ্রাম থেকে তার বাবা ফোন দিয়ে খোঁজখবর নিলেন। বাবা তুমি কি খাওয়া দাওয়া করেছ। সিরাজুল ইসলাম বলল না বাবা আমি খাওয়া-দাওয়া করিনি। আজকে গ্যারেজের কাজ শেষ করে বাসায় যাব, গিয়ে রান্না করে তারপরে খাব। আজ যেতে একটু দেরি হবে। বাবা বললেন দ্রুত বাসায় গিয়ে খেয়ে নিবে। বেশি রাত করলে শরীর খারাপ করবে। সিরাজুল ইসলাম বললেন ঠিক আছে বাবা আমি দ্রুত খেয়ে নেব। আমার জন্য দোয়া করো। বাবা বললেন তোমার স্ত্রীর সাথে কি কথা বলবে? সে আমার পাশেই আছে? সিরাজুল বলল এখন একটু ব্যস্ত আছি তাই পরে কথা বলব, এখন রেখে দাও। সিরাজুল বেপারী তার গ্যারেজের কাজ শেষ করে বাসার দিকে ফিরছিলেন। হঠাৎ মনে হল স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে এতদিন অংশগ্রহণ করলাম, সহযোগিতা করলাম, কিন্তু আজ স্বৈরাচারীর পতন হলো অথচ আনন্দ করতে পারলাম না! তাই সে মনে করলো একটু আনন্দ মিছিলে ঘুরে আসি। রাত ১০:৩০ মিনিটের দিকে মধ্য বাড্ডায় হঠাৎ অচেনা পুলিশ সদস্যদের গুলি করতে দেখা যায়। তারা জনগণকে লক্ষ্য করে বৃষ্টির মতো গুলি ছুড়তে থাকে। লোকজন এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করে পালাচ্ছে। সিরাজুল বেপারীও পুলিশের গুলি থেকে বাঁচার জন্য ছুটতে শুরু করল। হঠাৎ পিছন দিক থেকে পরপর তিনটা বুলেট এসে তার শরীরে বিদ্ধ হয়। কয়েক পা এগিয়েই সিরাজুল বেপারী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আনন্দ মিছিলে অংশগ্রহণকারী সাধারণ জনগণ তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু এরই মাঝে কখন যে তার প্রাণ চলে গেছে তারা তা বুঝতেও পারেনি। মেডিকেলে পৌঁছানোর পর কর্তব্যরত চিকিৎসক

তাকে মৃত ঘোষণা করে। রাত ১২:৩০ মিনিটে সিরাজুলের বড় ভাইয়ের ফোনে হঠাৎ কল আসে এবং বলে সিরাজুল বেপারীর গায়ে গুলি বিদ্ধ হয়েছে। আপনারা বাসা থেকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আসেন। পরিবারের লোকজন এসে ঢাকা মেডিকেল কলেজে অনেকগুলো লাশের মধ্য থেকে সিরাজুল বেপারীকে সনাক্ত করে। পরের দিন সকালে নিজ এলাকায় তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এবং দাফন করা হয়।

শহীদ সিরাজুল ইবেপারীর এক শিক্ষকের বক্তব্য

প্রত্যেক আত্মাকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে।পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী আর মৃত্যু এক অনিবার্য বাস্তবতা। মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা নিয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু একদিন সবাইকে মরতে হবে-সে বিষয়ে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কোন মতপার্থক্য নেই। 'মৃত্যু পৃথিবীর মায়ামোহ ধন-দৌলত থেকে সবাইকে বিচ্ছিন্ন করে। ভাই-বোন, পিতা-মাতা কিংবা বন্ধু-বান্ধব আর আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্কের মাঝে ফারাক তৈরি করে। প্রেম-ভালোবাসার বন্ধনকে ছিন্ন করে। এমনকি এক পর্যায়ে মৃত ব্যক্তিকে তাদের স্বজন কিংবা পরিচিত জনের হৃদয় থেকে ভুলিয়ে দেয়।কিন্তু মানুষকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখে একটি মৃত্যু। সেই মৃত্যু সৌভাগ্যের, সেই মৃত্যু শাহাদাতের। আমি মনে করি আমার প্রিয় ছাত্র সিরাজুল বেপারী শাহাদাত বরণ করেছেন এবং আল্লাহ তাকে পরকালে জান্নাত নসিব করবেন।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ, শহীদ সিরাজুল বেপারীই ছিল একমাত্র আয়ের উৎস। বাড়ির ভিটা ছাড়া আবাদি কোন জমি নেই। বৃদ্ধ পিতা নৌকা চালিয়ে সংসার চালাতেন, কিন্তু অসুস্থতার কারণে এখন আর নৌকা চালাতে পারেন না তাই অনেক কষ্টেই দিনযাপন করতে হচ্ছে। বড় ছেলে ঢাকায় ছোট চাকরি করে সামান্য কিছু সহযোগিতা মাঝে মাঝে করে থাকেন। শহীদ সিরাজুল বেপারীর বউ পিংকি খাতুন সিরাজুল বেপারীর শাহাদাতের পঞ্চম দিনে নিজ পিতার বাসায় চলে যান। এখন তার অবস্থাও করুণ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় পরিচয়পত্র

নাম
মোঃ সিরাজুল বেপারী
Name
MD. SIRAZUL BAPARI
পিতা
শফিকুল ইসলাম
মাতা
শিরিন আক্তার
Date of Birth 01 Jan 1995
NID No 599 895 3995

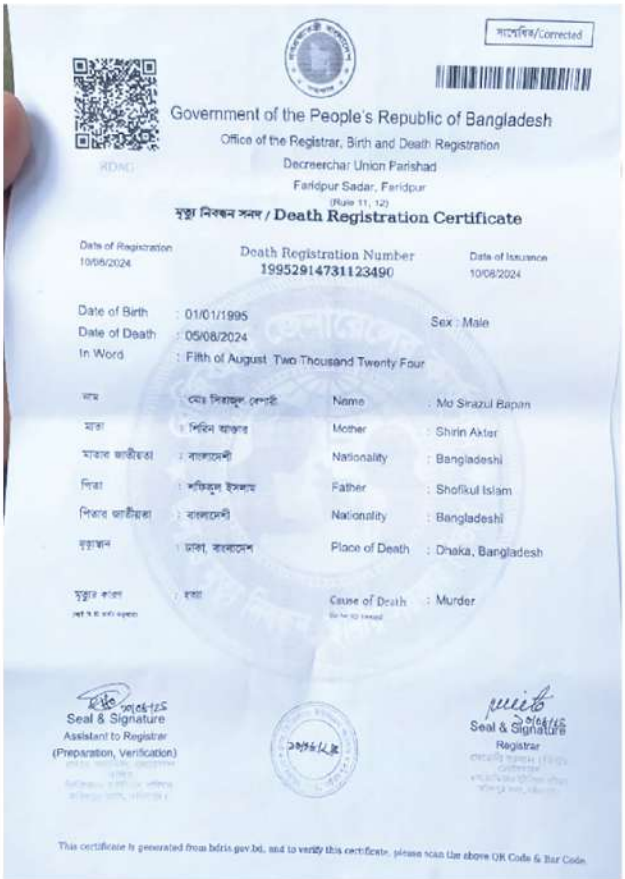

সংশোধিত/Corrected

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Decreerchar Union Parishad
Faridpur Sadar, Faridpur
(Rule 11, 12)
মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration 10/08/2024
Death Registration Number 19952914731123490
Date of Issuance 10/08/2024

Date of Birth : 01/01/1995
Date of Death : 05/08/2024
In Word : Fifth of August Two Thousand Twenty Four
Sex : Male

নাম	: মোঃ সিরাজুল বেপারী	Name	: Md Sirazul Bapari
মাতা	: শিরিন আক্তার	Mother	: Shirin Akter
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: শফিকুল ইসলাম	Father	: Shofikul Islam
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
মৃত্যুস্থান	: ঢাকা, বাংলাদেশ	Place of Death	: Dhaka, Bangladesh
মৃত্যুর কারণ	: হত্যা	Cause of Death	: Murder

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)

Seal & Signature
Registrar

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code

এক নজরে শহীদ মো: সিরাজুল বেপারী

নাম	: মো: সিরাজুল বেপারী
জন্ম তারিখ	: ০১-০১-১৯৯৫
জন্মস্থান	: তাইজউদ্দিন মুন্সীডাঙ্গা, কোতোয়ালী, ফরিদপুর
পেশা	: মোটর মেকানিক
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: তাইজউদ্দিন মুন্সীডাঙ্গা, ইউনিয়ন: ডিগ্রীর চর, থানা: কোতোয়ালী, জেলা: ফরিদপুর
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: তাইজউদ্দিন মুন্সীডাঙ্গা, ইউনিয়ন: ডিগ্রীর চর, থানা: কোতোয়ালী, জেলা: ফরিদপুর
পরিবার	
পিতার নাম	: শফিকুল বেপারী (৬৮) কৃষিকাজ
মাতার নাম	: মোছা: শিরীন আক্তার (৪৮) গৃহিণী
স্ত্রী	: পিংকি খাতুন
আঘাতকারীর	: পুলিশ
আহত হওয়ায় ও স্থান সময়	: মধ্য বাড্ডা, ঢাকা। ০৫-৮-২০২৪ রাত ১০:৩০
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: মধ্য বাড্ডা ঢাকা। ০৫-০৮-২০২৪
	: রাত ১০:৩০ ঢাকা মেডিকেল কলেজ
কবরস্থান	: ০৬-০৮-২০২৪ নিজ গ্রাম সরকারি কবরস্থান
প্রস্তাবনা	: শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান
	: পাকা বাড়ি নির্মাণ করে দেয়া

শহীদ সামচু মোল্যা

ক্রমিক : ২০৪

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৭২

পরিচিতি

ফরিদপুর জেলার কোতোয়ালি থানার পূর্ব খাবাশপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন শহীদ সামচু মোল্যা। পিতা মো: মোতালেব মোল্যা মাতা আম্বিয়া খাতুনের নয় ছেলে মেয়ের মধ্যে সামচু মোল্যা ছিলেন দ্বিতীয়। ১৯৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করে দারিদ্রতার কারণে নবম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেই জীবিকার তাগিদে বাস ড্রাইভারের কাজ শুরু করেন। মৃত্যুকালীন তিনি ফরিদপুর টু ঢাকা বিকাশ পরিবহনে ড্রাইভার কর্মরত ছিলেন। সামচু মোল্যা দীর্ঘদিন সংসার করার পরে গত ৮ বছর আগে প্রথম স্ত্রীর সাথে বিভিন্ন সমস্যায় বিচ্ছেদ হয়ে যায়। প্রথম স্ত্রীর ঘরে সামচু মোল্যার এক ছেলে ও এক মেয়ে ছিল। ছেলে মেয়ে উভয়েরই তিনি সুন্দরভাবে বিয়ে দিয়ে দেন। পরবর্তীতে তিনি মেঘলা বেগমকে বিয়ে করে খুব সুখের সাথেই দিনাতিপাত করছিলেন। মেঘলা বেগমের ঘরে একটি সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে আছে। মেয়েটির বয়স পাঁচ বছর। মেয়েকে নিয়ে সামচু মোল্যার অনেক স্বপ্ন। তিনি মেয়েকে কষ্ট করে হলেও একজন বড় ডাক্তার বানাবেন। কিন্তু তার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল জালিম আওয়ামীলীগ পুলিশ তার স্বপ্নকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে বুলেটের আঘাতে তাকে শহীদ করে দিল। সামচু মোল্যার কল্পনাও করেনি বিজয়ের এই দিনে পুলিশের বুলেটের আঘাতে তাকে শাহাদাত বরণ করতে হবে।

শাহাদাতের ঘটনা

আন্তর্জাতিক রিপোর্ট অনুযায়ী শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদকাল (২০০৯-২০২৪) ছিল অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা এবং ব্যাপক দুর্নীতি দ্বারা সমালোচিত, যার ফলে ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক ঋণ, ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি, যুব বেকারত্ব এবং ব্যাংকিং অনিয়ম নজরে আসে। এই সময়ে অবৈধ উপায়ে বাংলাদেশ থেকে আনুমানিক মার্কিন ১৫০ বিলিয়ন ডলার বা ১৭.৬ লক্ষ কোটি টাকা পাচার হয়েছে। ২০২২ সালে, শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয়। ২০২৪ সালের জুনে, সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে দেশব্যাপী নতুন ছাত্রবিক্ষোভ শুরু হয়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং আধাসামরিক বাহিনী দ্বারা এই বিক্ষোভ নৃশংস দমন-পীড়নের মুখোমুখি হয়েছিল, যার ফলে অনেক ছাত্র নিহত হয়েছিল। আগস্টের শুরুতে, এই বিক্ষোভ সরকারের বিরুদ্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়, যা শেষ পর্যন্ত হাসিনাকে পদত্যাগ এবং ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। ৫ আগস্ট ২০২৪ বিকেল ৪:৩০ টা, শহীদ সামচু মোল্যা তার মেয়েকে অনেক আদর করে বলল মা সাম্মি তুমি কিন্তু সন্ধ্যার পরে তোমার আম্মুর কাছে পড়তে বসবে। ভালো করে লেখাপড়া না করলে বড় ডাক্তার হওয়া যায় না। আর ডাক্তার না হলে মানুষের সেবা করা কঠিন হয়ে যাবে। মেয়ে শহীদ সামচু মোল্যার গলা জড়িয়ে ধরে কপালে একটি চুমু দিল এবং বলল আব্বু আমার জন্য ডাক্তারের মেলা কিছু জিনিস নিয়ে এসে দিবে কিন্তু। আমি সেগুলো দিয়ে খেলা করবো। সামচু মোল্যা ও তার মেয়েকে একটি চুমু দিয়ে স্ত্রী মেঘলা বেগমকে বললেন তুমি আমার মেয়েকে সন্ধ্যার পরে ভালোভাবে পড়াবে তাকে নিয়ে আমার অনেক বড় স্বপ্ন। বিকেল ৪:৫০ টার দিকে সামচু মোল্যা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল স্বৈরাচার পতনের আনন্দ মিছিলে অংশ নেওয়ার জন্য এবং তার কর্ম ক্ষেত্রে যাবার জন্য। কে জানে যে এই যাওয়াই সামচু মোল্যার শেষ যাওয়া আর কখনো জীবিত অবস্থায় ফেরা সম্ভাব হবেনা? স্বৈরাচার পতন হয়েছে তার পরেও তাদের দোসরদের রাক্ষসে মনোভাব যায়নি। তাইতো সামচু মোল্যাকে গুলি করে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিল। তারা কি জানে না সামচু মোল্যার ঘরে বউ বাচ্চা আছে তাদের দেখার আর কেউ নেই, সামচু মোল্যা না থাকলে তাদের মুখে ভাত জুটবে না, এটা তো তাদের জানার কথা ছিল। কিন্তু তারা তো মানুষ নামে কলঙ্ক তাদের ভিতরে বিবেক বলে কিছু নেই, তারা যে পশুর চাইতেও নিকৃষ্ট, তারা জানবে কিভাবে।

শহীদ সামচু মোল্যা ৫ আগস্ট বিকেল ৫ টার দিকে বিজয় মিছিলে অংশ নিয়ে ফরিদপুর কোতোয়ালী থানার সামনে চা খেতে বসেছে একটি চায়ের দোকানে। একটু পর হঠাৎ পুলিশ, ছাত্রলীগ, আওয়ামীলীগ বৃষ্টির মতো গুলি ছুড়তে ছুড়তে সামনে এগিয়ে আসছে। রাস্তার মানুষ দৌড়ে পালাচ্ছে আর দোকানের মানুষগুলো কেউ রাস্তার দিকে কেউবা দোকানের শাটার নামিয়ে দোকানের ভিতরে ঢুকে পড়ছে। মানুষ কত বিবেকহীন হলে এ ধরনের ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটাতে পারে। নিরস্ত্র মানুষের উপর এভাবে কেউ গুলি করে! তাও আবার পরাজয়ের পরে! পৃথিবীর ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা কোথাও ঘটেনি। যাইহে সামচু মোল্যা চা টা রেখে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য রাস্তা ধরে পালানোর চেষ্টা করল। কিন্তু সন্ত্রাসী পুলিশের একটি বুলেট এসে তার মাথায় আঘাত করে। তৎক্ষণাৎ রাস্তায় ঢলে পড়েন সামচু মোল্যা। সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

শহীদ সামচু মোল্যার স্ত্রীর কথা

আমার স্বামী সব সময় ইসলামের পক্ষে থাকত, নামাজ পড়তো। শেখ হাসিনা পতনের পর সে আমাকে বললো "আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা আজ পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা অর্জন করেছি। দীর্ঘদিন ফ্যাসিবাদী সরকার আমাদের দেশটাকে লুটেপুটে খেয়েছে। কেউ শান্তির সাথে ঘুমাতে পারেনি। আমাদের জীবনের নিরাপত্তা কেড়ে নিয়েছিল আওয়ামীলীগ সরকার। এত সুন্দর একটি বাংলাদেশকে শেখ হাসিনা সরকার বসবাসের অযোগ্য বানিয়ে দিয়েছিল।" আমার স্বামী তো কোন দোষ করে নাই, কোন অন্যায় করেনি। সে সারা জীবন অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে কিন্তু তাকে কেন হত্যা করা হলো। আমি আমার মেয়েকে নিয়ে এখন কি করব কিভাবে বাচব? যারা আমার স্বামীকে হত্যা করেছে আমি তাদের উপযুক্ত শাস্তি চাই।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ সামচু মোল্যার ১ম স্ত্রীর ঘরে ১ ছেলে ও ১ মেয়ে আছে। তারা বিবাহ করে নিজেরা সংসার করছে।বর্তমান ঘর ছাড়া তাদের কোন সম্পত্তি নেই। সামচু মোল্যাই ছিলেন আয়ের একমাত্র উৎস। এখন তার স্ত্রী মেঘলা বেগম এক মেয়েকে নিয়ে দিশেহারা অবস্থায় দিন যাপন করছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card
নাম
সামছু মোল্যা
Name
SAMCHU MOLLA
পিতা
মোতালেব মোল্যা
মাতা
আম্বিয়া খাতুন
Date of Birth 05 May 1965
NID No. 825 132 4581

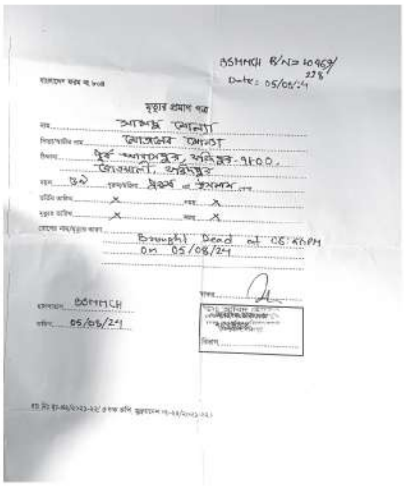

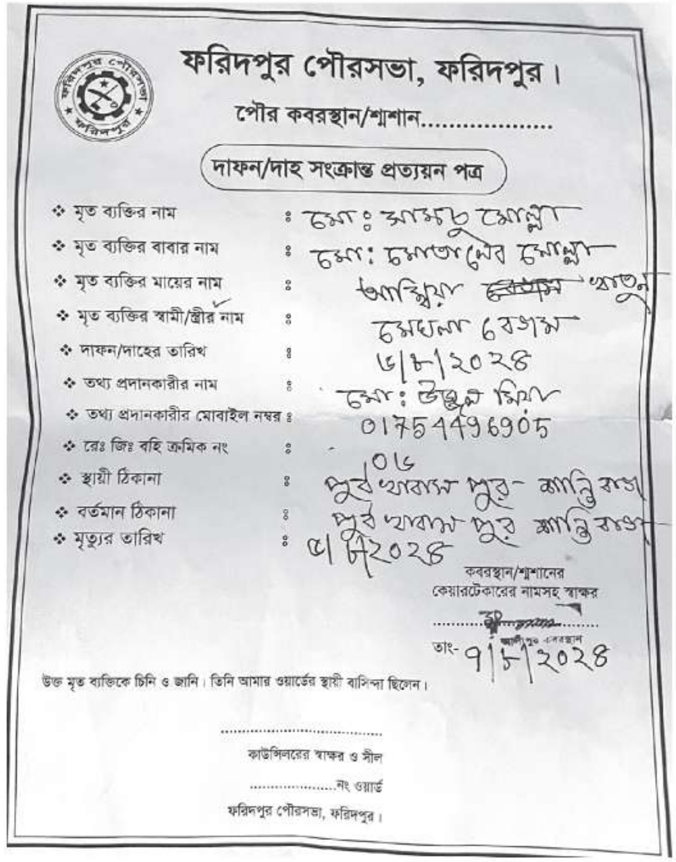
ফরিদপুর পৌরসভা, ফরিদপুর।
পৌর কবরস্থান/শ্মশান..................
দাফন/দাহ সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্র

❖ মৃত ব্যক্তির নাম : মোঃ সামছু মোল্যা
❖ মৃত ব্যক্তির বাবার নাম : মোঃ মোতালেব মোল্যা
❖ মৃত ব্যক্তির মায়ের নাম : আম্বিয়া খাতুন
❖ মৃত ব্যক্তির স্বামী/স্ত্রীর নাম : মেঘলা বেগম
❖ দাফন/দাহের তারিখ : ৬/৮/২০২৪
❖ তথ্য প্রদানকারীর নাম :
❖ তথ্য প্রদানকারীর মোবাইল নম্বর :
❖ রেঃ জিঃ বহি ক্রমিক নং : ০৬
❖ স্থায়ী ঠিকানা :
❖ বর্তমান ঠিকানা :
❖ মৃত্যুর তারিখ : ৫/৮/২০২৪

কবরস্থান/শ্মশানের কেয়ারটেকারের নামসহ স্বাক্ষর
তাং- ৭/৮/২০২৪

উক্ত মৃত ব্যক্তিকে চিনি ও জানি। তিনি আমার ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন।

কাউন্সিলরের স্বাক্ষর ও সীল
....................নং ওয়ার্ড
ফরিদপুর পৌরসভা, ফরিদপুর।

এক নজরে শহীদ মোঃ শামচু মোল্লা

নাম	: মো: সামচু মোল্যা
জন্ম তারিখ	: ০৫-০৫-১৯৬৫
জন্মস্থান	: পূর্ব খাবাশপুর, কোতোয়ালী, ফরিদপুর
পেশা	: বাস ড্রাইভার
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: পূর্ব খাবাসপুর, ইউনিয়ন: ফরিদপুর সদর, থানা: কোতোয়ালী, জেলা: ফরিদপুর
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: পূর্ব খাবাসপুর, ইউনিয়ন: ফরিদপুর সদর, থানা: কোতোয়ালী, জেলা: ফরিদপুর
পিতার নাম	: মৃত মোতালেব মোল্যা
মাতার নাম	: মৃত আম্বিয়া খাতুন
স্ত্রী	: মেঘলা বেগম
দুই মেয়ে	: ১.মরিয়ম আক্তার,(১৩), আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়, সপ্তম শ্রেণী ২. সাম্মি আক্তার (৫), পূর্ব খাবাশপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, নার্সারি
আঘাতকারীর	: আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসী ও পুলিশ
আহত হওয়া, স্থান ও সময়	: ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার সামনে, ০৫-৮-২০২৪, বিকেল ৫:৩০ মিনিট
মৃত্যুর তারিখ, সময় ও স্থান	: ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার সামনে, ০৫-০৮-২০২৪, বিকেল ৫:৩৫ মিনিট
কবরস্থান	: ০৬-০৮-২০২৪ আলিপুর পৌর কবরস্থান, ফরিদপুর

প্রস্তাবনা

শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান ও নিয়মিত মাসিক ভাতা প্রদান

ছোট মেয়ের পড়াশুনা সহ ডাক্তার হওয়ার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করা

শহীদের দ্বিতীয় স্ত্রীর যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরির ব্যবস্থা করা

শহীদ মুহাম্মদ জান শরীফ

ক্রমিক : ২০৫

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৭৩

মুহাম্মদ জান শরীফের পরিচয়

মহান মুক্তিযুদ্ধে ফরিদপুরের মানুষের যেমন অবদান ছিল ঠিক তেমনি ২০২৪ এর বৈষম্যবিরোধী মহান আন্দোলনে তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শহীদ মুহাম্মদ জান শরীফ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের পানি ও খাবার সরবরাহ করে সকলের কাছে মানবীয় ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। মুহাম্মদ জান ১৯৭৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ফরিদপুর জেলা সদরের গোয়ালচামঠ গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই খুব মিশুক ছিলেন। সবার সাথে বন্ধুর মতো চলাফেরা করতেন। বাবার মৃত্যুতে পরিবারটা দিশেহারা হয়ে পড়ে। এ সময় তিনি লেখাপড়া বাদ দিয়ে পরিবারের হাল ধরেন। অভাবের সংসারে বড় হওয়া মোহাম্মদ জান শরীফ ছোটবেলা থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সবসময় সক্রিয় ছিলেন। পরিবারের সচ্ছলতা আনতে ব্যাবসা শুরু করেন। ভালোই চলছিল সংসার। এ সময় রোহেদুন সেজবা বানুর সাথে তিনি বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি একটি বেসরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তা ছিলেন। ২০২১ সালে অসুস্থতার কারণে তিনি চাকুরি ছেড়ে দেন। একমাত্র মেয়ে মাহাবি শরীফ জারা মতিঝিল স্কুল এন্ড কলেজে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। দুই ভাই বোনের মধ্যে বোনের আগেই বিবাহ হয়ে যায়। মুহাম্মদ জান শরীফের স্ত্রী অসুস্থ শাশুড়ী ও শিশুকন্যাকে নিয়ে বর্তমানে গভীর সংকটে রয়েছে।

শহীদ হওয়ার প্রেক্ষাপট

বৈষম্যময় সমাজের কুৎসিত চেহারা দেখতে দেখতে সমাজের প্রতিটি মানুষ অতিষ্ঠ ছিল। মুক্তির আশায় তারা পথ পানে চেয়ে থাকত। বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে ছাত্র সমাজ এগিয়ে আসলে সর্বস্তরের জনতা সেখানে যোগদান করেন। শহীদ মোহাম্মদ জান শরীফ এ আন্দোলনের শুরু থেকে ছাত্রদের পাশে থেকে পানি ও খাবার পরিবেশন করছিলেন। ১৯ জুলাই জুমার নামাজের কথা বলে বাসা থেকে বের হয়ে এ উত্তাল আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। জিহাদের ময়দান বনশ্রী মসজিদের সামনে অবস্থানকালে

স্ত্রী ও শিশু কন্যা বারবার ফোন করলে তিনি তাদের সান্ত্বনা দেন এবং বলেন আমি রাস্তায় ছাত্রদের পানি ও খাবার খাওয়াচ্ছি। তোমরা বাসায় থাকো আমার আসতে একটু দেরি হবে। সেদিন নিজস্ব অর্থ ব্যয় করে হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা নিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন দরদি জান শরীফ। ইতিমধ্যে পুলিশের মুহুর্মুহু গুলি চলছিলো। তাছাড়া আওয়ামী সন্ত্রাসীরা চারিদিক দিয়ে আক্রমণ করল। পানি ও খাবার খাওয়ানোর অপরাধে পুলিশের টার্গেটকৃত গুলি শহীদ মোহাম্মদ জান শরিফের বুকের ভিতর প্রবেশ করে। মুহূর্তেই লুটিয়ে পড়েন মাটিতে। শহীদের সাথীরা দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পুরো এলাকা তখন শোকে স্তব্ধ হয়ে যায়। এ সমাজ তার মতো সাহসী ও প্রতিবাদী চেতনার একজন সোনার মানুষকে হারালো। পরিবার তাকে বিদায় দিল গভীর অশ্রু জলে।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়র অনুভূতি

শহীদ মুহাম্মদ জান শরিফ ছিলেন একজন মানবিক ও জনদরদি মানুষ। মানুষের বিপদ আপদে সবার আগে ছুটে আসতেন। সে ছিল একজন সৎ, নির্ভীক, কর্মঠ, সাহসী বীরপুরুষ। তার স্ত্রী রোহেদুন সেজবা বানু বলেন, জান শরীফ খুব মিশুক প্রকৃতির মানুষ ছিল। আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। বিয়ের পর আমি তাকে ছাড়া কখনো থাকিনি। এখন তার অভাব কোনভাবে ভুলতে পারছি না। শিশু কন্যার আহাজারি আমার হৃদয় খান খান করে দিচ্ছে। এলাকার সচেতন মহল আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন আল্লাহ তায়ালা জান শরীফের এই মানবীয় কাজকে যেন কবুল করেন।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

মুহাম্মদ জান শরীফ পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। পরিবারটি এখন অসহায়। স্ত্রী রোহেদুন সেজবা বানু একটি বেসরকারি ব্যাংকে চাকুরি করতেন। সেটিও ২০২১ সালে অসুস্থতার কারণে ছেড়ে দেন। স্বামী চলে যাওয়ায় তিনি এখন অথৈ সাগরের মাঝি বিহীন নৌকার মতো হয়ে গেছেন। ফুটফুটে শিশু কন্যাটাকে মানুষ করার কোন উপায় দেখছেন না। সহায় সম্বলহীন এই অসহায় পরিবারটির প্রতি আল্লাহ যেন সহায় হন।

খবরের কাগজ

অনলাইন

'চোখের পানিই এখন বৃদ্ধা মায়ের সম্বল'

গুলিতে নিহত মিঠু

সঞ্জিব দাস, ফরিদপুর

'মিঠু ছিল আমার একমাত্র সন্তান। ওকে নিয়েই ছিল আমার পৃথিবী। ওর মৃত্যুর পর আমার জীবন এখন অন্ধকারে ভরে গেছে। জানি না সামনের দিন আমার কীভাবে কাটবে। এখন চোখের পানিই আমার সম্বল।'

গতকাল শুক্রবার কাঁদতে কাঁদতে খবরের কাগজকে এ কথা বলছিলেন গত ১৯ জুলাই ছাত্র আন্দোলনে নিহত মুহাম্মদ জান শরীফ মিঠুর মা হানুফা আলম। মিঠু ফরিদপুর শহরের মোল্লাবাড়ি সড়কের মৃত শরীফ শামসুল আলমের একমাত্র ছেলে। ঢাকার বনশ্রীতে তার বুটিকের একটি দোকান আছে। মিঠু ২০১৬ সালে নওগাঁ জেলার [illegible] সোহানা ইভাকে বিয়ে করেন। মাহাবী শরীফ জারা (৬) নামে তাদের এক সন্তান রয়েছে। সে আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের বনশ্রী শাখায় দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে। এদিকে স্বামীর মৃত্যুর পর ছয় বছরের মেয়েকে নিয়ে নওগাঁর বাবার বাড়িতে বসবাস করছেন ইভা। এর ফলে তার শাশুড়ি আরও অসহায় হয়ে পড়েছেন। এখন তাকে দেখাশোনা করার কেউ নেই।

হানুফা আলম বলেন, 'ছেলেকে হারিয়ে আমি অসহায় হয়ে পড়েছি। সরকার যেন আমাদের পরিবারকে দেখভালের ব্যবস্থা করে।'

এদিকে মিঠুর স্ত্রী বলেন, 'আমার বাবার বাড়ি নওগাঁ। আমি ঢাকার একটি বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি করতাম। শারীরিক অসুস্থতার জন্য ২০২১ সালের ডিসেম্বর চাকরি ছেড়ে দিই। তবে পড়ালেখার কারণে আমি গ্রামে যেতে পারিনি। আমার স্বামী কষ্ট করে বনশ্রীতে একটি দোকান দিয়েছিল। আমার অনুরোধ থাকবে সরকার যেন আমার মেয়ের দায়িত্ব নেয়।' গত ১৯ জুলাই দুপুরে বাসা থেকে বের হয়ে বনশ্রী মসজিদে নামাজ পড়তে যান মিঠু। ওই সময় মিঠু তার মেয়েকে ফোনে জানিয়েছিলেন, নামাজ শেষ করে তিনি বাসায় ফিরে আসবেন। তবে তিনি সেই কথা রাখতে পারেননি। বাড়ি ফেরার পথে তিনি ছাত্র আন্দোলনের মাঝে পড়ে যান। ওই সময় তার বুকে গুলি লাগে। পরে হাসপাতালে তার লাশ পাওয়া যায়। ওই দিন রাতেই লাশ ফরিদপুরে গ্রামের বাড়িতে নেওয়া হয়। সেখানেই দাফন করা হয়।

অশ্রুসিক্ত চোখে মোবাইলে ছেলের ছবি দেখছেন মিঠুর মা হানুফা আলম — খবরের কাগজ

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মুহাম্মদ জান শরীফ
জন্ম	: ২৮/০৯/ ১৯৭৮
পেশা	: ব্যবসায়ী। ঘটনার স্থান: বনশ্রী মসজিদের সামনে
বৈবাহিক অবস্থা	: বিবাহিত।
পিতা	: শরীফ শামসুল আলম
মাতা	: হানুফা আলম

স্থায়ী ঠিকানা

গ্রাম	: মোল্লাবাড়ী সড়ক
ইউনিয়ন	: ফরিদপুর পৌরসভা
থানা	: ফরিদপুর সদর
জেলা	: ফরিদপুর
আহত হওয়ার সময়কাল	: ১৯-৭-২০২৪ ৩:১৫ মিনিট
শাহাদাতের সময়কাল	: ১৯/০৭ / ২০২৪ ৩:১৫ মিনিট। আঘাতের ধরণ: বুকে গুলি লাগে
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী হাসিনার ঘাতক পুলিশের গুলিতে
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: গোয়ালচামঠ, ফরিদপুর সদর (নিজ বাসভবন)
সন্তান	: ১টি কন্যা সন্তান

প্রস্তাবনা

১. প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান।

২. শিশু কন্যা মাহাবি শরীফ জারার লেখাপড়া এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দায়িত্ব নেওয়া

শহীদ মো: কামরুল ইসলাম সেতু

ক্রমিক : ২০৬

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৭৪

পরিচয়

মো: কামরুল ইসলাম সেতু, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একজন বীর সৈনিক, ১৯৭৬ সালের ২৩ অক্টোবর ফরিদপুর সদর উপজেলায় জন্ম তার। পিতা মরহুম মো: মোতালেব হাওলাদার এবং মাতা মোছা: হামিদা বেগম, যিনি একজন গৃহিণী। চার সদস্য বিশিষ্ট্য পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন মো: কামরুল ইসলাম সেতু। এস এ টোটাল সলুশনস প্রতিষ্ঠানে অংশীদারি ব্যবসা থেকে মাসিক উপার্জিত ৭০,০০০ টাকায় সাংসারিক খরচ সহ চলত ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা। একমাত্র ছেলে আলভী বিন ইসলাম, পড়াশোর করে সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগে। বাবার স্বপ্ন ছিল ছেলে দেশের নামকরা একজন কম্পিউটার ইঞ্জিয়ার হবে। মেয়ে উমাইয়া ইসলাম স্নেহা মাত্র উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করেছে। মেয়েকে নিয়েও ছিল রঙিন স্বপ্ন।

শাহাদাতের ঘটনা

৪ আগষ্ট ২০২৪, রবিবার। দুপুরে যোহরের নামাজ পড়তে বের হোন মো: কামরুল ইসলাম সেতু। নামাজ শেষে মিরপুর ১০ এ অবস্থিত তার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের উদ্দ্যেশ্যে রওনা হোন। এমন সময় স্বৈরাচারের লালিত পুলিশ বাহিনী শিক্ষার্থীদের শান্তিপ্রিয় আন্দোলনে টিয়ারশেল ও গুলি ছুড়তে থাকে। পুলিশের সাথে যুক্ত হয় আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী বাহিনী। শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করতে হিংস্র আওয়ামী বাহিনী এবং তাদের লালিত পুলিশ গুলি ছুড়তে থাকে। এর মাঝে হঠাৎ একটি গুলি এসে লাগে

কামরুল ইসলাম সেতুর মাথায়। সাথে সাথে লুটিয়ে পড়ে রাস্তায়। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের কয়েকজন চিকিৎসার জন্য তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। দেশের শিক্ষার্থীসহ সাধারণ মানুষের ওপর স্বৈরাচার আওয়ামী সরকারের নির্যাতনের খবর পেয়ে সেতুর পরিবার চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং তার খোঁজ নেওয়ার জন্য মোবাইলে কল করে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে। পরিবারের কেউ তাকে মোবাইলে না পেয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে অজ্ঞাত একজন মো: কামরুল ইসলাম সেতুর মোবাইল কল রিসিভ করে জানান যে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন । তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে । পরবর্তীতে পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন হাসপাতালে খোঁজ নিতে থাকে এবং ঢাকা নিউরোসায়েন্স হাসপাতালে তাকে নিহত অবস্থায় খুঁজে পায় । মেডিকেল সার্টিফিকেটে সন্ধ্যা ৬.৩০ টা নাগাদ মরহুমের মৃত্যুর সময় উল্লেখ করা হয়।

পারিবারিক অবস্থা

মোঃ কামরুল ইসলাম সেতুর মৃত্যুতে তার পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া। দুই সন্তানের পড়াশোনার খরচ, পারিবারিক সকল খরচ চালানো কামরুল ইসলাম সেতুর স্ত্রীর পক্ষে অসম্ভব প্রায়। যার ফলে অনিশ্চিত হয়ে যায় ছেলে আলভী বিন ইসলাম এর কম্পিউটার ইঞ্জিয়ার হওয়ার স্বপ্ন । পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম পিতা হারিয়ে মেয়ে উমাইয়া ইসলাম স্নেহার পড়াশোনাও অনিশ্চিত।

সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা

মোঃ কামরুল ইসলাম সেতুর পরিবারকে মাসিক বা বাৎসরিক সহযোগিতার পাশাপাশি দুই সন্তানের পড়াশোনা কেন্দ্রিক সহযোগিতা করা যেতে পারে।

মৃত্যুসনদে লেখা মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন

শেষ ফোন কলে বলেছিলেন চিন্তা না করতে, অফিস বন্ধ করে বাসায় ফিরবেন

ফরিদপুর প্রতিনিধি

উপার্জনক্ষম বাবা মারা গেলেন, এখন আমার ও বোনের পড়ালেখা চলবে কীভাবে। তাছাড়া সংসারই বা চলবে কীভাবে, কার কাছে বলব এসব কথা, কেউ কি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন আমাদের পরিবারটিকে বেঁচে থাকার জন্য- এভাবেই একটানা কথাগুলো বলে গেলেন গত ৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় গুলিতে নিহত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কামরুল ইসলাম সেতুর একমাত্র ছেলে আলভী বিন ইসলাম। তিনি জানান, যত রাতই হোক, বাবা না আসা পর্যন্ত খেতেন না বোন উমাইয়া ইসলাম (১৯)। সেই বাবা ঢাকার মিরপুর-১০ নম্বরে গুলিতে মারা যান। বাবার এই মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না পরিবারের সদস্যরা। নিহত কামরুল ইসলামের বাড়ি ফরিদপুর শহরতলির রঘুনন্দনপুর হাউজিং এস্টেটে। তবে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে ঢাকার মিরপুর-১১ নম্বরে থাকতেন। ৪ আগস্ট রাতেই কামরুল ইসলামের লাশ ফরিদপুরে নিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা। পরদিন বেলা ১১টার দিকে ফরিদপুর শহরের আলীপুর পৌর কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়। কামরুল ইসলাম ঢাকায় কসমেটিকসের ব্যবসা করতেন। তার অফিস ছিল মিরপুর-১০ নম্বরে। তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি।

কামরুল ইসলামের স্ত্রী নিলুফার ইয়াসমিন বলেন, ৪ আগস্ট দুপুরে নামাজ পড়তে যান তার স্বামী। নামাজ শেষে তিনি কল করে বলেন, তার এখানে খুব গণ্ডগোল হচ্ছে। অফিসে দুজন কর্মচারী আছে। তাদের বিদায় দিয়ে অফিস বন্ধ করে তিনি বাসায় ফিরবেন। চিন্তা না করতে বলেন। কামরুল ইসলামের ছেলে আলভী বিন ইসলাম (২৩) বলেন, ৪ আগস্ট অনেকটা সময় পেরিয়ে গেলেও তার বাবা বাসায় ফেরেননি। তখন তিনি বারবার বাবার নম্বরে কল দিতে থাকেন। অনেকক্ষণ পর একজন কলটি ধরে বলেন, ফোনটি যার, তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তাকে মিরপুরের আল-হেলাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরে তিনি ও তার স্বজনরা জানতে পারেন, ওই হাসপাতাল থেকে তার বাবাকে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। এই হাসপাতালে তাকে পাওয়া যায়নি। ঢাকার নিউরোসায়েন্স হাসপাতালে গিয়ে বাবাকে খুঁজে পান তিনি। হাসপাতালের মৃত্যু সনদে বলা হয়, 'মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন।' কামরুল ইসলামের ছেলে আলভী বিন ইসলাম একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনা করছেন। মেয়ে উমাইয়া এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছেন। কামরুল ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তাকে হারিয়ে দিশাহারা পরিবারের সদস্যরা।

রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের প্রতি আহ্বান

নিরহংকারী বিনয়ী ও সৎ চরিত্রের অধিকারী শহীদ মো: কামরুল ইসলাম সেতুকে নির্মমভাবে প্রকাশ্যে দিবালোকে আওয়ামী সন্ত্রাসী, ছাত্রলীগ, যুবলীগ সহ আওয়ামী মদদপুষ্ট পুলিশ বাহীনি গুলি করে হত্যা করে। এলাকাবাসী ও শহীদের পরিবার এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করেছে। মহান আল্লাহ তায়ালা তার শাহাদাতকে কবুল করুন।

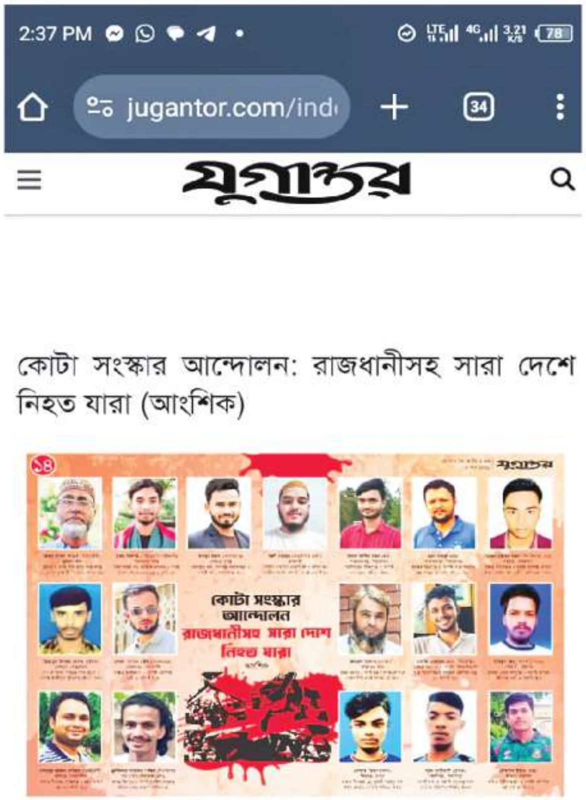

কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে সংঘাতে প্রাণহানি

অটোচালক মানিক মিয়ার স্ত্রী মুন্নীর কান্না থামছেই না — যুগান্তর

হত্যাকারীদের বিচার দাবি

স্বামী হারিয়ে শিশুকে নিয়ে অকূল পাথারে পড়েছেন মুন্নী

রংপুর ব্যুরো

রংপুরে কোটা সংস্কার আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অটোচালক মানিক মিয়ার (৩৪) মৃত্যু হয়। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির এমন মৃত্যুতে অন্ধকার দেখছেন পুরো পরিবার। স্বামীকে হারিয়ে দেড় বছরের শিশু সিয়ামকে নিয়ে অকূল পাথারে পড়েছেন মুন্নী বেগম। ভুগছেন আর্থিক সংকটে। মানিক মিয়া রংপুর নগরীর ১৫নং ওয়ার্ডের মডার্ন পূর্ব ঘাঘটপাড়া এলাকার মৃত

■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৪

নামাজে গিয়ে লাশ হলেন কামরুল

বাবার এ মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না ছেলেমেয়ে

ফরিদপুর ব্যুরো

কসমেটিক্স ব্যবসায়ী কামরুল ইসলাম সেতুর (৪৭) এ মৃত্যু মেনে নিতে পারছে না তার পরিবার। ছেলে আলভী ইসলাম (২৩), মেয়ে উমাইয়া ইসলাম (১৯) ও স্ত্রী নিলুফার ইয়াসমিন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষটিকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ৪ আগস্ট ঢাকার মিরপুর-১০ নম্বরে গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে মারা যান তিনি। তার বাড়ি ফরিদপুর শহরের রঘুনন্দনপুর এলাকার হাউজিং এস্টেটে। তবে তিনি পরিবার নিয়ে ঢাকার মিরপুর-১১ নম্বরে থাকতেন। তার অফিস ছিল মিরপুর-১০ নম্বরে।

কামরুলের পরিবার সূত্রে জানা যায়, ৪ আগস্ট রাতেই তার লাশ ফরিদপুরে

■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৪

কামরুল ইসলাম সেতু

নিহত হওয়ার আগে মাকে ফোনে কুমিল্লার রাসেল

দেশ স্বাধীন করে ঘরে ফিরব মা, মরে গেলে শহিদ হব

আবুল খায়ের, কুমিল্লা

জহিরুল ইসলাম রাসেল। কাজ করতেন একটি পাদুকা কারখানায়। বিবেকের তাড়নায় যোগ দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে। টানা ১০ দিন ছিলেন রাজপথে। প্রতিদিন সকালে ফেসবুকে নিজের ওয়ালে ঘোষণা দিয়ে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় আন্দোলনে অংশ নিতেন। সরকার পতনের মাহেন্দ্রক্ষণে ৪ আগস্ট দুপুরে আন্দোলনের সম্মুখসারিতে থেকে ঢাকার গুলিস্তানে পুলিশের গুলিতে নিহত হন এই অকুতোভয় যুবক। সেদিন সকালে মায়ের সঙ্গে তার শেষ কথা হয়। মাকে বলেছিলেন, দেশ স্বাধীন করে ঘরে ফিরব মা, যদি মরে যাই তাহলে শহিদ হব। মৃত্যুর কতদিন পেরিয়ে গেলেও এই সংগ্রামী যুবকের পরিবারের

■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ১

সম্পাদক : সাইফুল আলম, প্রকাশক সালমা ইসলাম কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯
বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, jugantoradd@gmail.com.

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য সমূহ

নাম	: মো: কামরুল ইসলাম সেতু
জন্ম	: ২৩ অক্টোবর ১৯৭৬, ফরিদপুর
শহীদের পেশা	: ব্যবসায়ী, এস এ টোটাল সলুশনস
পিতা	: মরহুম মোতালেব হাওলাদার
মাতা	: মোছা: হামিদা বেগম, গৃহিণী
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন
পরিবারের উপার্জনক্ষম সদস্য	: ১ জন (শহীদ মো: কামরুল ইসলাম সেতু)
স্থায়ী ঠিকানা	: রঘুনন্দপুর হাউজিং স্টেটস, ব্লক-সি, প্লট- ১৬৪, ওয়ার্ড নং ৯, পৌরসভা, ফরিদপুর
পরিবারের অন্যান্য সদস্য	: স্ত্রী, ১ ছেলে এবং ১ মেয়ে ছেলে-আলভী বিন ইসলাম, ছাত্র, সিএসই বিভাগ, সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয় মেয়ে-উমাইয়া ইসলাম স্নেহা, ছাত্রী, এইচএসসি

শহীদ মো: রিয়াজ হোসেন

ক্রমিক : ২০৭

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৭৫

জন্ম পরিচয়

শহীদ রিয়াজ, জন্ম ২০০৩ সালে। দরিদ্র পরিবারের এই ছেলেটি জীবনের প্রথম থেকেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। পিতা একজন বৃদ্ধ প্রতিম ব্যক্তি, জীবিকার সংগ্রাম তাকে প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত, আর এই সংগ্রামের কষ্ট ছাপিয়ে উঠতো রিয়াজের জীবনেও।

তার শৈশব ছিল দুরন্ত, গ্রামবাংলার সবুজ মাঠে ঘুরে বেড়ানোর আনন্দে ভরা। শিশির ভেজা ঘাসে খালি পায়ে ছুটে চলার সে মুহূর্তগুলো যেন ছিল তার মুক্তির প্রতীক। মাঠে-মাঠে ঘুরে বেড়াত, গ্রামের মেঠোপথে খেলা করত। মাথার ওপর নীল আকাশ আর মনের মাঝে হাজারো রঙিন স্বপ্ন। দুরন্তপনা আর সৃষ্টিশীলতা মিলেমিশে তার শৈশবকে বানিয়ে তুলেছিল এক বিশুদ্ধ আনন্দের উৎস। তবে সে ছিল শুধু দুরন্তই নয়, অত্যন্ত মেধাবীও। প্রতিনিয়ত সে শিক্ষায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে চলত। দারিদ্র্যের দংশন সত্ত্বেও তার মনের মাঝে লুকিয়ে ছিল অসীম সম্ভাবনা। তার স্বপ্ন ছিল অনেক, চোখের সামনে ভেসে উঠত এক নতুন দিনের ছবি, যেখানে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত দেখত। হাজারো স্বপ্ন বুনে সে এগিয়ে যাচ্ছিল জীবনের পথে, নিজের ও পরিবারের দারিদ্র্যের বেড়াজাল ছিন্ন করার সংকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। রিয়াজের জীবন ছিল গ্রাম বাংলার এক সাধারণ ছেলের অসাধারণ সংগ্রামের কাহিনী, যে মেধা, মনন ও স্বপ্নের আলোয় জীবনের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে যেতে চেয়েছিল।

যেভাবে শহীদ হলেন

১৯ জুলাই ২০২৪, বসিলা ব্রিজে এক সংগ্রামী অধ্যায় রচিত হয়, যেখানে ছাত্র-জনতা অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মশাল জ্বালিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সারা দেশজুড়ে তখন বিক্ষোভের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল। সেই আগুনের শিখায় ছিলেন শহীদ রিয়াজ, এক দুরন্ত কিশোর, যে জন্মসূত্রেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আগুন ধারণ করেছিল। হাসিনার নানা অপকর্ম আর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তার অবস্থান ছিল অবিচল ও নির্ভীক। সেদিন, বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার মিছিল বসিলা ব্রিজের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, আর তাদের প্রতিরোধের শক্তি দেখে পুলিশের মনে ভীতি ও ক্রোধের সঞ্চার হচ্ছিল। আচমকাই সংঘর্ষের সূত্রপাত। পুলিশ ও বিজিবির সদস্যরা অস্ত্র হাতে শাস্ত্রের নামে আক্রমণ শুরু করলো। তাদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলো আওয়ামীলীগ ও অঙ্গ সংগঠনের একদল উগ্র কর্মী, যারা হেলমেট পরিহিত, হাতে লাঠি, রামদা, আর আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বিক্ষোভকারীদের দিকে এগিয়ে আসছিল, যেন এদের কণ্ঠস্বর চিরতরে স্তব্ধ করতে চায়। রিয়াজ ছিলেন এই আন্দোলনের অগ্রপথিক। নির্ভীক ও সাহসী, তিনি কোনো বাধার সামনে থেমে থাকেননি। মিছিলে প্রথম সারিতে ছিলেন তিনি, তার চোখে ছিল স্বাধীনতার অঙ্গীকার, হাতে ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার শপথ। হঠাৎ, গুলির আওয়াজে আকাশ কেঁপে উঠলো। রিয়াজ মাথায় গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তার রক্তে ভিজে উঠল সেই ব্রিজ, যা সাক্ষী হলো তার বীরত্বের। রিয়াজের নিথর দেহ মাটিতে পড়ে থাকলেও তার সাহসিকতা সেই মুহূর্তে অমর হয়ে গেল।

দুদিন পর, হাসপাতালের মর্গে তার নিথর দেহ পাওয়া যায়। পরিবারের জন্য যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। যে ছেলে ছিল তাদের স্বপ্ন, তাদের ভবিষ্যতের আলো, সেই আলো নিভে গেল ঘাতকের এক নির্মম গুলিতে। মায়ের চোখে ছিলো অশ্রুধারা, বাবার কণ্ঠে নীরব হাহাকার। তাদের সমস্ত আশা আর স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো এক মুহূর্তে। শহীদ রিয়াজ, যে তার সাহসিকতা আর বলিষ্ঠ অবস্থানের জন্য আজও স্মরণীয়, নিজের জীবন দিয়ে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পতাকা উড়িয়েছিলেন। তার রক্তে ভিজে গেছে বাংলাদেশের মাটি, আর সেই মাটিই তাকে এক অমর শহীদ করে রেখেছে।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের বক্তব্য

শহীদ রিয়াজ ছিল আমাদের সবার প্রিয়, প্রাণবন্ত একটি ছেলে। তার মুখে সবসময় হাসি লেগে থাকত, যেন দুঃখ-কষ্ট তাকে ছুঁতে পারত না। কেউ কোনো প্রশ্ন করলে, সে সদালাপী স্বভাবেই মিষ্টি ভাষায় উত্তর দিত। এই সরলতা আর ভালো ব্যবহারের জন্য সবার কাছেই ছিল সে অতি আপনজন। তাকে দেখলে বোঝা যেত, শৈশবের দুরন্তপনা তার রক্তে মিশে ছিল। মাঠে গেলেই রিয়াজকে দেখা যেত দৌড়ঝাঁপ করছে, বন্ধুদের সঙ্গে খেলায় মেতে উঠেছে। কিন্তু খেলাধুলার পাশাপাশি দায়িত্ববোধও তার সমান ছিল। যতই খেলায় মগ্ন থাকুক, সময়মতো কাজের ফাঁকে মাঠের কাজও সে করতো নিষ্ঠার সঙ্গে। ধর্মের প্রতি তার গভীর অনুরাগ ছিল। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিয়মিত পড়তো সে। মাঠে খেলতে খেলতে যখন নামাজের সময় হত, রিয়াজ আর এক মুহূর্ত দেরি করত না। নামাজের সময় হলে সে সব কাজ ফেলে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর কাছে দোয়া করতো। আমরা আজও রিয়াজকে স্মরণ করি সেই সদাহাস্য, সদালাপী দুরন্ত কিশোর হিসেবে, যার জীবনের প্রতিটি দিনই যেন মাঠে কাজ আর খেলার মধ্য দিয়ে এক সুসমন্বয়ে কাটত।

শহীদ পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ রিয়াজের গল্প এক মর্মান্তিক দারিদ্রের প্রতিচ্ছবি। ছোটবেলা থেকেই রিয়াজ দেখেছে কীভাবে তার বাবা অন্যের জমিতে বর্গা চাষ করেন, সারাদিনের ক্লান্ত পরিশ্রমের পরও যা পেটে খাবার জোটাতে যথেষ্ট নয়। সংসারে চার ভাইবোন, তাদের ভবিষ্যৎ গড়া তো দূরের কথা, প্রতিদিনের নুন আনতে পান্তা ফুরায়। মায়ের মুখে কষ্টের চিহ্ন দিনদিন গাঢ় হতে থাকে। কখনো কখনো ঘরে চাল না থাকলে সবাইকে উপোস করে কাটাতে হতো। তবু, এই দৈন্যদশার মধ্যেও রিয়াজের বাবা-মা স্বপ্ন দেখতেন, সন্তানদের শিক্ষিত মানুষ করার। তাদের বিশ্বাস ছিল, পড়াশোনা করলেই একদিন এই দারিদ্র্যের বেড়াজাল ভেঙে রিয়াজ আর তার ভাইবোনেরা আলোর পথে চলবে। কিন্তু বাস্তবের কঠিন লড়াইয়ে সেই স্বপ্নগুলি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিল। রিয়াজের জীবনে শৈশব বলতে ছিল না কোনো রূপকথা, ছিল না কোনো খেলাধুলার অবসর। মাঠে অন্যের জমিতে কাজ করতে করতেই তার দিন গড়াত। আর বাবা, প্রতিটি ধানগাছের মধ্যে স্বপ্ন বুনতেন যে কোনোদিন হয়তো এই কষ্টের দিন শেষ হবে। কিন্তু দিনগুলো শুধু কষ্টের জাল আরও শক্ত করে বেঁধে রাখত তাদের।

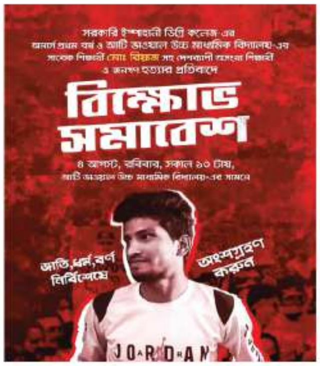

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: মোঃ রিয়াজ হোসেন
জন্ম তারিখ	: ০৯/০৩/২০০৩
পেশা	: শিক্ষার্থী ও দোকান কর্মচারী
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: ছোট ভাউয়াল, ইউনিয়ন : তারা নগর, থানা: কেরানীগঞ্জ, জেলা: ঢাকা
পিতার নাম	: আসহাব উদ্দিন
বয়স	: ৭০, কৃষি কাজ,
মাতার নাম	: শেফালি বেগম, ৫৪ পেশা-গৃহিণী
মাসিক আয়	: ৫০০০/-
আয়ের উৎস	: দোকান কর্মচারী
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন
	: ১) জুয়েল, বয়স- ২৭, বেকার
	: ২) রানা, বয়স- ২২, দোকান কর্মচারী
ঘটনার স্থান	: বসিলা ব্রিজ, ঢাকা
আক্রমণকারী	: ঘাতক পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল	: তারিখ-১৯ জুলাই ,২০২৪
নিহত হওয়ার সময়কাল	: তারিখ-১৯ জুলাই, ২০২৪, সেবাদাস হাসপাতাল
কবরস্থান	: পারিবারিক কবরস্থান

প্রস্তাবনা

বড় ভাই বেকার, তাকে চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া

স্থায়ী একটি ভাতার ব্যবস্থা করে দেওয়া

এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান

শহীদ আব্দুল আহাদ

ক্রমিক : ২০৮

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৭৬

পটভূমি

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আওয়ামী লীগ এক ঘৃণ্য নাম। দলটি যতবারই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পেয়েছে ততবারই ফ্যাসিবাদ কায়েম করে জনগণের সকল ধরনের অধিকার ক্ষুণ্ন করেছে। '৭২-'৭৫ একদলীয় স্বৈরশাসন কায়েমের ফলশ্রুতিতে সেনাবিদ্রোহে স্বপরিবারে নিহত হয় তৎকালীন একনায়ক শাসক শেখ মুজিবুর রহমান। এরপর কিছুদিন দলটির রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের উদারতায় অন্যান্য দলের মত আওয়ামী রাজনীতি করার বৈধতা পেলেও দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে কাটাতে হয় দলটিকে। এরশাদের স্বৈরশাসনের কারণে আবারও পুনর্বাসিত হওয়ার সুযোগ পায় আওয়ামীলীগ। প্রথমে ক্ষমতায় যেতে না পারলেও ১৯৯৬ সালে আরও একবার ক্ষমতার স্বাদ পায় দলটি। ক্ষমতা পেয়েই আবার পূর্বের আচরণে ফিরে আসতে চেষ্টা করে দলটি। এরই মধ্যে কেটে যায় পাঁচ বছর। জনগণও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ২০০১ সালের নির্বাচনে। বিভিন্ন সূত্রে জানায়, ২০০৮ সালের নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাথে যোগসাজশ করেছে, নির্বাচনের আগেই ক্ষমতা নিশ্চিত হয় আওয়ামীলীগের। নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী হন শেখ মুজিব কন্যা শেখ হাসিনা। শুরুতেই পূর্বপরিকল্পিত কথিত বিডিআর বিদ্রোহের নামে চৌকস সেনা অফিসার হত্যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে মেরুদণ্ডহীন করার উদ্যোগ। এরপর তত্ত্বাবধায়ক সরকার তুলে দিয়ে ভোট ছাড়া ক্ষমতায় থাকার বন্দোবস্ত। একে একে বিচার ব্যবস্থা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, দুর্নীতি দমন কমিশন, আমলাতন্ত্রসহ সকল কিছুকে জনগণের সেবার পরিবর্তে বানানো হয় শেখ হাসিনার ক্ষমতার হাতিয়ার। সরকারি চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয় শেখ হাসিনার ক্ষমতার সুবিধাজনক নিয়ম। আওয়ামী নেতাদের জন্য ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সনদ বানিয়ে তাদের সন্তান ও নাতি-নাতনীদের চাকুরী দিয়ে মেধাবীদের বঞ্চিত করে তৈরী করা হয় ৫৬% কোটা সিস্টেম।

শহীদ আব্দুল আহাদের পরিচয়

শিশু শহীদ আব্দুল আহাদ ২০২০ সালের ১২ জুলাই ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করে। চমৎকার একটি মুসলিম পরিবারে বেড়ে উঠতে যাচ্ছিল সে। কথা বলা শেখার সাথে সাথে সে শিখেছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা.)। দিনের অধিকাংশ সময় মোবাইলে কুরআন তিলাওয়াত শুনে সময় কাটত তার। মাকে নামাজ পড়তে দেখলেই পাশে দাঁড়িয়ে যেত সে মাকে অনুকরণ করতে। চোখের পানি সত্যিই ধরে রাখা কঠিন হয়ে যায় যখন আমরা জানতে পেরেছি, এরকম একটি নিষ্পাপ শিশুও স্বৈরাচারের নির্বিচার গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে।

যা ঘটেছিলো

১৯ জুলাই ২০২৪। দিনটি ছিল শুক্রবার। বাবা মায়ের সাথে বেলকনিতে দাঁড়িয়ে ছিল শিশু আহাদ। আপন মনে এটা ওটা দিয়ে খেলছিল। এই দুনিয়ার নির্মমতা বুঝার বয়স তার হয়নি। কারও প্রতি হিংসা-দ্বেষ-ক্ষোভ ছিল না তার মাসুম হৃদয়ে। বাসা থেকে অনেকটা দূরেই কোটার বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতা শান্তিপূর্ণ মিছিল নিয়ে বের হয়েছিল। সেই মিছিলে স্বৈরাচার সরকারের আদেশে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে পুলিশ ও আনসার বাহিনী। সাথে যোগ দেয় ছাত্রলীগ, যুবলীগসহ আওয়ামীলীগের বিভিন্ন সন্ত্রাসী বাহিনী। লাঠিপেটা, কোপানোর সাথে চলতে থাকে অজস্র গুলি। তার একটি গুলি চলে আসে আহাদদের বাসায়। গুলির শব্দ শুনে পিছন ফিরে আহাদের মা দেখেন চোখে গুলিবিদ্ধ হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে আহাদ। চিৎকার দিয়ে মূর্ছা যান মিসেস সুমি। আহাদকে নেয়া হয় হাসপাতালে। ডাক্তাররা জানান আহাদ আর নেই।

মাসুম বাচ্চার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে পরিবারটিতে। এখনো পাগলের মত আহাদের জিনিসপত্র নিয়ে ঝিম ধরে বসে থাকেন আহাদের মা। কখনো কখনো ঢুকরে কেঁদে উঠেন।

পারিবারিক অবস্থা

আহাদদের পারিবারিক অবস্থা ভালো। তার বাবা একজন আয়কর কর্মকর্তা। সুন্দর একটি ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে ছেলেকে ইসলামী সুশিক্ষায় শিক্ষিত করছিলেন তিনি। সে স্বপ্নের প্রদীপ নিভে গেলো একটি ঝড়ো বাতাসে। পরিবারে এখন কেবলই শোকের কালো ছায়া।

ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা
ময়না তদন্ত প্রত্যায়ণ পত্র

পৃষ্ঠ নং- 1031

সূত্র নং শাহবাগ থানা, জি.ডি./ইউ.ডি. মামলা নং ১২৬৪ তারিখ ২০/০৭/২৪ইং
মৃতের নাম আব্দুল আহাদ
ঠিকানা
পিতা/স্বামীর নাম আবুল হাসান
লিঙ্গ- পুরুষ/মহিলা বয়স (০৩) বৎসর/মাস
ধর্ম-মুসলমান/হিন্দু/বৌদ্ধ/খৃষ্টান
ময়না তদন্ত নং ১০৩৮/২০২৪ইং তারিখ ২০/০৭/২৪ইং

DEPARTMENT OF FORENSIC MEDICINE * DHAKA MEDICAL COLLEGE *

ময়না তদন্তকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর
নাম Dr. Fahmida Haque
পদবী Lecturer, Forensic Medicine, Dhaka Medical College, Dhaka

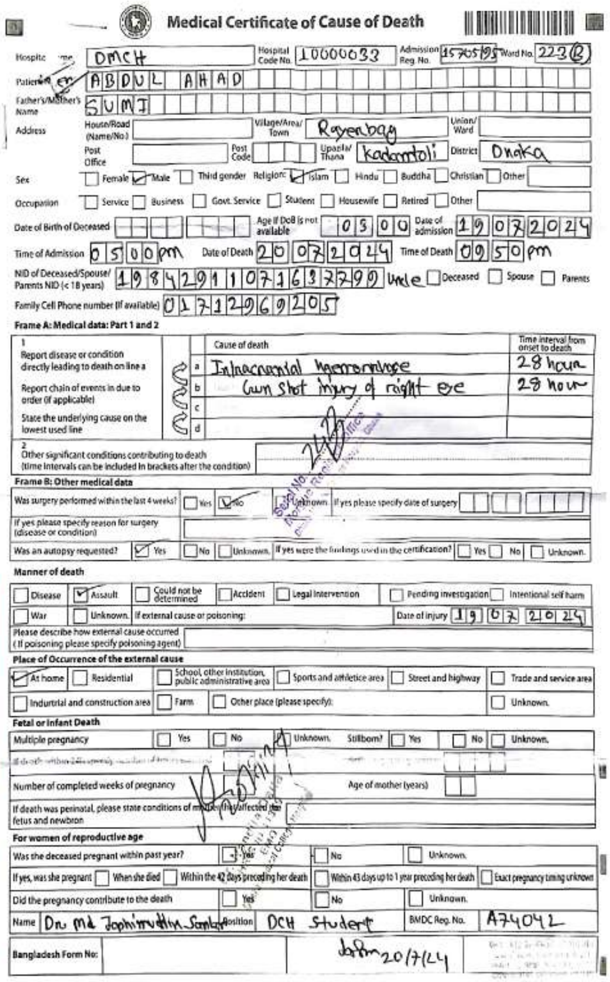

Medical Certificate of Cause of Death

Hospital Name: DMCH | Hospital Code No.: 10000033 | Admission Reg. No.: 1570595 | Ward No.: 223(B)

Patient Name: ABDUL AHAD

Father's/Mother's Name: SUMI

Address: House/Road (Name/No.): | Village/Area/Town: Rayerbag | Union/Ward:

Post Office: | Post Code: | Upazila/Thana: Kadamtoli | District: Dhaka

Sex: ☐ Female ☑ Male ☐ Third gender | Religion: ☑ Islam ☐ Hindu ☐ Buddha ☐ Christian ☐ Other

Occupation: ☐ Service ☐ Business ☐ Govt. Service ☐ Student ☐ Housewife ☐ Retired ☐ Other

Date of Birth of Deceased: | Age if DoB is not available: 03 00 | Date of admission: 19 07 2024

Time of Admission: 05 00 pm | Date of Death: 20 07 2024 | Time of Death: 09 50 pm

NID of Deceased/Spouse/Parents NID (< 18 years): 19842911071637799 Uncle ☐ Deceased ☐ Spouse ☐ Parents

Family Cell Phone number (if available): 01712969205

Frame A: Medical data: Part 1 and 2

1		Cause of death	Time interval from onset to death
Report disease or condition directly leading to death on line a	a	Intracranial haemorrhage	28 hour
Report chain of events in due to order (if applicable)	b	Gun shot injury of right eye	28 hour
State the underlying cause on the lowest used line	c		
	d		
2 Other significant conditions contributing to death (time intervals can be included in brackets after the condition)			

Frame B: Other medical data

Was surgery performed within the last 4 weeks? ☐ Yes ☑ No ☐ Unknown. If yes please specify date of surgery

If yes please specify reason for surgery (disease or condition)

Was an autopsy requested? ☑ Yes ☐ No ☐ Unknown. If yes were the findings used in the certification? ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown.

Manner of death

☐ Disease ☑ Assault ☐ Could not be determined ☐ Accident ☐ Legal intervention ☐ Pending investigation ☐ Intentional self harm

☐ War ☐ Unknown. If external cause or poisoning: | Date of injury: 19 07 2024

Please describe how external cause occurred (If poisoning please specify poisoning agent)

Place of Occurrence of the external cause

☑ At home ☐ Residential ☐ School, other institution, public administrative area ☐ Sports and athletice area ☐ Street and highway ☐ Trade and service area

☐ Indurtrial and construction area ☐ Farm ☐ Other place (please specify): ☐ Unknown.

Fetal or Infant Death

Multiple pregnancy ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown. Stillborn? ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown.

Number of completed weeks of pregnancy | Age of mother (years)

If death was perinatal, please state conditions of mother that affected the fetus and newbron

For women of reproductive age

Was the deceased pregnant within past year? ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown.

If yes, was she pregnant ☐ When she died ☐ Within the 42 days preceding her death ☐ Within 43 days up to 1 year preceding her death ☐ Exact pregnancy timing unknown

Did the pregnancy contribute to the death ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown.

Name: Dr. Md Jophiruddin Sarkar | Position: DCH Student | BMDC Reg. No.: A74042

Bangladesh Form No: | 20/7/24

একনজরে শহীদ আহাদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: মো: আব্দুল আহাদ
জন্ম	: ১২ই জুলাই ২০২০, ফরিদপুর
শহীদের পেশা	: শিশু
পিতা	: আবুল হাসান শান্ত, আয়কর কর্মকর্তা
মাতা	: কুহিনূর আক্তার সুমি, গৃহিণী
স্থায়ী ঠিকানা	: পুখুরিয়া, ভাঙা, ফরিদপুর
পরিবারের অন্যান্য সদস্য	: ১ ভাই: মেহরাব হাসান বিহান (৮), ছাত্র, হিফজ
শাহাদাৎ	: ১৯ জুলাই, ২০২৪ শান্তি নিবাস-২, মিরাজনগর, পুখুরিয়া, ভাঙা, ফরিদপুর

শহীদ তামিম শিকদার

ক্রমিক : ২০৯

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৭৭

শহীদের পরিচয়

রিকশাচালক জুয়েল শিকদারের একমাত্র পুত্র তামিম শিকদার ঢাকার রামপুরা প্রাইমারি স্কুলের ৩য় শ্রেণিতে লেখাপড়া করত। শিশু শহীদ তামিম শিকদার ২০১৪ সালে ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করে। থাকত ঢাকার রামপুরায়। চার বছর বয়সে পিতা মাতার বিচ্ছেদের পর থেকে দাদীর কাছে লালিত পালিত হচ্ছিল। দাদী ফুটপাতে পিঠা বিক্রি করে মানুষ করার চেষ্টা করছিল নাতিকে।

পটভূমি

২০১৮ সালে আন্দোলনের মুখে ফ্যাসিস্ট হাসিনা কোটা প্রথা বাতিল করলেও ২৪ সালের জুন মাসে তা পুনর্বহাল করে নিজের দ্বিচারিতার প্রমাণ দেয়। কোটা পূণর্বহালের প্রতিবাদে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা মাঠে নেমে আসে। শুরুতে পাবলিক

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন শুরু করলেও পরবর্তীতে তাদের সাথে সংহতি প্রকাশ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও মাঠে নেমে আসে। শুরু হয় এক দুর্বার আন্দোলন। এই আন্দোলনে যোগ দেয় সকল শ্রেণি, পেশা, লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণের জনতা। গ্রাম মহল্লা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে দ্রোহের আগুন। এই আন্দোলন দমাতে শুরুতে সরকার ব্যবহার করে তাদের ছাত্রলীগ নামক সন্ত্রাসী বাহিনীকে। এই সন্ত্রাসী বাহিনীর গেস্টরুম কালচার, চাঁদাবাজি, নির্যাতন, নিপীড়ন, ধর্ষণ, ইভটিজিং, যৌন হয়রানি, হত্যা, গুমের চর্চা দেখতে দেখতে আগে থেকেই ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রতি অতিষ্ট। তাই ছাত্রছাত্রীরা বীরদর্পে প্রতিহত করে এই সন্ত্রাসী বাহিনীকে। সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ বাহিনী ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধতার কাছে পরাজিত হওয়ার পর স্বৈরাচার সরকার ছাত্রদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয় পুলিশ বাহিনী। পুলিশের সাথে থাকা আনসার বাহিনীর হাতেও তুলে দেয় মারণাস্ত্র। র‍্যাব, বিজিবিসহ জনগণের সেবার জন্য তৈরি সকল বাহিনীকে নামিয়ে দেয় গণহত্যার আদেশ।

যেভাবে শহীদ হলো তামিম

১৯ জুলাই বেলা ৩টার সময় তামিম সহপাঠীদের নিয়ে রামপুরা এলাকায় বল খেলতে যায়। তার পাশে রাস্তার ওপর কোটা সংস্কার আন্দোলনের ছাত্র-জনতা ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ চলছিল।

অন্য শিশুরা জানায়, হঠাৎ তামিম চিৎকার দিয়ে পড়ে যায়। সবাই দেখে তামিমের বুক থেকে রক্ত বের হচ্ছে। তামিমের বাবা ও দাদি দৌড়ে গিয়ে দেখে তামিমের বুকে গুলি লেগেছে। রিকশা করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করানো হয়। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তামিমের বাবা জুয়েল শিকদার কান্না বিজড়িত কণ্ঠে সন্তান হত্যার বিচার দাবী করেন।

শহীদ সম্পর্কে বক্তব্য/অনুভূতি

তামিমের চাচি বলেন, শহীদ তামিম একজন অত্যন্ত বিনয়ী ও ভদ্র ছেলে ছিল। বাড়ির বড়দের সাথে কখনও খারাপ আচরণ করেনি। কারও সাথে মারামারি করত না।

পারিবারিক অবস্থা

তামিমের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। শহীদ তামিমের বাবা পেশায় রিকশাচালক। রিকশা চালিয়ে সামান্য যে আয় করেন তা দিয়ে পরিবারের ভরণপোষণ নির্বাহে হিমশিম খেতে হয় । এছাড়া শারীরিকভাবে তামিমের বাবা লিভারের সমস্যায় ভুগছেন। সংগত কারণে চাইলেও প্রতিদিন রিকশা চালাতে পারেন না। এমতাবস্থায় পরিবারে অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য তামিমকে উপার্জনের পথ ধরতে হয় ।

বিচারের মালিক তো আল্লাহ। তার কাছে ছেলে হত্যার বিচার চাই।
জানা যায়, রাকিব ময়মনসিংহের গৌরীপুরের রামগোপালপুর ইউনিয়নের ...মিশীও মধ্যপাড়ায় আব্দুল হালিম শেখের ছেলে। ২০ জুলাই কলতাপাড়া বাজারে কোটা আন্দোলনকে ঘিরে সংঘর্ষ ও গুলিবর্ষণের ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান তিনজন। তাদের মধ্যে একজন ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

রামপুরায় গুলিতে নিহত রামপুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী তামিম শিকদারের লাশ ছুঁয়ে মা তানিয়া বেগমের কান্না   যুগান্তর

রামপুরায় বুকে গুলি লেগে পড়ে যায় শিশু তামিম

বাবা-মা এখন পাগলপ্রায়

আব্দুল মান্নান, *ভাঙ্গা*

প্রতিদিনের মতো ১৯ জুলাই বিকালে রাজধানী ঢাকার রামপুরা এলাকায় মাঠে খেলছিল শিশুরা। মাঠের পাশের সড়কে তখন কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে শিক্ষার্থী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সময় হঠাৎ চিৎকার দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মাঠে থাকা দশ বছর বয়সি শিশু তামিম। সহপাঠীদের সামনেই বুকে গুলি খেয়ে রক্তাক্ত হয় শরীর। পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে নিলেও শেষ রক্ষা হয়নি তামিমের। পরিবারের একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে পুরো পরিবার এখন শোকার্ত। ফরিদপুরের ভাঙ্গার খাপুরা গ্রামের জুয়েল শিকদারের ছেলে তামিম। ১৫ বছর আগে পরিবার নিয়ে ঢাকার রামপুরা এলাকায় বসবাস শুরু করেন জুয়েল। রিকশা চালিয়ে অভাব-অনটনে সংসার চলত তার। সম্পদ বলতে জায়গা-জমি, ঘরবাড়ি কিছুই ছিল না। গ্রামের বাড়ি খাপুরায় মাঝেমধ্যে এসে অন্যের ঘরে থাকতেন। তবে পরিবারের আশার আলো ছিল একমাত্র ছেলে তামিম। রামপুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ত সে। কিন্তু তাকে হারিয়ে বাবা-মা এখন পাগলপ্রায়। টাকার অভাবে লাশ গ্রামের বাড়িতে এনে দাফনও দিতে পারেননি তারা। নিহত তামিমের বাবা জুয়েল বলেন, আমাদের বাসার আশপাশের মহল্লার শিশুরা বিকালে সড়কের পাশে প্রতিদিন মাঠে খেলতে যায়। ১৯ জুলাই বিকাল তিনটার দিকে তামিম সহপাঠীদের নিয়ে রামপুরায় বল খেলতে যায়। তখন সড়কে চলছিল কোটা সংস্কার আন্দোলন। সব শিশু তখন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে সংঘর্ষ দেখছিল। অন্য শিশুরা জানায়, হঠাৎ তামিম চিৎকার দিয়ে পড়ে যায়। সবাই দেখে তামিমের বুক থেকে রক্ত বের হচ্ছে। তারা আমাদের বাসায় এসে খবর দেয়। তিনি আরও বলেন, আমরা গিয়ে দেখি তামিমের বুকে একটি গুলি লেগেছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ওইদিন রাত ১২টার দিকে রামপুরা কবরস্থানে তাকে দাফন করি। ওকে হারিয়ে সবাই এখন পাগল হয়ে গেছে।

নিহত তামিমের চাচা খাপুরা গ্রামের মিরাজ শিকদার বলেন, তামিমের ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৩

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: তামিম শিকদার
জন্ম	: ২০১৪, ফরিদপুর
শহীদের পেশা	: ছাত্র, ৩য় শ্রেণি, রামপুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়
পিতা	: জুয়েল শিকদার (৩৪), রিকশাচালক
মাতা	: তানিয়া আক্তার, গৃহিণী
স্থায়ী ঠিকানা	: মুনসরাবাদ খাপুরা, ভাঙা, ফরিদপুর
বর্তমান ঠিকানা	: রামপুরা, ঢাকা
শাহাদাত	: ১৯ জুলাই রামপুরায় পুলিশের গুলিতে
সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা	: শহীদের দাদিকে এককালীন সহযোগিতা করা প্রয়োজন

শহীদ মোঃ মঈনুল ইসলাম

ক্রমিক : ২১০

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৭৮

পরিচিতি

পৃথিবীর বুকে সবাই সমানভাবে জন্ম নেয় না। কেউ সুখের ভিতরে কেউ দুঃখের ভিতরে জন্ম নেয়। পিতা মাতার আদর যত্নে অনেকে বেড়ে ওঠে আবার কেউ বেড়ে ওঠে দুঃখ কষ্টের মধ্যে। শহীদ মো: মঈনুল ইসলাম এরকমই একজন ছেলে ছিলেন। তিনি ছোটকাল থেকেই অনেক কষ্ট করে বেড়ে উঠেছিলেন। ১৯৯৯ সালের ২৮ অক্টোবর স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার প্রিয় এলাকা গোপালগঞ্জের কেকনিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শহীদ মো: মঈনুল ইসলাম। পিতা মো: কামরুল ইসলাম এবং মাতা মোছা: মাহফুজা বেগম। পিতা মাতার অনেক আদরের সন্তান ছিলেন শহীদ মইনুল ইসলাম। ইসলামিক বিষয়ে পড়াশোনা করানোর মাধ্যমে ছেলেকে আখেরাতে মুক্তির জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। শহীদ মইনুল ইসলাম বিয়ে করেছিলেন কিন্তু ঘর সংসার করা খুব বেশি দিন সম্ভব হয়নি। পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যা ছিল শহীদ মইনুল ইসলামের। মঈনুল ইসলামের দুই ভাই মোস্তাফিজুর রহমান এবং মাহমুদুর রহমান হেফজখানায় লেখাপড়া করেন। পিতা মো: কামরুল ইসলাম মসজিদে মুয়াজ্জিনের চাকরি করে সংসার চালান। গত পাঁচ বছর থেকে শহীদ মঈনুল ইসলাম ঢাকায় অবস্থান করছেন। শহীদ মইনুল ইসলাম মৃত্যু কালীন অবস্থায় একটি কওমী মাদ্রাসায় অল্প কিছু বেতনে চাকরি করতেন। চাকরির পাশাপাশি তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসার শিক্ষক এবং ছাত্রদের সাথে তার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেখান থেকেই ইসলাম এবং ইসলামী আন্দোলনের মূল বিষয়গুলো তিনি অনুধাবন করতে পারেন। অবশেষে জালিম সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি তার জীবন উৎসর্গ করলেন। সবাই দুনিয়াতে থাকলো কিন্তু সন্ত্রাসী পুলিশের গুলিতে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হল। অনেকেই হয়তো ভাবছে ছেলেটা অনেক কষ্ট করেছিল কষ্টের মধ্যেই মরতে হল, কিন্তু না, শাহাদাতের মৃত্যু কষ্টের না, শাহাদাতের মৃত্যু সৌভাগ্যের।

শাহাদাতের ঘটনা

ইতিহাসের রেখা রক্ত ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে লেখা যায় না। বিজয় শুধু মাথার খুলি দিয়ে তার দালান তৈরি করে। গৌরব এবং সম্মান শুধুমাত্র আহত এবং মৃতদের ভিত্তির উপর উঠতে পারে। সাম্রাজ্য, অভিজাত মানুষ, রাষ্ট্র এবং সমাজ এই উদাহরণ দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যারা মনে করে যে তারা রক্ত, ত্যাগ, আহত মানুষ, বিশুদ্ধ ও নিষ্পাপ প্রাণ ছাড়াই সত্যকে পরিবর্তন করতে পারে বা সমাজকে পরিবর্তন করতে পারে, তারা এই ইসলাম ধর্মের মর্ম বোঝে না এবং নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষাও জানে না।

"তোমরা কি মনে করো যে, আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা সংগ্রাম করে এবং ধৈর্যশীল তাদের চিহ্নিত না করেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে?" (সূরা আল-ইমরান, আয়াত ১৪২)

এই কারণে, জাতির প্রতিষ্ঠাতা এবং বিজয়ের স্থপতি কম। যে ব্যক্তি বিজয়ের স্থপতি হতে চায়, এই ব্যক্তিকে তার রক্ত ও ঘামের সাগর দিয়ে আত্মত্যাগ করতে হবে যতক্ষণ না সে তার মূল্যে বিজয় অর্জন করে। তাকে অবশ্যই তার চারপাশের লোকদের রক্ত এবং তার দায়িত্বের অধীনে থাকা বাধাগুলো উৎসর্গ করতে হবে। আর এই পথ অতিক্রম না করলে বিজয় অর্জিত হতে পারে না।

শহীদ মাঈনুল ধর্মের সেই মর্ম বুঝেছিলেন এবং নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাও জেনেছিলেন। তাই তিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে এবং মিথ্যাকে ধ্বংস করতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছিলেন।

তিনি সকল সময় শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করতেন। অবশেষে শহীদ মঈনুল ইসলামের স্বপ্ন পূরণ হলো। কিন্তু সেটা যুদ্ধের ময়দানে নয় সেটা বিজয়ের ময়দানে। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার পোষা সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী শহীদ মঈনুল ইসলামকে বিজয় উল্লাস করতে দিল না। মঈনুল ইসলামের কোন সমস্যা নেই কারণ তিনি বিজয় উল্লাস করবেন জান্নাতের মধ্যে ইনশাল্লাহ। যেদিন হত্যাকারীরা চিৎকার করে বলবে, হায় আমরা যদি আবার দুনিয়াতে যেতে পারতাম এবং তাহলে আমরা অবশ্যই ভালো ভালো কাজ করতাম এবং আল্লাহর জন্য শহীদ হতাম! কিন্তু তাদের এই সুযোগ কখনো দেওয়া হবে না।

মূল ঘটনা

শহীদ মঈনুল ইসলাম জেনেছে স্বৈরাচার সরকারের পতন হয়েছে তারপরেও আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীদের প্রকাশ্যে গুলি চালানোর সাহস কিভাবে হয়! সে ভেবেছিল হয়তো সন্ত্রাসীরা আর গুলি চালাতে পারবে না ।কিন্তু কে জানে আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসী পুলিশ শহীদ মঈনুল ইসলামসহ সাধারণ ছাত্র-জনতার উপর এভাবেগুলি করবে! আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনীর উপরের চেহারা দেখে তো আর বোঝার উপায় নেই যে তারা মানুষ নয় তারা হিংস্র জানোয়ারের চাইতেও বেশি কিছু। শেখ হাসিনা এমনভাবে এদেরকে তৈরি করেছে যেন বিন্দু পরিমাণ এদের অন্তরে মায়া মহব্বত নেই।শহীদ মঈনুল ইসলামের সমস্ত ভাবনাকে দূর করে দিয়ে তার দিকে ধেয়ে আসে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের পোষা পুলিশ বাহিনীর হেলিকপ্টার থেকে ছোড়া বুলেট। সাথে সাথে অশান্তিতে ভরা, নৈরাজ্যপূর্ণ এই পৃথিবীর মায়া মহব্বত ত্যাগ কর শান্তিময় জান্নাতের দিকে চলে যান শহীদ মঈনুল।

৫ আগস্ট ২০২৪ দীর্ঘ দিনের আন্দোলনের পর স্বৈরাচার শেখ হাসিনা পদত্যাগ করল। দেশ থেকে স্বৈরাচার শাসকের বিদায় হল। দেশের সকল জনগণ আজ নতুন করে স্বাধীনতা অর্জন করল। স্বাধীনতার এই দিনে সবাই মুক্ত আকাশের নিচে বিজয় উল্লাস করতে বের হয়েছে। শহীদ মঈনুল ইসলামও যোহরের নামাজের পর তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসার রোডে বিজয় উল্লাস এর জন্য বের হলেন। সকাল থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন তিনি। দুপুরে বাড়ি থেকে আবার তিনি বিজয়ের স্বাদ গ্রহণ করতে রাস্তায় নেমে আসলেন। বিভিন্ন জায়গায় স্বৈরাচার শেখ হাসিনার দোসর ও পুলিশ বাহিনী গুলি চালাচ্ছিলো তখনো। এমনকি এই গণহত্যায় জড়িত সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী হেলিকপ্টার থেকে সাধারণ ছাত্র-জনতার ওপরে নির্বিচারে গুলি চালাতে লাগল। সাধারণ মুক্তিকামী ছাত্র-জনতা এদিকে ওদিকে পালাতে লাগল। অনেকেই বুঝে ওঠার আগেই পুলিশের গুলিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগলো। রাস্তা রক্তে লাল হয়ে গেল। এরই মাঝে দুপুর ২:৪০ টার দিকে হঠাৎ মইনুল ইসলামের বুকে গুলি লেগে পেছন দিক থেকে বেরিয়ে যায়। এটি সাধারণ কোনো গুলি নয়। এটি ছিল সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনীর হেলিকপ্টার থেকে স্পেশাল রাইফেল দিয়ে ছোড়া গুলি। মঈনুল ইসলামকে সাধারণ জনতা ধরাধরি করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যায়।ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে দীর্ঘ ৭ দিন মৃত্যুর সাথে লড়াই করে অবশেষে হেরে যান। চলে যান এই দুঃখ কষ্ট আর যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবী ছেড়ে সুন্দর শান্তিময় এক জগতে।

শহীদের পিতার বক্তব্য

মৃত্যু সকলের জন্য অবধারিত কেউ স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করে আবার কেউ অস্বাভাকি মৃত্যুবরণ করে। আর কিছু মৃত্যু হয় স্মরণীয় মৃত্যু। আর আমার মঈনুল সবসময় সে স্মরণীয় মৃত্যুই কামনা করত। তার মৃত্যুতে আমি মোটেও দুঃখিত না বরং শহীদের পিতা হতে পেরে আমি গর্বিত। তবে যারা আমার সন্তানকে অন্যায় ভাবে হত্যা করল তাদের সকলের ফাঁসি হোক সেটাই চাই। গণহত্যাকারী শেখ হাসিনার যেন বাংলাদেশের আদালতে রায়ের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়। সেজন্য আমি নতুন সরকারের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

শহীদের পারিবারিক অবস্থা

শহীদের পরিবারে অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই করুণ। স্থায়ী তেমন কোন সম্পত্তি নেই। পিতার মোয়াজ্জেমি করে যা আয় হয় তাতে কোনরকম সংসার চলে। দুই ভাই এখনো লেখাপড়া করেন। শহীদ মঈনুলকে হারিয়ে মা পাগলের মত হয়ে গেছেন। শহীদ মঈনুল এর স্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে নিজ পিতা-মাতার বাড়িতে অবস্থান করেন।

একনজরে শহীদ মো: মঈনুল ইসলাম

নাম	: মো: মঈনুল ইসলাম
জন্ম তারিখ	: ২৮-১০-১৯৯৯
জন্মস্থান	: কেকনিয়া, গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ
পেশা	: শিক্ষকতা, মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসা, নগরকান্দা,ঢাকা
বর্তমান ঠিকানা	: কেকনিয়া, গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ
স্থায়ী ঠিকানা	: কেকনিয়া, গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ

পরিবার

পিতার নাম	: মো: কামরুল ইসলাম (৫৫) মসজিদের মুয়াজ্জিন
মাতার নাম	: মাহফুজা বেগম (৪০) গৃহিণী
বৈবাহিক অবস্থা	: বিবাহিত

ভাই

১. মোস্তাফিজুর রহমান (২২)
২. মাহামুদুর রহমান (২০)

আঘাতকারীর	: সন্ত্রসী পুলিশ
আহত হওয়ায় ও স্থান সময়	: ঢাকা তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ০৫-০৮-২০২৪ বিকেল ২:৪০টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ১২-০৮-২০২৪, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাত ৯.০০টা
জানাজা	: ১৩-০৮-২০২৪, সকাল ১১:০০টা
কবরস্থান	: গোপালগঞ্জ সদর

প্রস্তাবনা

১. নিয়মিত মাসিক আর্থিক সহায়তা প্রদান
২. ব্যবসায়িক কাজে মূলধন সহায়তা প্রদান

বিজয় মিছিল করতে গিয়ে ফিরলেন লাশ হয়ে

শহীদ সাবিদ হোসেন

ক্রমিক : ২১১
আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৭৯

পরিচিতি

শহীদ সাবিদ হোসেন বাংলার মাটিতে জন্ম নেওয়া এক সাহসী ও প্রতিভাবান তরুণ। তিনি ২০০৯ সালের ১ ডিসেম্বর গোপালগঞ্জ জেলার মকসুদপুর থানার ডিগ্রীকান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাহমুদুল হোসেন কৃষক হিসেবে জীবনযাপন করেন এবং মাতা সালমা জাকেরা স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা।

সাবিদ ছোটবেলায় গাজীপুরে চলে আসেন এবং সেখানে তাঁর আঙ্কেলের(ফুফা ফুফুর বাসা) কাছে থেকে পড়ালেখা শুরু করেন। সেখানে তিনি একটি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। পড়ালেখার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল, এবং বাবা-মায়ের থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও তিনি কঠোর পরিশ্রম করে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করতেন।

মৃত্যুকালে সাবিদ গাজীপুরের রেঁনেসা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর এসএসসি পরীক্ষা শিগগিরই অনুষ্ঠিত হতে চলেছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান বালক। তিনি দুই ভাইবোনের মধ্যে ছোট, এবং তাঁর বড় বোন এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন।

দুঃখজনকভাবে, সাবিদ অকালেই মৃত্যুবরণ করেন, যা তাঁর পরিবার ও আত্মীয়দের জন্য একটি গভীর শোকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মা-বাবা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাঁর শোকসাগরে ডুবে রয়েছেন।

শহীদ সাবিদ হোসেনের জীবন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, প্রতিটি তরুণের মধ্যে অসীম সম্ভাবনা থাকে এবং তাদের স্বপ্ন পূরণের জন্য আমাদের সমর্থন প্রয়োজন। তাঁর স্মৃতি ও আদর্শ চিরকাল আমাদের মনে থাকবে।

শাহাদাতের ঘটনার বর্ণনা

শহীদ সাবিত হোসেন ৫ আগস্ট ২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিজয় মিছিল থেকে শাহাদাত বরণ করেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কোটা সংস্কার আন্দোলনকে স্বৈরাচারী হাসিনা রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপদান করেন। ৫৬% অযৌক্তিক কোটার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক ও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সমাবেশকে দমন করার লক্ষ্যে লেলিয়ে দেয় পুলিশ ও দলীয় গুণ্ডা বাহিনী। সারাদেশে চালানো হয় শিক্ষার্থীদের উপরে ক্র্যাকডাউন। ১৫ জুলাই থেকে দেশের পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যেন ছাত্র পরিচয় একটি আতংকের নাম। কোন শিক্ষার্থী তাদের নিজস্ব পরিচয় নিয়ে রাস্তা-ঘাট ও হাট-বাজারে বের হতে পারেনি। যেখানেই কোন ছাত্র বা ছাত্রী পেয়েছে সেখানেই তাদের উপর চালিয়েছে নৃশংস হামলা। বাসা বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে দেওয়া হয়েছে হত্যা মামলার মত জঘন্য মিথ্যা মামলা। রাস্তায় বের হলে পুলিশ বিজিবি নির্দ্বিধায় গুলি করে মেরেছে ছাত্রদেরকে। প্রথমদিকে ছাত্রদের আন্দোলন থাকলেও ১৮ তারিখের পরে তা রূপ নেয় ছাত্র-জনতার আন্দোলন। ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে দমন করার

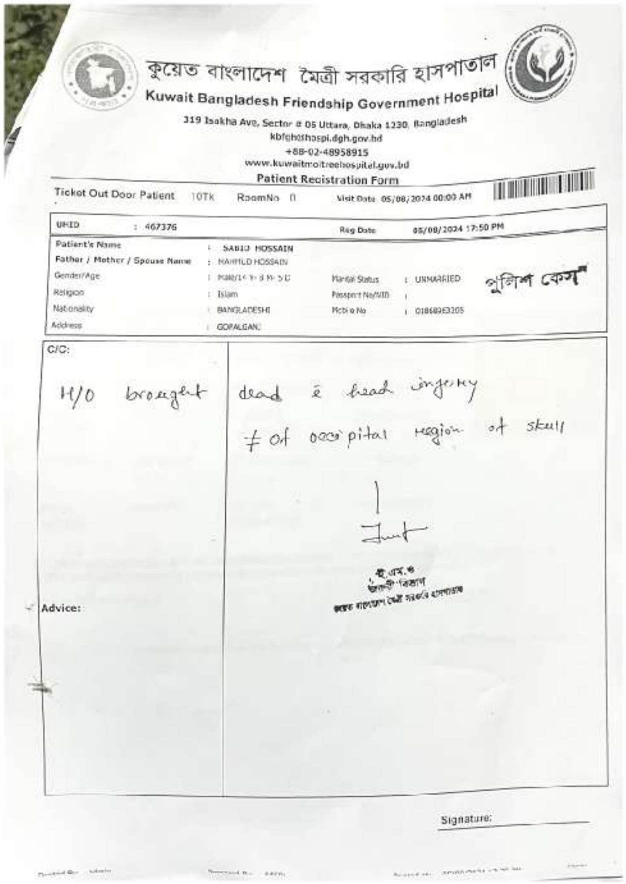
কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতাল
Kuwait Bangladesh Friendship Government Hospital
319 Isakha Ave, Sector # 05 Uttara, Dhaka 1230, Bangladesh
kbfghoshospi.dgh.gov.bd
+88-02-48958915
www.kuwaitmoitreehospital.gov.bd
Patient Reoistration Form
Ticket Out Door Patient 10TK RoomNo 0 Visit Date 05/08/2024 00:00 AM
UHID : 467376 Reg Date 05/08/2024 17:50 PM
Patient's Name : SABID HOSSAIN
Father / Mother / Spouse Name : MAHMUD HOSSAIN
Gender/Age : Male/14 Y- 8 M- 5 D Marital Status : UNMARRIED পুলিশ কেস
Religion : Islam Passport No/NID :
Nationality : BANGLADESHI Mobile No : 01868963205
Address : GOPALGANJ
C/C:
H/O brought dead ē head injury
# of occipital region of skull
Advice:
Signature:

জন্য দেওয়া হয়েছিল কারফিউ। কারফিউর মধ্যেই ছাত্র-জনতা রাস্তায় নামলে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। যা মোবাইল ইন্টারনেট ও ব্রডব্যান্ড সেবা বন্ধ করে দিয়ে বিশ্বের কাছে লুকাতে চেয়েছে স্বৈরাচারী সরকার। ক্রমান্বয়ে আন্দোলন দেশ থেকে বিদেশেও ছড়িয়ে যায়। বিদেশ থেকে প্রবাসীরা রেমিটেন্স পাঠানো বন্ধ করে দেয়। বিদেশ থেকে প্রবাসীরা এভাবেই হাসিনার হত্যা মহাযজ্ঞের প্রতিবাদ করেছিল। শেষ পর্যায়ে ৫ তারিখে হাসিনা পদত্যাগ করে পালিয়ে যেতে বাধ্য। ১৫ বছরের দুঃশাসন থেকে মুক্তি পেয়ে দেশের সকল মুক্তিকামী ছাত্র-জনতা রাস্তায় বিজয় উল্লাস করতে থাকে।

সেই বিজয় উল্লাসে অংশগ্রহণ করতে শহীদ সাবিদ ও তার কয়েকজন বন্ধু বাসা থেকে বের হয়। তারা টঙ্গী থেকে বিজয় মিছিল করতে করতে উত্তরা আজমপুর এর কাছে আসে। সেখানে দেখতে পান পুলিশ ও যুবলীগ আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা শিক্ষার্থী ও নাগরিকদের উপর গুলি চালাচ্ছে। দুর্ভাগ্য ক্রমে শহীদ সাবিদের মাথায় একটি গুলি বিদ্ধ হয়। শহীদ সাবিত কে সেখান থেকে তার বন্ধু সাগর ও অন্যান্য বন্ধুর সাহায্যে কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রচণ্ড রক্তক্ষরণের কারণে শহীদ সাবিত মৃত্যুবরণ করেন। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন।তার বন্ধু সাগর শহীদ সাবিদের পিতাকে বিকাল ৫ টার দিকে ফোন দিয়ে তার শাহাদাতের খবর জানালে পরিবারের সবাই কান্নায় ভেঙে পড়েন। পিতা-মাতার একমাত্র ছেলে সন্তান কে হারিয়ে যেন তারা এখন নিঃস্ব।

শহীদ পরিবারের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

শহীদের পিতা কৃষিকাজ করেন এবং তার মাতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তারা প্রতি মাসে প্রায় ২০ হাজার টাকা উপার্জন করেন। শহীদের একটিমাত্র বোন যিনি এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছেন ২০২৪ সালেই। পিতা মাতা সন্তানকে হারিয়ে নিঃস্ব হলেও অর্থনৈতিকভাবে তারা কিছুটা স্বাবলম্বী।

শহীদের স্বজনদের স্মৃতি বর্ণনা

রেঁনেসা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বলেন, মানুষ বিভিন্নভাবে মারা যায়। কেউ মারা যায় সৎ পথে, দেশের জন্য যুদ্ধ করতে করতে। আমাদের শহীদ সাবিদ খুবই ভালো ছেলে, যে দেশের জন্য শাহাদাত বরণ করেছেন।

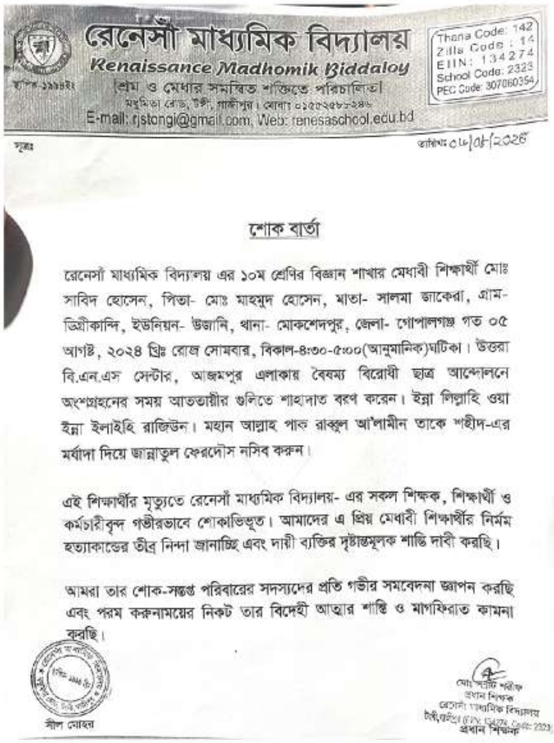

রেনেসাঁ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
Renaissance Madhomik Biddaloy
শ্রম ও মেধার সমন্বিত শক্তিতে পরিচালিত।
E-mail: rjstongi@gmail.com, Web: renesaschool.edu.bd

Thana Code: 142
Zilla Code : 14
EIIN: 134274
School Code: 2323
PEC Code: 307060354

সূত্রঃ

তারিখঃ ০৮/০৮/২০২৫

শোক বার্তা

রেনেসাঁ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর ১০ম শ্রেণির বিজ্ঞান শাখার মেধাবী শিক্ষার্থী মোঃ সাবিদ হোসেন, পিতা- মোঃ মাহমুদ হোসেন, মাতা- সালমা জাকেরা, গ্রাম- ডিগ্রীকান্দি, ইউনিয়ন- উজানি, থানা- মোকশেদপুর, জেলা- গোপালগঞ্জ গত ০৫ আগষ্ট, ২০২৪ খ্রিঃ রোজ সোমবার, বিকাল-৪:৩০-৫:০০(আনুমানিক)ঘটিকা। উত্তরা বি.এন.এস সেন্টার, আজমপুর এলাকায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহনের সময় আততায়ীর গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আ'লামীন তাকে শহীদ-এর মর্যাদা দিয়ে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুন।

এই শিক্ষার্থীর মৃত্যুতে রেনেসাঁ মাধ্যমিক বিদ্যালয়- এর সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীবৃন্দ গভীরভাবে শোকাভিভূত। আমাদের এ প্রিয় মেধাবী শিক্ষার্থীর নির্মম হত্যাকান্ডের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং দায়ী ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করছি।

আমরা তার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং পরম করুনাময়ের নিকট তার বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করছি।

সীল মোহর

প্রধান শিক্ষক
রেনেসাঁ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: শহীদ সাবিদ হোসেন
জন্ম তারিখ	: ০১-১২-২০০৯
ধর্ম	: ইসলাম
পেশা	: শিক্ষার্থী
জাতীয়তা	: বাংলাদেশী
প্রতিষ্ঠান	: রেনেসাঁ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টঙ্গী, গাজীপুর
বৈবাহিক অবস্থা	: অবিবাহিত
পিতার নাম, বয়স,অবস্থা	: মো: মাহমুদ হোসেন, পেশা: কৃষি কাজ
মায়ের নাম, পেশা	: সালমা জাকেরা, পেশা: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক
পারিবারিক সদস্য	: ৩ জন
ভাই বোন সংখ্যা	: এক ভাই, এক বোন
	: ১.ফারজানা তাসনিম, পেশা: শিক্ষার্থী, শ্রেণী: এইচএসসি পরীক্ষার ফলপ্রার্থী
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ডিগ্রী কান্দি, ইউনিয়ন: উজানি, থানা: মকসুদপুর, জেলা: গোপালগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: টঙ্গী, গাজীপুর
ঘটনার স্থান	: উত্তরা আজমপুর
আঘাতকারী	: পুলিশ বাহিনী
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৫ আগস্ট ২০২৪ ইং, আনুমানিক বিকাল পাঁচটা।
নিহত হওয়ার সময়কাল, স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪, কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতাল, উত্তরা,ঢাকা
শহীদের কবরে বর্তমান অবস্থান	: ডিগ্রিকান্দি, উজানী, মোকসেদপুর, গোপালগঞ্জ। নিজ গ্রামে
প্রস্তাবনা	: শহীদ সাবিদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নিশ্চিত করা।
	: একমাত্র বোনের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা।
	: এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান।

ফুলের মত তিন শিশুকে ইয়াতিম করেছে স্বৈরাচার হাসিনা

শহীদ বাবু মোল্লা

ক্রমিক : ২১২

আইডি : ঢাকা বিভাগ-০৮০

শহীদ বাবু মোল্লার পরিচয়

শহীদ বাবু মোল্লা, গোপালগঞ্জ জেলার মকসুদপুর থানার দক্ষিণ গঙ্গারামপুর গ্রামের সন্তান, একজন সংগ্রামী ব্যক্তি যিনি জীবনের প্রতিটি বাঁকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, তিনি অতি ছোটবেলা থেকেই কঠোর বাস্তবতার সঙ্গে লড়াই করেন। পিতা ফারুক মোল্লার অকাল মৃত্যুতে পরিবারে নেমে আসে কঠিন বিপর্যয়। মায়ের সাহসে বেড়ে ওঠা শহীদ বাবু, যিনি ছোটবেলায় অনেক কষ্ট সয়ে বড় হন, অটোরিকশাচালক হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

জীবন সংগ্রাম

অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেও বাবু মোল্লা জীবনের প্রতি আশাবাদী ছিলেন। তিন সন্তানের পিতা হিসেবে, তার জীবনের লক্ষ্য ছিল সন্তানদের ভালোর পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বড় মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করে, তিনি আশা করেছিলেন যে তার মেয়ে একদিন তাদের পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করবে। কিন্তু সংসারের দায়িত্বের কারণে একবার ৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ছোট মেয়ের জন্মের সময় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে যায়। রিকশার মালিক রিকশাটি বিক্রি করে দেওয়ার পর, বাবু বাধ্য হয়ে ঢাকা শহরে চলে যান ঋণ পরিশোধের জন্য।

স্বপ্নের পরাজয়

ঢাকায় তিন দিন রিকশা চালনোর পরেই বাবু মোল্লা দুর্ভাগ্যক্রমে শহীদ হয়ে যান। তার জীবন সংগ্রাম, স্বপ্ন ও আশা, সব কিছুই থেমে যায়। তবুও, তার রেখে যাওয়া তিনটি সন্তান দুই মেয়ে ও এক ছেলে বাবার স্বপ্ন ও আদর্শকে ধারক হিসাবে নিয়ে চলবে। বাবু মোল্লার জীবন একটি প্রেরণা, যেখানে দারিদ্র এবং সংগ্রামের মধ্যেও একটি পরিবারে ভালোবাসা এবং আশা বিদ্যমান।

মৃত্যুর পরেও বাবু মোল্লার স্মৃতি, তার অসীম সাহস ও আত্মত্যাগ, সন্তানদের জন্য এক অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। তাদের জীবনযাত্রা ও শিক্ষার মধ্যে বাবু মোল্লার মূল্যবোধের ছাপ স্পষ্টভাবে দেখা যাবে, যা তার সত্যিকারের অর্জন।

শহীদের শাহাদাত বরণের ঘটনা

২০২৪ সালের জুলাই মাসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু হয় কোটার সংস্কার দাবিতে। প্রথমে শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে আসলেও দ্রুতই আন্দোলনে সাধারণ জনগণ ও অভিভাবকরাও যুক্ত হন।

১৮ জুলাই, ছাত্ররা সর্বাত্মক অবরোধের ডাক দেয়, যা ঢাকাসহ সারাদেশে কার্যকর হয়। আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশী নির্যাতন শুরু হয়, এবং সরকার মোবাইল ইন্টারনেট পরিসেবা বন্ধ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে।

১৯ জুলাই, আন্দোলনের সমর্থনে রাজধানীসহ সারা দেশে পুলিশ এবং যুবলীগের সন্ত্রাসীরা ছাত্রদের ওপর আক্রমণ চালায়। দেশে কারফিউ জারি করে সেনা মোতায়ন করা হয়। বিজিবি ও পুলিশ নৃশংস ভাবে হত্যা করে ছাত্র জনতাকে। হেলিকপ্টার থেকে গুলি করে পুলিশ বাহিনী।

এরই মধ্যে বাবু মোল্লাকে ঢাকা যেতে হয়। অটো রিকশাচালক বাবু মোল্লার ছোট মেয়ের জন্মের সময় পাঁচ হাজার টাকা ঋণ করতে হয়। মেয়ের জন্মের কিছুদিন পর অটোরিকশার মালিক রিকশা বিক্রি করে দিলে বিপদে পরে যান তিনি। কোন উপায় না পেয়ে ১৪ জুলাইয়ে তিনি ঢাকা শহরে যান রিকশা চালানোর জন্য। রিকশা চালিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে পারলে তিনি আবার ফিরে আসবেন গ্রামে ছেলে মেয়ে ও স্ত্রীর কাছে। তিনি ঢাকায় গিয়ে গ্যারেজ থেকে রিকশা নিয়ে বেশ ভালোভাবেই রিকশা চালাচ্ছিলেন। ১৮, ১৯ তারিখে ছাত্র আন্দোলনের অনেককেই পুলিশ গুলি করে আহত-নিহত করলে তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে সহায়তা করেন তিনি। ১৯ তারিখ শুক্রবার জুমার নামাজের পরে রিকশা নিয়ে তার ভগ্নিপতির সাথে বের হন। একটু পর পুলিশ ও যুবলীগের সন্ত্রাসী বাহিনীরা ছাত্র জনতার ওপর গুলি চালাতে থাকে। বিকাল ৪ টার দিকে রিকশা চালানো অবস্থায় শহীদ বাবু মোল্লার শরীরে গুলি লাগে। তার ভগ্নিপতি ও স্থানীয়রা তাকে ফরাজি হাসপাতালে নিয়ে গেলে রাত আটটার সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান জনাব বাবু মোল্লা।

তিন শিশু সন্তানের অসহায়ত্ব

শহীদ বাবু মোল্লার ছোট ছোট তিনটি বাচ্চা সন্তান রয়েছে। তার ছোট মেয়ের বয়স মাত্র ৫ বছর। এই মুহূর্তে স্ত্রীর পক্ষে কোন কাজ করা সম্ভব নয়। একমাত্র উপার্জনক্ষম স্বামীকে হারিয়ে স্ত্রী তার সন্তানদেরকে নিয়ে এক মানবেতর জীবন যাপন। তার পরিবারকে দেখাশোনা করার মত কোন ব্যক্তি আর নেই। কে দেখবে এই পাঁচ সাত বছরের ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনা। কে নিবে তাদের পড়াশোনা ও লালন পালনের দায়িত্ব? তাদের জীবনের এই করুণ পরিস্থিতি লিখে প্রকাশ করার সম্ভব নয়।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: শহীদ বাবু মোল্লা
ধর্ম	: ইসলাম
পেশা	: রিকশাচালক
বৈবাহিক অবস্থা	: বিবাহিত
পরিবারিক সদস্য	: ৪ জন
ছেলেমেয়ে	: ৩ জন ১. মেয়ে: রোজা মণি, বয়স: ৮, শ্রেই: শিশু শ্রেণী ২. ছেলে: ইয়ামিন মোল্লা, বয়স: ০৫ ৩. মেয়ে: বয়স: ২ মাস
পিতার নাম	: মৃত ফারুক মোল্লা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: দক্ষিণ গঙ্গারামপুর, ইউনিয়ন: সিন্দাঘাট, থানা: মকসুদপুর, জেল: গোপালগঞ্জ
বর্তমান ঠিকান	: দক্ষিণ গঙ্গারামপুর, ইউনিয়ন: সিন্দাঘাট, থানা: মকসুদপুর, জেল: গোপালগঞ্জ
ঘটনার স্থান	: রামপুরা
আঘাতকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময় কাল	: ১৯ জুলাই ২০২৪ আনুমানিক বিকাল ৪: ০০টা
নিহত হওয়ার সময়কাল, স্থান	: ১৯ জুলাই ২০২৪, রাত ৮.০০ টা, ফরাজি হাসপাতাল, রামপুরা, ঢাকা
শহীদের কবরে বর্তমান অবস্থান	: নিজ গ্রামে

শহীদ আইডি: দীপ্ত দে

ক্রমিক : ২১৩

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৮১

পরিচিতি

দীপ্ত দে ২০০৩ সালের ১৯ আগস্ট মাদারীপুর জেলার সদর থানার তর মুগরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এক দরিদ্র পরিবারে বেড়ে ওঠেন, যেখানে তাঁর পিতা স্বপন কুমার দে একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং মাতার নাম মনিকা দে, যিনি একজন গৃহিণী। তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা চারজন এবং মাসিক আয় মাত্র ১২,০০০ টাকা। দীপ্ত মাদারীপুর সরকারি কলেজের প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। তিনি ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হন এবং তাঁর রোল নম্বর ছিল ৩১২১২২০০২। তিনি তাঁর ধর্মের মাধ্যমে অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রেরণা লাভ করেন এবং কলেজে পড়ার সময় তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। ১৮ জুলাই ২০২৪ তারিখে আন্দোলনের সময় পুলিশের হামলায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে কলেজ ও পরিবার-পরিজনের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া ফেলে, এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শোকবার্তা পাঠানো হয়।

দীপ্তের জীবন ও সংগ্রাম ভবিষ্যতের ছাত্রদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে, যা শিক্ষার্থীদের অধিকারের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

দীপ্তকে হারিয়ে দীপ্তের পরিবার স্বজনেরা আজ পাগলপ্রায় অবস্থায় পতিত হয়েছে। এই অপূরণীয় ক্ষতি কখনো পোষাবার নয়।

শাহাদাতের ঘটনা

১৬ তারিখে রংপুরে আবু সাঈদকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এছাড়া সারাদেশে প্রায় ৬ জন ছাত্রকে হত্যা করে আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনী ও পুলিশলীগ। পরদিন আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। অনেক জায়গায় গোলাগুলি চলতে থাকে।১৮ জুলাই ২০২৪ তারিখে মাদারীপুরে অনুষ্ঠিত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে তিনিও চলে আসেন। সকাল ৯:৩০ মিনিটে তিনি আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগ দেন, তারা ডিসি অফিসের লেকের পাশে জড়ো হয়েছিলেন।

শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি নিয়ে স্লোগান দিচ্ছিল, কিন্তু পরিস্থিতি দ্রুত উত্তেজিত হয়ে ওঠে। 'আমার ভাই মরলো কেন খুনি হাসিনা জবাব দে'এমন প্রতিবাদে উত্তাল জায়গাটি। প্রায় সাড়ে দশটার দিকে, ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং পুলিশ বাহিনী আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা শুরু করে। এই হামলা দেখতে পেয়ে ছাত্র জনতার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। নিজেদের জীবন বাঁচানোর জন্য এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে তারা।

দীপ্তও অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে লেকের দিকে দৌড়াতে শুরু করেন। পরিস্থিতি বেগতিক হওয়ায় অনেক শিক্ষার্থী মাদারীপুর শকুনি লেকের পানিতে ঝাঁপ দিতে বাধ্য হন। দীপ্তও এই বিপদময় পরিস্থিতি থেকে বাঁচার চেষ্টা করেন এবং তিনি সাঁতরে পাড়ে ওঠার চেষ্টা করেন।

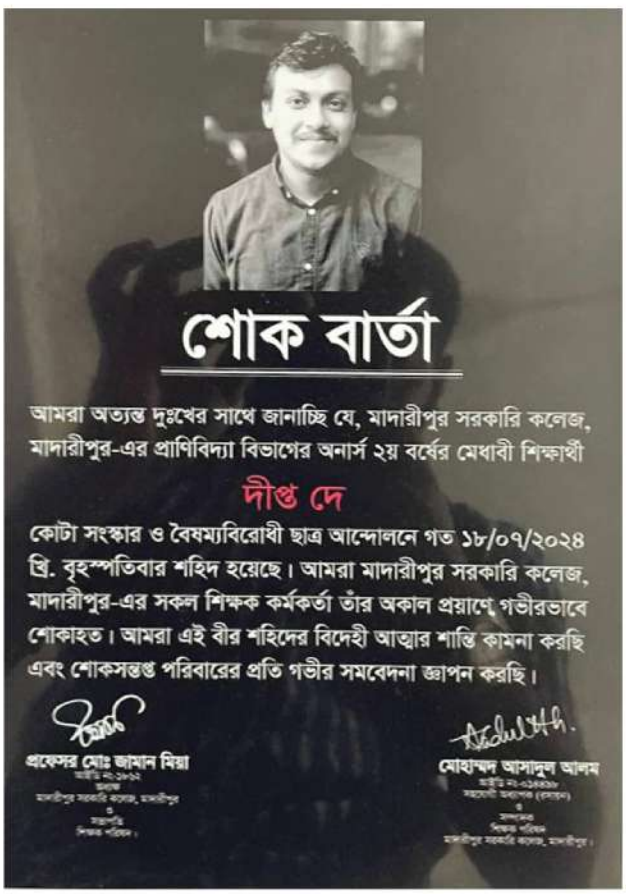

শোক বার্তা

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, মাদারীপুর সরকারি কলেজ, মাদারীপুর-এর প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অনার্স ২য় বর্ষের মেধাবী শিক্ষার্থী

দীপ্ত দে

কোটা সংস্কার ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গত ১৮/০৭/২০২৪ খ্রি. বৃহস্পতিবার শহিদ হয়েছে। আমরা মাদারীপুর সরকারি কলেজ, মাদারীপুর-এর সকল শিক্ষক কর্মকর্তা তাঁর অকাল প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত। আমরা এই বীর শহিদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর মোঃ জামান মিয়া

মোহাম্মদ আসাদুল আলম

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, হামলাকারীরা তাঁকে বাধা দেয়, তারা তার উপর টিয়ারশেলও নিক্ষেপ করে। কয়েকবার তিনি উঠে আসার চেষ্টা করলেও, তাঁকে পিটিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও তার শরীরে টিয়ারশেল লাগার কারণে তিনি সেখান থেকে উঠতে পারেনি। এক পর্যায়ে, তিনি পানিতে তলিয়ে যান। অনেকক্ষণ পর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে।

দীপ্তের মৃত্যু পুরো ছাত্র সমাজে শোকের ছায়া ফেলে। তাঁর মৃত্যু আন্দোলনটির গুরুত্বকে নতুন মাত্রা দেয় এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে অধিকারের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি করে। দীপ্তের শাহাদাত, মাদারীপুরের ছাত্র আন্দোলনে একটি স্মরণীয় ও মর্মান্তিক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়, যা ছাত্রদের সংগ্রামে নতুন উদ্দীপনা ও শক্তি যোগায়।

এই ঘটনার ফলে আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে ওঠে, এবং শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি আদায়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন। দীপ্তের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখতে তারা একত্রিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে অনেক পাহাড় মাড়িয়ে ৫ তারিখে আসে ছাত্র-জনতা বিজয়।

পারিবারিক অবস্থা

দীপ্তদের পরিবার অর্থনৈতিকভাবে খুবই সংকটপন্ন। তাদের পরিবারকে থাকার জন্য ভাড়া বাসায় থাকতে হয়। বাবা চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে বাবার সামান্য আয় দিয়ে পরিবার চালাতে হিমশিম খেতে হয়।

পুলিশের নির্মমতা

স্বৈরাচারী খুনি হাসিনার লেলিয়ে দেওয়া পুলিশ ছাত্র-জনতার ওপরে টিয়ারশেল, রাবার বুলেট, বুলেট ইত্যাদি নিক্ষেপ করতে থাকে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের জীবন বাঁচানোর জন্য লেকের পাড় দিয়ে দৌড়াতে থাকে। অনেকেই নিজের জীবনকে বাঁচানোর জন্য লেকে ঝাঁপ দেয়। লেক থেকে পাড়ে ওঠার সময় তাদের উপরে চালানো হয় আবার অত্যাচার। উঠতে দেওয়া হয় না লেকের পারে। এদিকে মাদারীপুর থানার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মনিরুজ্জামান ফকির নিশ্চিত করেছিলেন, শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ অন্তত একশ রাউন্ড ফাঁকাগুলি করেছে। আসলে হাসিনার লেলিয়ে দেওয়া পুলিশ বাহিনী ছত্রভঙ্গ করতে নয় বরং ছাত্র-জনতা হত্যা করতে গুলি চালিয়েছিল। এমন নৃশংস ঘটনা বিবেকবান কোন মানুষ করতে পারে না। এদের সাথে সহযোগিতা করেছে আওয়ামীলীগ যুবলীগ এর সন্ত্রাসীরা। যা খুবই নির্মমতা ও নির্লজ্জ।

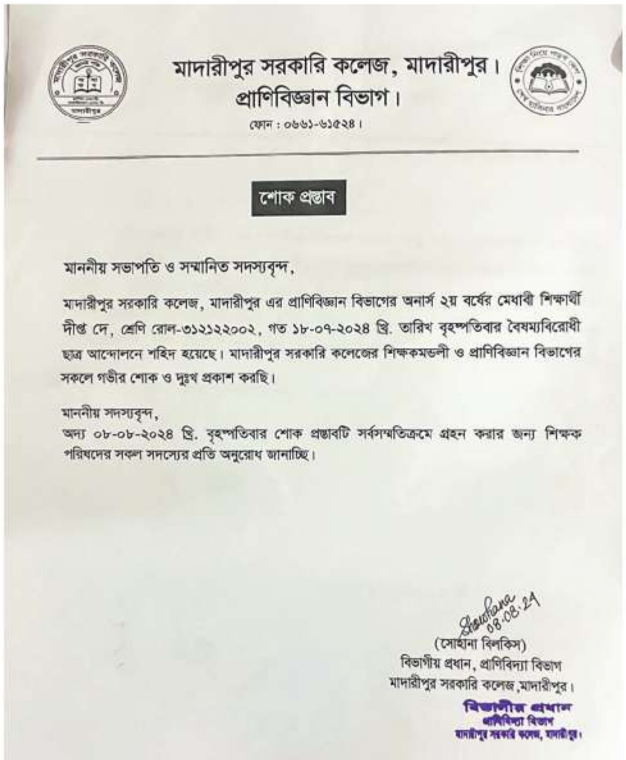

মাদারীপুর সরকারি কলেজ, মাদারীপুর।
প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ।
ফোন : ০৬৬১-৬১৫২৪।

শোক প্রস্তাব

মাননীয় সভাপতি ও সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

মাদারীপুর সরকারি কলেজ, মাদারীপুর এর প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের অনার্স ২য় বর্ষের মেধাবী শিক্ষার্থী দীপ্ত দে, শ্রেণি রোল-৩১২১২২০০২, গত ১৮-০৭-২০২৪ খ্রি. তারিখ বৃহস্পতিবার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহিদ হয়েছে। মাদারীপুর সরকারি কলেজের শিক্ষকমন্ডলী ও প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের সকলে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছি।

মাননীয় সদস্যবৃন্দ,
অদ্য ০৮-০৮-২০২৪ খ্রি. বৃহস্পতিবার শোক প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহন করার জন্য শিক্ষক পরিষদের সকল সদস্যের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি।

08.08.24
(সোহানা বিলকিস)
বিভাগীয় প্রধান, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ
মাদারীপুর সরকারি কলেজ, মাদারীপুর।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য সমূহ

নাম	: শহীদ দীপ্ত দে
জন্ম	: ১৯ আগস্ট ২০০৩
জন্মস্থান	: মাদারীপুর জেলা, সদর থানার তর মুগরিয়া গ্রাম
পিতার নাম	: স্বপন কুমার দে (অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)
মাতার নাম	: মনিকা দে (গৃহিণী)
পারিবারিক অবস্থান	: দরিদ্র পরিবার
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৪
মাসিক আয়	: ১২,০০০ টাকা
ঘটনার স্থান	: শকুনী লেক, মাদারীপুর
আক্রমণকারী	: ছাত্রলীগ, যুবলীগ, আওয়ামীলীগ ও পুলিশ
আহত হওয়ার সময় কাল	: ১৮ জুলাই ২০২৪ সকাল ১১ টা,
মৃত্যুর সময়কাল ও স্থান	: ১৮ জুলাই ২০১৪, আনুমানিক সাড়ে এগারোটা, সকলের মাদারীপুর
কবর/শ্মশান	: সার্বজনীন শ্রী শ্রী শ্মশান কালী মন্দির, দরগাখোলা, মাদারীপুর

প্রস্তাবনা

শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান

স্থায়ী আবাসস্থল করে দেয়া

অবসরপ্রাপ্ত শহীদের বাবাকে একটি ব্যবসা ধরিয়ে দেয়া

স্ত্রীর গর্ভে সন্তান রেখে শহীদ হলেন বাবা পরিবারের দেখাশোনার জন্য রইল না যে কেউ

শহীদ মোঃ মনিরুজ্জামান মোল্লা

ক্রমিক : ২১৪

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৮২

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মোঃ মনিরুজ্জামান মোল্লা ছিলেন এক সংগ্রামী, সৎ ও ধর্মপ্রাণ মানুষ, যিনি দরিদ্র পরিবারে জন্ম নিয়েও জীবন সংগ্রামে নিজের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ১৯৯৮ সালের ২৩ নভেম্বর মাদারীপুর জেলার এক ছোট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ছেলেবেলা থেকেই শান্ত-স্বভাবের, মেধাবী এবং আদর্শ মানুষ হিসেবে তার পরিচিতি ছিল। তার পিতা, জনাব নুরুল ইসলাম মোল্লা, একজন অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী, এবং মা, মনোয়ারা বেগম, একজন গৃহিণী। শহীদ মনিরুজ্জামান ছিলেন একটি ৭ সদস্যের পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি।

পরিবারের বড় দায়িত্ব তার কাঁধে ছিল। পিতার বার্ধক্যজনিত কারণে কোনো কাজ করতে না পারায়, ছোটবেলা থেকেই মনিরুজ্জামান বুঝেছিলেন তার পরিবারে অর্থনৈতিক সাহায্য দরকার। তাই গ্রাজুয়েশন শেষ করার পর তিনি মাদারীপুরে এপেক্স কোম্পানির স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। তার বেতন ছিল মাত্র ১৫ হাজার টাকা, কিন্তু সেই সামান্য আয়ে তিনি তার বাবা-মা, স্ত্রী, এবং বড় দুই বোনের সহ পরিবারের সকল খরচ বহন করতেন। তার বোনের স্বামী মানসিকভাবে অসুস্থ্য থাকায়, বোন ও তাদের সন্তানরাও তার উপর নির্ভরশীল ছিলেন।

মানুষ হিসেবে মনিরুজ্জামান ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র, বিনয়ী ও দায়িত্বশীল। তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি পরিবারের দায়িত্ব পালন এবং ধর্মীয় অনুশাসন মেনে কাটিয়েছেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় ও ইসলামের মৌলিক এবাদতগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে

পালন করা তার জীবনের অংশ ছিল। পরিবারের প্রতি তার দায়িত্ববোধ ও সমাজের প্রতি তার সহানুভূতি তাকে সবার কাছে প্রিয় করে তুলেছিল।

২০২৪ সালের ৫ই আগস্ট, ছাত্র আন্দোলনের বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণের সময় তিনি পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। শহীদ মনিরুজ্জামানের এই আত্মত্যাগ তার পরিবারের জন্য গভীর বেদনার হলেও, তার সংগ্রামী জীবন আজও আমাদের জন্য এক অনুপ্রেরণা। তিনি ছিলেন এক সাহসী এবং মানবিক মানুষ, যিনি শুধু নিজের পরিবারের জন্য নয়, সমাজের জন্যও সংগ্রাম করে গেছেন।

যেভাবে শহীদ হলেন

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে শুরু হয় সরকার পতনের এক দফা আন্দোলন। সারাদেশে জুলাই ও আগস্ট মাসের ৪ তারিখ পর্যন্ত প্রায় ১০০০ ছাত্র-জনতা হত্যা করে ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারী হাসিনা সরকার। ছাত্র-জনতা একসাথে কর্মসূচি দেয় ঢাকা টু মার্চ কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে সারা দেশ থেকে মানুষ ছুটে আসে ঢাকায়। ৫ তারিখ সকাল ১১ টার পর থেকেই ঢাকার রাজপথে নামে মানুষের ঢল। এদিনও স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের নির্দেশে পুলিশ বিজিবি নির্মমভাবে হত্যাযজ্ঞ চালায়। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে পালিয়ে গেলেও তার প্রেতাত্মা ভরকারী পুলিশ বাহিনী অবিরাম গুলি চালাতে থাকে। বিশেষ করে সাভার, যাত্রাবাড়ী, ধানমন্ডি ৩২ , আজমপুর ও গুলিস্তান সহ বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য মানুষের লাশ ফেলে এই আওয়ামী সরকারের সন্ত্রাসী বাহিনী। তবে ছাত্র-জনতা এর মধ্যেই ঐক্যবদ্ধভাবে রাজপথেই দাঁড়িয়ে থাকে। শেষ পর্যায়ে শেখ হাসিনা পরিস্থিতি অনুকূলে দেখতে না পেয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

এই ৫ তারিখেই মাদারীপুরের কৃতি সন্তান মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মোল্লা সকাল ১২ টার দিকে তার কিছু বন্ধুবান্ধব নিয়ে মোটরসাইকেলে করে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথের বিভিন্ন বাধা পেরিয়ে ঢাকা গুলিস্তানে এসে আসরের নামাজ পড়ে। নামাজ শেষ করে দেখতে পান মসজিদের বাহিরে এক ভয়ানক দৃশ্য। এক ঝাঁক পুলিশ বাহিনী তাদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। শুধু তাই নয়, মুসল্লিদের উদ্দেশ্য করে একের পর এক গুলি বর্ষণ করছে। হঠাৎ করে দুটি গুলি এসে মনিরুজ্জামানের বুকে ও পেটে বিদ্ধ হয়। তিনি মসজিদের সীমানাতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং ঘটনাস্থলেই শহীদ হন। তিনি গুলিস্থানে শহীদ হলেও তার লাশ গুলিস্থানে বন্ধুরা খুঁজে পায় না। পরবর্তীতে হাতিরঝিল থেকে উদ্ধার করা হয় তার লাশ। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নিয়ে তার পরিবারকে জানালে সেখান থেকে লাশ মাদারীপুরে নিয়ে যাওয়া হয়।

শহীদ পরিবারের করুণ দৃশ্য

শহীদ মোঃ মনিরুজ্জামান মোল্লা ছিলেন এক সংগ্রামী এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তি, যিনি তার সামান্য উপার্জন দিয়ে পরিবারের বিশাল বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। একটি জুতার কোম্পানিতে মাত্র ১৫ হাজার টাকা বেতনে চাকরি করেও তিনি তার বাবা-মা, স্ত্রী, এবং দুই বোনের পরিবারের খরচ চালাতেন। তার পিতা বার্ধক্যের কারণে কোনো কাজ করতে পারতেন না, এবং তার বোনের স্বামী মানসিক বিকারগ্রস্ত হওয়ায়, তিনিও

পরিবারে কোনো সাহায্য করতে পারতেন না। ফলে, পুরো পরিবার মনিরুজ্জামানের আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল। তার এই দায়িত্বশীলতা তাকে পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় এবং শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছিল। কিন্তু ২০১৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র আন্দোলনের বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণের সময়, তিনি পুলিশের গুলিতে শহীদ হন, যার ফলে তার পরিবারে উপার্জনের আর কোনো মাধ্যম রইল না। শহীদ মনিরুজ্জামানের মতো একজন সংগ্রামী মানুষের অনুপস্থিতি তার পরিবারের জন্য যে কী পরিমাণ শূন্যতা তৈরি করেছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুর বক্তব্য/অনুভূতি

শহীদ মনিরুজ্জামানের স্ত্রী বলেন, মনিরুজ্জামান খুবই ভালো মানুষ ছিলেন। সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজসহ ইসলামের মৌলিক ইবাদত পালন করতেন এবং আমাকেও ইসলামের বিধান মেনে চলতে বলতেন। সে সকল আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ খবর রাখতেন। সকলের বিপদে ছুটে যেতেন। সে ছিলো আমার বন্ধুর মতো। সে নেই এটা ভাবতেই আমি পাগলের মতো হয়ে যাচ্ছি। তিনি বলেন মনিরুজ্জামান বলতেন আল্লাহ আমার ১৫,০০০ টাকার ইনকামে ৫ লক্ষ টাকার বরকত দেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
Temporary National ID Card / সাময়িক জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ মনিরুজ্জামান মোল্লা
Name: MD. MANIRUZZAMAN MOLLA
পিতা: মোঃ নুরুল ইসলাম মোল্লা
মাতা: মনোয়ারা বেগম
Date of Birth: 23 Nov 1998
ID NO: 4204286761

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: শহীদ মো: মনিরুজ্জামান মোল্লা
জন্ম তারিখ	: ২৩ নভেম্বর, ১৯৯৮
ধর্ম	: ইসলাম
জাতীয়তা	: বাংলাদেশী
পিতার নাম, বয়স, অবস্থা	: জনাব নুরুল ইসলাম মোল্লা, বয়স: বৃদ্ধ (অবসরপ্রাপ্ত, কর্মক্ষম নন)
মায়ের নাম, পেশা	: মনোয়ারা বেগম, গৃহিণী
পারিবারিক সদস্য	: ৭ জন (পিতা, মাতা, স্ত্রী, ২ বোন, ২ ভাগ্নে/ভাগ্নি)
ছেলে মেয়ে	: নেই (স্ত্রীর গর্ভে ৭ মাসের সন্তান আছে)
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: শাখারপার, ইউনিয়ন: লুন্দি, থানা: রাজৈর, জেলা: মাদারীপুর
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা/হোল্ডিং: ০৫৩৩-০০, গ্রাম/রাস্তা: প্রধান সড়ক, ডাকঘর: মাদারীপুর সদর ৭৯০০ মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর পৌরসভা, মাদারীপুর
ঘটনার স্থান	: গুলিস্তান
আক্রমণকারী/আঘাতকারীর	: আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৫ আগস্ট ২০২৪ আনুমানিক বিকাল ৫ টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪ আনুমানিক বিকাল ৬ টা
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: শাখারপাড়, লুন্দী, রাজৈর, মাদারীপুর

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান ও নিয়মিত মাসিক ভাতা প্রদান।

২. যোগ্যতানুযায়ী শহীদের স্ত্রীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৩. আগত সন্তানকে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা।

শহীদ মামুন সরদার

ক্রমিক : ২১৫

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৮৩

পরিচয়

শহীদ মামুন সরদার ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সব সময় প্রতিবাদী যুবক। দেশ ও মাতৃকার জন্য তার আত্মত্যাগ সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ সালে মাদারীপুর জেলার সদর থানাধীন ঘাটমাঝি গ্রামে এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মোটামুটি স্বাবলম্বী পরিবারে দ্বিতীয় ছেলে সন্তান হওয়ায় পিতা মাতা যেমন খুশি তেমনি আত্মীয় স্বজনের মধ্যে আনন্দের ঢেউ লাগে। মামুন সরদার ছোটবেলা থেকে খুবই মেধাবী ছিলেন। লেখাপড়া শেষে বিকাশ কোম্পানির কর্মকর্তা হিসেবে কাজে যোগদান করেন। এ সময় শাহিনুর নামে এক মেয়ের সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের কোল আলোকিত করে এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। চার ভাই পাঁচ বোনের বড় সংসারে মা আগেই মৃত্যুবরণ করেন। পিতা আবু তালেব সরদার সকল সন্তানকে আগলে রেখে তাদের মানুষ করেছিলেন। কিন্তু হায়নার দল পিতার কাঁধে সন্তানের লাশ তুলে দিলেন। ভাইদের মধ্যে মামুন সরদার ছিলেন খুবই সাহসী ও দেশপ্রেমিক। অন্যায়কে কখনো মাথা পেতে নেননি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শুরু থেকে তিনি এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। উত্তাল আন্দোলনে দেশকে নতুন করে স্বাধীন করার মানসে মামুন সরদার জীবন বাজি রেখে সহযোগিতা করেছেন। ফ্যাসিস্ট সরকারের ঘাতক পুলিশের গুলিতে তিনি শহীদ হন। মুহূর্তেই সুন্দর সোনার সংসারে অন্ধকারের কালো ছায়া নেমে আসে। ফুটফুটে সুন্দর শিশুটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার দিকে ধাবিত হয়। বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের দৃঢ় প্রত্যয়ের জন্য মামুন সরদার কোটি মানুষের হৃদয়ে অনুপ্রেরণার উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে।

যেভাবে শহীদ হলেন

সুন্দর বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন মামুন সরদার মনের ভিতর সব সময় লালন করতেন। কিন্তু কার্যকর কোন প্লাটফর্ম না পাওয়ায় মনোঃকষ্ট অনুভব করতেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু হলে তিনি এটাকে স্বাগত জানান। এ আন্দোলনকে বেগবান করতে তিনি প্রথম থেকে সক্রিয় সহযোগিতা করেন। ১৭ জুলাই উত্তাল এ আন্দোলনে তিনি যোগদান করেন। বাসায় আসার পর স্ত্রী শাহিনুর বলেন, তুমি আর আন্দোলনে যাবে না। তোমার কিছু হলে আমাদের কি হবে। মামুন প্রতি উত্তরে বলেন, আমরা যদি মাঠে না

নামি তাহলে ছাত্রদের আন্দোলন কিভাবে সফল হবে। পরদিন ১৯ জুলাই ২০২৪ মামুন সরদার দুপুরের খাওয়া শেষে তার খালাতো ভাই ও অধীনস্থ কর্মচারীদের সাথে নিয়ে শান্তিপূর্ণ ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যোগদান করেন। মুহূর্তেই আওয়ামী স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট সরকারের পুলিশ বাহিনী বৃষ্টির মত গুলি বর্ষণ করতে থাকেন। সাথে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ ও যুবলীগের গুন্ডাবাহিনী আমাদের উপর অর্তকিত আক্রমণ শুরু করলো। প্রথমে আমরা পাশে এক গলিতে ঢুকে পড়লাম। মিরপুর ১০ নম্বরের ওই স্থানের নেতৃত্বে ছিলেন মামুন সরদার। ফলে তিনি সাহস নিয়ে গলি থেকে রাজপথে বেরিয়ে আসলেন। স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার ঘাতক পুলিশ বাহিনী মামুনকে টার্গেট করে বুকে গুলি করে। মুহূর্তেই তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। খালাতো ভাইসহ অন্য সাথীরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিতে আসেন। পরবর্তীতে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। দেশমাতৃকার জন্য লড়াইয়ে থাকা মামুন সরদার ইতিহাস হয়ে গেলেন। অন্যায় ও বৈষম্যর বিরুদ্ধে যারা কাজ করেছে মামুন সরকার তাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে রইলেন।

শহীদ সম্পর্কে নিকট আত্মীয় ও প্রতিবেশীর বক্তব্য

শহীদ মামুন সরদার ছিলেন বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মানের অন্যতম পথ প্রদর্শক। সেটি তিনি সারা জীবন মনে লালন করতেন। প্রতিবেশীরা তার সম্পর্কে বলেন, মামুন সরদার অত্যন্ত ভালো ছেলে ছিল। আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের সাথে ভালো ব্যবহার করতো। স্ত্রী শাহিনুর বলেন, মামুন সরদার তার অমায়িক ব্যবহারের কারণে সকলের কাছে সুপরিচিত ছিল। আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। আমাকে একাকি কোথাও ছেড়ে দেননি। অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সে শহীদ হয়েছে। রাষ্ট্র তাকে বীরত্বের খেতাব দিবে এটা আমরা প্রত্যাশা করি।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

মামুন সরদারের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি ভালো। মামুনের বড় ভাই নিজে প্রতিষ্ঠিত। বাবা ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার। ছোট ভাই ইতালি প্রবাসী। স্ত্রী শাহিনুর তার ১৬ মাসের ফুটফুটে কন্যা সন্তান মানহাকে নিয়ে মানুষিক যন্ত্রণায় আছে। কি হবে আমার ও আমার সন্তানের ভবিষ্যত। মেয়ের একটা ভালো ভবিষ্যতের জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন।

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মামুন সরদার
জন্ম	: ২০/০৯/১৯৯১
পিতা	: আবু তালেব সরদার
মাতা	: ইউনা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম : ঘট মাঝি, ইউনিয়ন : ঘটমাঝি, থানা: মাদারীপুর সদর, জেলা : মাদারীপুর
বৈবাহিক অবস্থা	: বিবাহিত
স্ত্রী	: শাহিনুর
পেশা	: বিকাশ কোম্পানির কর্মকর্তা
ঘটনার স্থান:	: মিরপুর ১০ নম্বর
আহত হওয়ার সময়কাল	: ১৯ জুলাই আনুমানিক বিকাল ৩.০০টা
শাহাদাতের সময়কাল	: ১৯ জুলাই বিকাল ৪.০০টা আঘাতের ধরণ: বুকে গুলি করে
আক্রমণকারী	: পুলিশ
শহীদের কবরের অবস্থান	: ঘটমাঝি, মাদারীপুর

প্রস্তাবনা

১. মামুন সরদারের এতিম মেয়ের দায়িত্ব নেওয়া প্রয়োজন

২. ভবিষ্যৎ জীবনটাকে সুন্দরভাবে গড়তে পারে এজন্য সবসময় খোঁজখবর নেওয়া

শহীদ ইসমাইল হোসেন রাব্বি

ক্রমিক: ২১৬

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৮৪

বীর যোদ্ধার পরিচয়

মাদারীপুরের মানুষ বরাবরই স্বাধীনচেতা। যে কোনো আন্দোলন সংগ্রামে তাদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। শহীদ ইসমাইল হোসেন রাব্বি মাদারীপুরের সন্তান হিসেবে সেই গৌরবের অংশীদার। তিনি ১৯৯৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর মাদারীপুর জেলা সদরের পাঁচখোলা গ্রামে এক হতদরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মোহাম্মদ মিরাজ তালুকদার ও মাতা আসমা বেগম দম্পতির কোল আলোকিত করে জন্ম নেওয়া ইসমাইল হোসেন রাব্বি আত্মীয় স্বজন সকলের মধ্যমণি ছিলেন। কিন্তু পিতা-মাতা, স্ত্রী, ভাই-বোনসহ ৬ সদস্যের পরিবারে অভাব অনটন লেগেই থাকতো। ফলে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও আর সম্ভব হয়নি। সংসারে আর্থিক সচ্ছলতা আনতে ঢাকার শাহবাগ এলাকায় এসে ইঞ্জিন মিস্ত্রির কাজ নেন। কৃষক পরিবারের বাবার মুখে কেবল হাসি ফুটতে শুরু করে। এ সময় ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশে বৈষম্যের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন শুরু হয়। তিনি এ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এক বছর আগে তিনি বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। পরিবারের সবাইকে তিনি খুব ভালোবাসতেন। দারিদ্রের কষ্ট, কঠোর পরিশ্রম, আর পরিবারের প্রতি গভীর ভালোবাসা ইসমাইল হোসেন রাব্বিকে সকলের মাঝে স্মরণীয় করে রেখেছে।

শহীদ সংক্রান্ত সামগ্রিক বর্ণনা

শহীদ ইসমাইল হোসেন রাব্বির জীবন কাহিনী যেন এক অশ্রুসিক্ত বেদনা বিধুর অধ্যায়। জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় গুলোতে যখন কোন যুবক স্বপ্নের জাল বুনে ঠিক তখনই পরিবারের দায়িত্ব তার ঘাড়ে চেপে বসে। পরিবারের সুখের জন্য নিজের সবটুকুন স্বপ্ন তিনি ত্যাগ করলেন। ঢাকায় এসে জীবন যুদ্ধে নেমে গেলেন। শাহবাগ এলাকায় ইঞ্জিন মিস্ত্রির কাজ করতেন। এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার পতনের এক দফায় পরিণত হয়। সারা জীবন অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি একাই লড়াই করেছেন। দেশব্যাপী এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি ছাত্র-জনতার সাথে একত্রিত হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাজধানীর রাস্তায় নেমে পড়েন। তখন স্লোগানের শ্লোগানে প্রকম্পিত রাজপথ। সে সময় ঢাকার শাহবাগ এলাকা উত্তাল স্ফুলিঙ্গ। ৪ আগস্ট ২০২৪, রবিবার। ৫টা ২০ মিনিটে গণ আন্দোলনে থাকা অবস্থায় আওয়ামী পুলিশ বাহিনী ও ছাত্রলীগের গুন্ডা পান্ডারা একত্রে হামলা করে এবং গুলি চালায় আন্দোলনরত মুক্তিকামী ছাত্র-জনতার উপর। শাহবাগের মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে শহীদ ইসমাইল হোসেন রাব্বি তখন ডান চোখে গুলিবিদ্ধ হয়। শহীদের সাথীরা তাকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যান। ৬:২০ মিনিটে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যবৃন্দ হাসপাতালের মর্গ থেকে শহীদ ইসমাইলের লাশ উদ্ধার করে। প্রতিবাদী যুবকের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে চারিদিকে শোকের ছায়া নেমে আসে। অশ্রুশিক্ত নয়নে শহীদের স্বজনরা তাকে শেষ বিদায় দেন। ১৬ বছর ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার স্বৈরশাসন, ভোটের অধিকার হরণ, দ্রব্যমূল্যের আকাশ ছোয়া দাম, খুন, গুম এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন এক অকুতোভয় সৈনিক।

শহীদ সম্পর্কে নিকট আত্মীয় ও প্রতিবেশীর অনুভূতি

শহীদ ইসমাইল হোসেন রাব্বি ছিলেন নতুন বাংলাদেশ নির্মাণের অন্যতম কারিগর। সেটি তিনি জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন। প্রতিবেশিরা জানান, রাব্বি অনেক ভালো ছেলে ছিল। কোনদিন কারো সাথে বেয়াদবি করেননি। বড়দের সব সময় সম্মান করতেন। লেখাপড়ায়ও খুবই মনোযোগী ছিলেন। শহীদের বাবা জানান, এলাকার সবাই আমার রাব্বিকে ভালো জানে। আমার অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিল না বলে কোনদিন জোর করে আমার কাছে কিছুই চায়নি। অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে তিনি শহীদ হয়েছেন। রাব্বীর মৃত্যুতে শুধু পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, দেশ একজন সাহসী যোদ্ধাকে হারালো।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

ইসমাইল হোসেন রাব্বির পরিবার অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছ ছিল। কৃষক বাবার ভিটে বাড়ি ১০ শতাংশ জমি ছাড়া আর কিছুই নেই। বাবা-মা, স্ত্রী, ভাই-বোন সহ ৬ সদস্যের পরিবার রাব্বির আয়ে খুব কষ্টে অতিবাহিত হতো। পরিবারের সদস্যদের একটু সুখের মুখ দেখানোর আশা নিয়ে ঢাকায় এসেছিলেন। আওয়ামী বুলেট তার

সব স্বপ্নকে কেড়ে নিল। তার মৃত্যুতে পরিবারের মধ্যে হাহাকার শুরু হয়। রাব্বির অভাব তাদের জীবনকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। এই দুরাবস্থার মধ্যে তাদের আশা সমাজ সহায়তা করবে। যাতে তাদের জীবনে কিছুটা আলো ফিরে আসে।

প্রস্তাবনা

১. এককালীন বড় ধরণের আর্থিক সহযোগিতা করা।

২. বাবার নিয়মিত ভালো কোন আয়ের ব্যবস্থা করা।

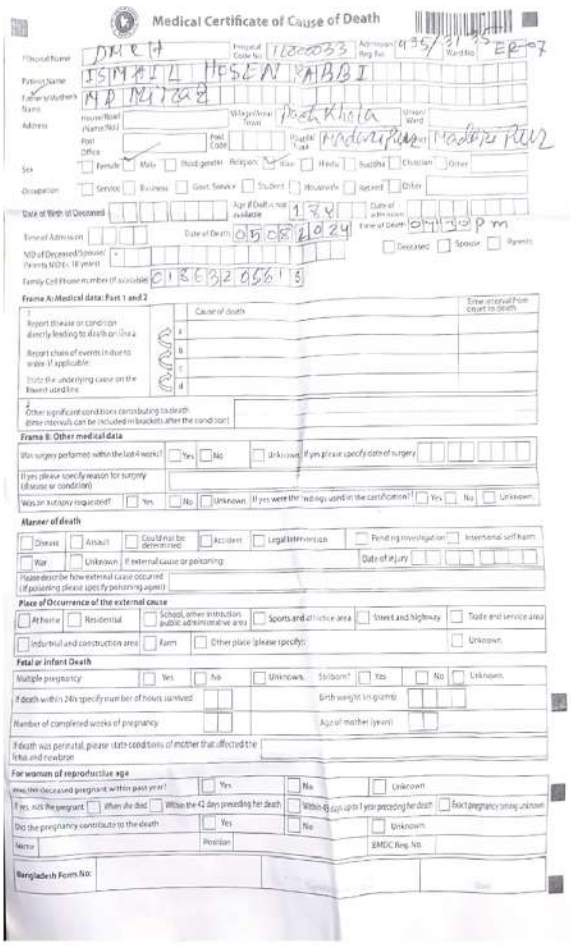

Medical Certificate of Cause of Death

Hospital Name: DMCH | Hospital Code No: 10000033 | Admission/Reg No: 495/31 | Ward No: ER-07

Patient Name: ISMAIL HOSEN RABBI

Father's/Mother's Name: MD MIRAZ

Address: House/Road (Name/No) | Village/Area/Town: Pach Khola | Union/Ward | Post Office | Post Code | Upazila/Thana: Madaripur | District: Madaripur

Sex: Female / Male ✓ / Third gender | Religion: Islam ✓ / Hindu / Buddha / Christian / Other

Occupation: Service / Business / Govt. Service / Student / Housewife / Retired / Other

Date of Birth of Deceased | Age if DoB is not available: 1 8 Y | Date of admission

Time of Admission | Date of Death: 05 08 2024 | Time of Death: 04 30 pm

NID of Deceased/Spouse/Parents NID (< 18 years) | Deceased / Spouse / Parents

Family Cell Phone number (if available): 01863205615

Frame A: Medical data: Part 1 and 2

1		Cause of death	Time interval from onset to death
Report disease or condition directly leading to death on line a	a		
Report chain of events in due to order if applicable	b		
	c		
State the underlying cause on the lowest used line	d		

2 Other significant conditions contributing to death (time intervals can be included in brackets after the condition)

Frame B: Other medical data

Was surgery performed within the last 4 weeks? Yes / No / Unknown | If yes please specify date of surgery

If yes please specify reason for surgery (disease or condition)

Was an autopsy requested? Yes / No / Unknown | If yes were the findings used in the certification? Yes / No / Unknown

Manner of death

Disease / Assault / Could not be determined / Accident / Legal intervention / Pending investigation / Intentional self harm / War / Unknown | If external cause or poisoning: Date of injury

Please describe how external cause occurred (if poisoning please specify poisoning agent)

Place of Occurrence of the external cause

At home / Residential / School, other institution public administrative area / Sports and athletics area / Street and highway / Trade and service area / Industrial and construction area / Farm / Other place (please specify) / Unknown

Fetal or Infant Death

Multiple pregnancy: Yes / No / Unknown | Stillborn? Yes / No / Unknown

If death within 24h specify number of hours survived | Birth weight (in grams)

Number of completed weeks of pregnancy | Age of mother (years)

If death was perinatal, please state conditions of mother that affected the fetus and newborn

For woman of reproductive age

Was the deceased pregnant within past year? Yes / No / Unknown

If yes, was she pregnant: When she died / Within the 42 days preceding her death / Within 43 days up to 1 year preceding her death / Exact pregnancy timing unknown

Did the pregnancy contribute to the death: Yes / No / Unknown

Name | Position | BMDC Reg. No.

Bangladesh Form No:

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: ইসমাইল হোসেন রাব্বি
জন্ম	: ২৭/১২/১৯৯৭
পিতা	: মো: মিরাজ তালুকদার
মাতা	: আসমা বেগম
পেশা	: গাড়ির ইঞ্জিন মিস্ত্রি
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: পাচখোলা, ইউনিয়ন: পাঁচখোলা, থানা: মাদারীপুর সদর, জেলা: মাদারীপুর
বৈবাহিক অবস্থা	: বিবাহিত
স্ত্রী	: স্ত্রীর নাম জানা যায়নি
ঘটনার স্থান	: শাহবাগ মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে
আহত হওয়ার সময়কাল	: ০৪/০৮/২০২৪, ৫.২০ মিনিটে
শাহাদাতের সময়কাল	: ০৪/০৮/২০২৪,৬.২০ মিনিটে
আঘাতের ধরণ	: ডান চোখে গুলিবিদ্ধ হওয়া
আক্রমণকারী	: পুলিশ
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: পাঁচখোলা, মাদারীপুর সদর

শহীদ মো: রফিকুল ইসলাম

ক্রমিক: ২১৭

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৮৫

জন্ম পরিচয়

শহীদ মো: রফিকুল ইসলাম মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানার আলীনগর ইউনিয়নের অন্তর্গত দক্ষিণ কানাইপুর গ্রামে ১৯৯৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। চার ভাইবোনের মধ্যে রফিকুলের অবস্থান তৃতীয়। মাতৃহারা রফিকুলের একমাত্র অভিভাবক তার বৃদ্ধ পিতা মো:কালু সরদার। পেশায় শ্রমজীবী রফিকুলই ছিলেন তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। বৃদ্ধ পিতার দেখভাল, মেয়েদের লেখাপড়া,আর পরিবারের খরচ চলতো তারই উপার্জিত অর্থে। কিন্তু স্বৈরাচার সরকারের কালো থাবার আক্রমণে চিরদিনের জন্য থেমে গেছে রফিকুলের কর্মক্ষম দুটি হাত। থমকে গেছে দুই মেয়ের সুন্দর ভবিষ্যৎ চিন্তা কিংবা বাড়ি ফেরার সময় স্ত্রীর জন্য একটা শাড়ি কেনার ইচ্ছা।

পারিবারিক আর্থিক অবস্থান

শ্রমজীবী রফিকুলের আয়েই চলতো তার সংসার। একটি টিনের ঘর ছাড়া সম্পদ বলতে তেমন কিছুই নেই। নেই চাষবাসের জন্য আবাদী জমিও। এই সামান্য সম্পদ আর কর্মক্ষম দুটি হাতের উপর নির্ভর করেই স্বপ্ন দেখে মেয়ে দুটিকে মানুষ করার। সেই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেলো,আর রফিকুল হারিয়ে গেলো চিরতরে।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত

২০২৪ সালের জুলাই মাস। চলছিলো বাংলাদেশের ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড যার শিকার হয়েছিলো আপামর জনতা। যাদের অধিকাংশেরই লাশ দাফন করা হয়েছিলো বেওয়ারিশ হিসেবে কিংবা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছিলো সেসব লাশের অস্তিত্ব। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচীর অংশ দিসেবে দেশে তখন কমপ্লিট শাটডাউন চলছিলো। সেই আন্দোলনে ছাত্র-জনতার সরব উপস্থিতিতে ভড়কে যায় স্বৈরাচার হাসিনা। তাই পুলিশ বিজিবি মোতায়েনের পরেও মাঠে নামায় ছাত্রলীগ-যুবলীগ নামক গুণ্ডাবাহিনীকে। সারাদেশে বন্ধ করে দেয়া হয় ইন্টারনেট সেবা।

১৯ জুলাই দিনের শেষ ভাগের ঘটনা। রফিকুল মুঠোফোনে কথা বলছিলো স্ত্রী শাবনূর খানমের সাথে, তখন গোলাগুলির শব্দে চমকে উঠেন তার স্ত্রী। উদগ্রীব হয়ে জানতে চান তার স্বামী নিরাপদে আছেন কিনা। মিনিট ২৫ পরে আবার কল আসে শাবনূরের ফোনে। কিন্তু এ যে তার স্বামীর কণ্ঠ নয়! কোনো এক পথচারী উত্তর বাড্ডা থেকে জানায়, তার স্বামী পুলিশের গুলিতে আহত (সেই গুলি নাভির নিচ দিয়ে ঢুকে পিঠের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়)। হতভম্ব শাবনূরের কানে তখন ধ্বনিত হচ্ছিলো মাগরিবের আজান।

সেই পথচারী ও রফিকুলের এক রুমমেট তৎক্ষনাৎ তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করায়। ১৪ দিন চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ হলে ১ আগস্ট নিজ বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় রফিকুলকে। কিন্তু কয়েকদিনের ব্যবধানে পেটের ক্ষতস্থানের অবস্থা খারাপ হলে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল নেয়া হয়। কিন্তু অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় ও ডাক্তার স্বল্পতার কারনে তাকে নেয়া হয় ঢাকার একটি প্রাইভেট হাসপাতালে। প্রায় দশদিন চিকিৎসার পর আর্থিক সংকুলান না হওয়ায় তাকে শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিটে স্থানান্তর করা হয়। সেখানেই ২৭ আগস্ট চিকিৎসাধীন অবস্থায় শাহাদত বরণ করেন রফিকুল ইসলাম।

পরিবারের বর্তমান অবস্থা

রফিকুলকে হারিয়ে যেন সর্বহারা হয়ে গেছে তার পরিবার।তার স্ত্রীর যে দুচোখ ভরা সংসার সাজানোর স্বপ্ন ছিলো সেই দুচোখে যেন এখন খেলা করে সর্বনাশা পদ্মার ঢেউ। মেয়েদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এর আশংকায় এখন দিন কাটে শাবনূর খানমের। বাবার কাছে খেলনা আর নতুন জামার আবদারের অপেক্ষায় তার দুই মেয়ে।

সহযোগিতার প্রস্তাবনা

যে রফিকুল প্রাণ দিয়ে দেশকে গড়ার সুযোগ দিয়েছেন,তার বিধবা স্ত্রীর ও মেয়েদের স্বপ্ন গড়ার ভার যেন আমাদেরই দায়িত্ব। ভালো

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

পুরো নাম	: মো: রফিকুল ইসলাম
জন্মসাল	: ১৯৯৭
পিতা	: মো: কালু সরদার
ঠিকানা	: গ্রাম: দক্ষিণ কানাইপুর, ইউনিয়ন: আলীনগর, থানা: কালকিনি, জেলা: মাদারিপুর
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন। পিতা-মাতা ও ২ মেয়ে ১. পিতা, ২. স্ত্রী ৩. বড় মেয়ে: আনিশা, বয়স-১১ বছর, শ্রেণি: ৬ষ্ঠ ৪. ছোট মেয়ে (জান্নাত,বয়স: ৫ বছর)
আহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: উত্তর বাড্ডা ১৯/০৭/২০২৪,
নিহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিট, ২৭/০৮/২০২৪

শহীদ রুমান বেপারী

ক্রমিক : ২১৮

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৮৬

জন্ম ও পরিচিতি

সালটি ছিলো **১৯৯৭**। ঘন কুয়াশায় ঘেরা চারপাশ। ঠান্ডাও পড়েছে বেশ। তেমনি এক শীতের দিনে কৃষক আমর আলী বেপারী ও রিনা বেগমের কোলজুড়ে এলো এক ফুটফুটে শিশু। তাদের প্রথম সন্তান ও ছেলে হিসেবে দুনিয়ায় আগমন ঘটেছিলো রুমান বেপারীর।

হ্যাঁ, বলছিলাম মাদারিপুর জেলার মাদারিপুর থানার অন্তর্গত ঘটমাঝি মাদারিপুর ইউনিয়নের ভদ্রখোলা গ্রামের কৃতি সন্তান শহীদ রুমান বেপারীর কথা।

দরিদ্র পরিবারে জন্মেছিলো বটে, তবে অন্তর ছিলো গরীয়ান আর অসীম সাহসে ভরপুর। আচরণে ছিলো উদার, আর অন্যের সহযোগিতা করার মধ্যে ছিলো তার সুখ। পরিবারের বড় সন্তান হিসেবে দায়িত্ববোধ শিখে নিয়েছিলো শুরু থেকেই। সেই দায়িত্ববোধকে কাজে লাগিয়েই দেশকে স্বৈরাচার মুক্ত করার আন্দোলনে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে স্থান করে নিয়েছিলো বীরদের কাতারে।

পারিবারিক অবস্থা

কৃষক পিতা ও গৃহিণী মাতার বড় সন্তান ছিলেন রুমান ব্যাপারী। পিতামাতা, ছোট ভাই, প্রিয়তমা স্ত্রী ও একমাত্র আদরের কন্যাসহ ছয়জনের সাজানো সংসার ছিলো, ছোট্ট একটি টিনের চালের নিচে।এই ঘর ছাড়া আর কোন চাষের জমি ও ছিলো না। বাবার কৃষিকাজ ছিলো আয়ের একমাত্র উৎস। তাই বাবার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ধরেছিলেন সংসারের হাল। দারিদ্রের কশাঘাত যেন দমিয়ে রাখতে পারেনি রুমান ব্যাপারীকে। পিতামাতার দু:খ মোচন, একমাত্র ছোট ভাই ও আদরের মেয়ের ভবিষ্যৎকে সুন্দর করতে বিদেশ যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন। এরই মধ্যে শেষ করেছিলেন পাসপোর্টের কাজও, কিন্তু বিদেশে যাওয়া আর হলো না। স্বৈরাচার সরকারের গুন্ডাবাহিনীর হাতেই শেষ হয়ে গেলো রুমানের প্রাণ।

কেউ কি জানতো পরিবারের এই অভিভাবক তাদের ছেড়ে চলে যাবেন না ফেরার দেশে?

প্রিয়তমা স্ত্রী কি জানতো একটি বারের জন্যও তার প্রিয় মানুষটির মুখ আর দেখবেনা? অবুঝ সন্তান কি আর বুঝে তার বাবা হারিয়ে গেছে চিরতরে ?

ঘটনার প্রেক্ষাপট

সেদিন ছিলো শুক্রবার। সারদেশ জুড়ে চলছিলো স্বৈরাচার হাসিনার তাণ্ডব।বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে নস্যাৎ করার বিভীষিকাময় সব আয়োজন ই একের পর এক প্রত্যক্ষ করছিলো সারাদেশের জনগণ।

এর আগে, ১৮ জুলাই বৃহস্পতিবার কমপ্লিট শাটডাউনের ঘোষণা আসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে।সেই কর্মসূচি যেন বাস্তবায়ন করতে না পারে, সেজন্য বৃহস্পতিবার রাত থেকেই ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দেয় স্বৈরাচার সরকার।

ঢাকাসহ সারাদেশে ২২৯ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করে, যারা নির্বিচারে ছাত্র-জনতার উপর গুলি চালায়।

পুলিশ বাহিনীর সাথে যোগ দিয়েছিলো ছাত্রলীগ, যুবলীগের গুন্ডারা,যারা অবৈধ সরকারের ছত্রছায়ায় ছাত্র-জনতাকে নির্মমভাবে অত্যাচার করে ও অসংখ্য নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটায়।

১৯ জুলাই শুক্রবারেও চলছিলো বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কার্যক্রম। বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়েই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন রুমান বেপারী।

বিকেল ৫:৩০ টার দিকে রুমান ও তার সহযোদ্ধারা অবস্থান করছিলো মাদারীপুর সার্বিক তেলের পাম্পের সামনে। ঠিক সেই সময় অবৈধ সরকারের সাবেক নৌ ও পরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খানের নির্দেশে ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও পুলিশ বাহিনীর যৌথ আক্রমণ শুরু হয়।তাদের এলোপাতাড়ি আক্রমণের মুখে গুলিবিদ্ধ হন রুমান।তার সহযোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে তাকে নিয়ে যান মাদারীপুর সদর হাসপাতালে। হাসপাতালে পৌছার কিছুক্ষন পরেই আনুমানিক ৬ টার দিকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুতে ঝড়ে যায় আরও একটি তাজা প্রাণ। অভিভাবক হারা হয় একটি পরিবার। বিধবার তালিকায় যোগ হয় প্রিয়তমা স্ত্রীর নাম আর এতিম হয়ে যায় তার আদরের রাজকন্যা।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়দের অনুভূতি

শহীদ রোমান ছিলেন তার মায়ের সেই সন্তান, যার মুখে তিনি প্রথম মা ডাক শুনেছিলেন। রুমান প্রতিবার যখন তাকে মাকে মা বলে ডাকতেন হয়তো তার মা সেই প্রথমবার মা ডাক শোনার অনুভূতি পেতেন। সেই মমতাময়ী মায়ের প্রতি ছিলো তার অগাধ ভালোবাসা ও সম্মান,মায়ের যত্নে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তাঁর মা বলেন-

"আমার ছেলে আমার সাথে কখনো খারাপ ব্যবহার করতো না। আমার যখন যা লাগতো তা ই এনে দিতো। আমি অনেকদিন ধরেই অসুস্থ আছি, সবসময় আমার ঔষধ এনে দিতো।"

আর প্রতিবেশীদের অন্তরেও তিনি জায়গা করে নিয়েছিলেন তার সুন্দর আচরণের মাধ্যমে। বিপদ আপদে, সুখে-দুঃখে সবাই তাকে পাশে পেতো।

প্রতিবেশী বলেন-

"রুমান বেপারী অনেক ভালো মানুষ ছিলেন, আশেপাশের কেউ যখনই কোনো সমস্যায় পড়তো তখন সে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে যেতো।"

রুমানের মৃত্যুর মাধ্যমে হারিয়ে গেলো একটি সাহায্যের হাত। এখন তার পরিবারের লোকেরাই দেশের লোকেদের সাহায্যের অপেক্ষায়।

সহযোগিতার প্রস্তাবনা

যে রুমান তার জীবনের বিনিময়ে আমাদেরকে একটি স্বৈরাচার মুক্ত দেশ উপহার দিয়ে গেলো সেই রুমানের প্রতিদান হয়তো কোনো কিছুতেই দেয়া সম্ভব না।অন্তত তার এতিম মেয়ের ভরণপোষণ এবং পড়াশোনার দায়িত্ব পালন করতে পারলে কিংবা তার পরিবারের জন্য স্থায়ী কোনো আয়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারলে হয়তো নিজেদের কিছুটা দায়মুক্ত করা যাবে।

এক নজরে শহীদের ব্যাক্তিগত তথ্য

পুরো নাম	: রুমান বেপারী
জন্ম	: ৩/১২/১৯৯৭
ঠিকানা	: গ্রাম: ভদ্রখোলা, ইউনিয়ন: ঘটমাঝি মাদারিপুর, থানা: মাদারিপুর, জেলা: মাদারিপুর
পিতা	: আমর আলী ব্যাপারী, পেশা: কৃষি, বয়স: ৫৭
মাতা	: রিনা বেগম, পেশা: গৃহিণী, বয়স: ৫৫
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৫ জন
	১. পিতা, ২. মাতা, ৩. ছোট ভাই, ৪. স্ত্রী, ৫. চার বছর বয়সী মেয়ে
ঘটনার স্থান	: মাদারিপুর সার্বিক তেলের পাম্পের সামনে
আক্রমণ কারী	: সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ-যুবলীগ ও ঘাতক পুলিশের যৌথ আক্রমণ
আহত হওয়ার তারিখ	: ১৯/০৭/২০২৪ (বিকেল ৫:৩০)
নিহত হওয়ার তারিখ ও স্থান	: ১৯/০৭/২০২৪ আনুমানিক সন্ধ্যা ৬:০০ (মাদারিপুর সদর হাসপাতাল)

শহীদ হাসিবুর রহমান

ক্রমিক : ২১৯

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৮৭

পরিচিতি

হাসিবুর রহমানের জন্ম ২০০৭ সালে মাদারীপুর জেলার উত্তর কানাইপুর গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে। ছোটবেলা থেকেই তার জীবন ছিল সংগ্রামমুখর। তার মা যখন মারা যান, তখন হাসিবুর খুবই ছোট। মা-বাবার একমাত্র সন্তান হাসিবুর তার বাবার সঙ্গেই বড় হয়। বাবার শয্যাশায়ী অবস্থা তার জীবনে আরও এক নতুন চ্যালেঞ্জ হয়ে আসে। তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক ছিল। মা না থাকায় সংসারের সব দায়িত্ব এসে পড়ে ছোট্ট হাসিবুরের কাঁধে। গ্রামের অন্য শিশুদের মতো স্কুলে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি, কারণ সংসারের খরচ চালানোর মতো আর কেউ ছিল না। অর্থাভাবে পড়াশোনা করতে পারেনি সে।

বয়স একটু বাড়তেই, সে দিনমজুরের কাজ শুরু করে, কখনও ক্ষেতখামারে, কখনও বা অন্যের গরু-মহিষ চড়িয়ে। জীবনের তাগিদে ছোটবেলায়ই তাকে বড় হতে হয়। কাজ করতে করতে তার হাতের শক্তি বাড়তে থাকে এবং একদিন সে মোটর মেকানিক হিসেবে কাজ শেখা শুরু করে। মেকানিকের কাজ তাকে অর্থ এনে দিতে শুরু করে, কিন্তু বাবা শয্যাশায়ী থাকায় সে পুরো পরিবারের একমাত্র অবলম্বন হয়ে ওঠে। হাসিবুরের জীবন ছিল কঠিন বাস্তবতার প্রতিফলন। তার প্রত্যেকটি দিন ছিল লড়াইয়ের দিন, কিন্তু সে কখনও থেমে থাকেনি। মা-বাবার প্রতি ভালোবাসা ও নিজের দায়িত্ববোধ তাকে প্রতিনিয়ত এগিয়ে নিয়ে গেছে।

শহীদের অর্থনৈতিক অবস্থা

মোটর মেকানিক হাসিবুর রহমান পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। তার মা মারা যাওয়ার পর তার বাবা প্যারালাইজড হয়ে যায়। তিনি বিছানা থেকে উঠতে পারেন না। হাসিবুরের বৃদ্ধ দাদী মূলত হাসিবুরের বাবা ও তার ফুফুর দেখাশোনা করেন। তার ফুফুও হাসিবুরের পরিবারে থাকেন। হাসিবুরের ফুফু অসুস্থ ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। একমাত্র হাসিব আয় করে পরিবারটা চালাত। টাকার অভাবে হাসিবের বাবার চিকৎসা বন্ধ আছে। নিয়মিত ও ভালো চিকিৎসা দিলে তার সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ৪ সদস্যের পরিবারটি হাসিবকে হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছেন। মোটর মেকানিক হাসিবুর রহমান ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। মায়ের মৃত্যুর পর তার বাবা প্যারালাইজড হয়ে পড়েন, বিছানায় শুয়ে কাটে তার দিন, আর উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন। পরিবারের যত্ন আর দেখভালের ভার পড়ে হাসিবুরের বৃদ্ধ দাদীর ওপর, যিনি নিজেই বয়সের ভারে ক্লান্ত।

শাহাদাতের বর্ণনা

ছাত্র আন্দোলনের শুরু থেকেই আন্দোলনে সক্রিয় ভুমিকা পালন করে হাসিবুর। ৫ আগস্ট তার রাবার বুলেট লেগেছিল। সকালে খাওয়ার পরে মার্চ টু ঢাকা প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হয়ে সাভারে ছাত্রদের সাথে যোগ দেয়। হঠাৎ দুটি সাধারণ গাড়ি আন্দোলরত ছাত্রদের সামনে আসে, সেখান থেকে পুলিশ বের হয়ে গুলি শুরু করে।একটি বুলেট এসে হাসিবুরের মাথায় লাগে। সাথে সাথে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে, আশেপাশের কোন হাসপাতাল তাকে ভর্তি করেনি । পরে এনাম মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটালে নিয়ে গেলে, তার এলাকার এক ভাই তাকে দেখে চিনতে পারে। সে হাসিবের বাসায় খবর দেয়। তিনদিন আইসিউতে থাকার পর ৭ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

নিজ বাড়ি মাদারীপুরে জানাজা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

শহীদ হাসিবুর রহমান ছিলেন এক অসাধারণ তরুণ, যিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন দেশ ও সমাজের জন্য। ছোটবেলা থেকেই তিনি স্বপ্ন দেখতেন পরিবারকে ভালোভাবে দেখাশোনা করার এবং দেশের জন্য কিছু করার। তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর সংসারের দায়িত্ব যেন আচমকাই তাঁর কাঁধে এসে পড়ে। বাবার অসুস্থতা এবং প্যারালাইজড অবস্থায় বিছানায় শুয়ে থাকা, অসহায় দাদী ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ফুফুর দেখাশোনার ভার–সব মিলিয়ে একটি দুর্বিষহ জীবন চালাতে তিনি নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন। হাসিব ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি, যার শ্রমের উপর নির্ভর করছিল পুরো সংসার।

শহীদ সম্পর্কে অনুভুতি

শহীদ হাসিবের চাচাত চাচা বলেন, হাসিবের দাদা ও মা মারা যাওয়ার পর তার বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসিব সংসারের হাল ধরেন। এখন সে মারা যাওয়ায় এ পরিবারকে দেখার আর কেউ নেই।

প্রস্তাবনা

হাসিবের বাবা ও ফুফুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
নিয়মিত আয়ের কোন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য সমূহ

নাম	: হাসিবুর রহমান
জন্মসাল	: ২০০৭
পেশা	: মোটর মেকানিক
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: উত্তর কানাইপুর, ইউনিয়ন: আলীনগর, থানা: মাদারীপুর , জেলা: মাদারীপুর
পিতার নাম	: দেলোয়ার ঢালি, বয়স: ৫১, শয্যাশায়ী
মাতার নাম	: মৃত আলমাস,
মাসিক আয়	: নেই
ঘটনার স্থান	: সাভার
আক্রমণকারী	: ঘাতক পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল	: ০৫/০৮/২০২৪ সময়: সকাল ১০:৩০
নিহত হওয়ার সময়কাল	: তারিখ ৭ আগষ্ট ২০২৪, সময়: বিকাল ৪:০০ এনাম মেডিকেল কলেজ
কবরস্থান	: উত্তর কানাইপুর, আলীনগর, মাদারীপুর

শহীদ তাওহিদ সন্যামাত

ক্রমিক : ২২০

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৮৮

শহীদের জন্ম পরিচয়

তাওহিদ সন্যামাত, জন্ম ১৪ জুলাই, ২০০৭। তিনি মাদারীপুর জেলার সুচিয়াডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের শুরু থেকেই দারিদ্র্যের কঠিন বাস্তবতা তাঁকে পরিবেষ্টিত করে। পিতার নাম মো: সালাহ উদ্দিন সন্যামাত, যিনি পেশায় একজন দিনমজুর এবং বয়স ৬০ বছর। এই পরিবারের জন্য প্রতিদিনের সংগ্রামই ছিল স্বাভাবিক ঘটনা।

গ্রামের পরিবেশে তাওহিদ বেড়ে উঠেছেন। সবার সঙ্গে তাঁর সখ্যতা ছিল অতুলনীয়। মিশুক প্রকৃতির কারণে তিনি খুব সহজে সকলের মন জয় করতেন। শৈশবের খেলার সঙ্গী থেকে শুরু করে, অভিজ্ঞদের কাছে শেখার মাধ্যমে জীবন সংগ্রামের পাঠ নেন। অল্প বয়সেই পরিবারের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিতে তাঁকে বাধ্য করেছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দারিদ্র।

নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করে তাওহিদ প্রতিদিন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতেন। কিন্তু কখনোই তাঁর মুখে হতাশার ছায়া পড়তে দেননি। এভাবে তিনি জীবনকে নতুন করে উপলব্ধি করেছেন, যেখানে পরিশ্রমের মূল্যই সত্যিকারের সুখের চাবিকাঠি। তাওহিদের জীবন গল্পে ফুটে ওঠে এক আদর্শ যুবকের চিত্র, যে কষ্টের মাঝে বাঁচার অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে চলে।

শহীদ পরিবারের দারিদ্রতার ছাপ

তাওহিদ সন্যামাতের জীবন যেন এক করুণ কাহিনীর প্রতিচ্ছবি। পাঁচ সদস্যের পরিবার, যার তিন ভাইয়ের মধ্যে তাওহিদ মধ্যম। তাদের ঘর, টিনের চালা দিয়ে তৈরি, মাত্র দুই রুমের এক ক্ষুদ্র আশ্রয়স্থল। পরিবারটি এই ঘরের ভিটা ছাড়া আর কোনো জমির মালিক নয়, যেন শূন্যে ভাসমান এক সংগ্রামী জীবন। তাওহিদের পড়ে। এই পরিবারটি বেঁচে থাকে শুধুমাত্র আগামী দিনের আশায়। কিন্তু তাদের জীবন যেন বৃষ্টিহীন মরুভূমিতে জলস্রোতের অপেক্ষা। তৌহিদের পরিবার দারিদ্র্যের অন্ধকারে ডুবে থাকলেও, তাদের ভেতরে বেঁচে থাকার এক অনির্বাণ ইচ্ছা জ্বলে, যা তাদের প্রতিদিনের কষ্টের মধ্যেও একটি ক্ষীণ আলোর উৎস হয়ে আছে।

বাবা ছাড়া পরিবারের আর কেউ উপার্জনক্ষম নয়। বাবার কাঁধেই ভর করে পুরো সংসারের হাল ধরে রাখার চেষ্টা। তাওহিদ নিজেও নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে যে কষ্টার্জিত অর্থ উপার্জন করতেন, তা দিয়ে কোনো রকমে দিন চলে। দারিদ্র্যের শেকলে বাঁধা এই পরিবার প্রতিদিন বেঁচে থাকার সংগ্রামে লিপ্ত, দিন এনে দিন খাওয়া ছাড়া অন্য কোনো স্বপ্ন তাদের ধরা দেয় না।

মানবেতর এই জীবনের ছাপ যেন তাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসে ধরা

ঘটনার প্রেক্ষাপট

১৮ জুলাই ২০২৪ সালে, আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলার প্রতিবাদে সারা দেশের মতো মাদারীপুরেও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল। ন্যায়ের দাবিতে উদ্দীপ্ত ছাত্ররা রাস্তায় নেমে এসেছিল। তাদের কণ্ঠে ছিল অধিকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান। ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে এলাকাবাসীও মন থেকে তাদের সমর্থন জানায়। কিন্তু সেই দিনে কিছু অশান্তি ও বর্বর আক্রমণ ঘটেছিল। যার ফলে দীপ্ত দে নামের এক ছাত্র জীবন

হারায় এবং অনেকে আহত হন। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর মাদারীপুরের জনগণের মনে ক্ষোভ ও হতাশার সঞ্চার হয়। পরদিন ১৯ জুলাই, পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়, যখন ছাত্র-জনতা একত্রিত হয়ে পুনরায় আন্দোলনে নামে স্বৈরাচার হাসিনার বাকশালের বিরুদ্ধে। তারা চেয়েছিল ন্যায়বিচার এবং শোষণের অবসান। কিন্তু এই সংগ্রামে তারা বাধার সম্মুখীন হয়। যদিও তারা নিরস্ত্র ছিল, তবুও প্রতিরোধের চেষ্টায় তাদের সাহস হারায়নি। তারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য পথে নামে।

তাওহিদ সন্যামাত, একজন সাধারণ নির্মাণ শ্রমিক, ৭ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন। তার বন্ধুরা এই আন্দোলনের অংশ ছিল এবং তাদের ওপর আক্রমণের খবর তাওহিদকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। বিকাল ৩ টার দিকে, তাওহিদ সিদ্ধান্ত নেন যে, ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে হবে। কাউকে কিছু না বলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন আন্দোলনের মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্য। আনুমানিক বিকাল ৫ টার দিকে, মাদারীপুর শহরের উপকণ্ঠে খাগদি নামক স্থানে আন্দোলনের সময়, তাওহিদ গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং সেখানেই শহীদ হন। তাওহিদের এই আত্মত্যাগ আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নতুন প্রেরণার জন্ম দেয়।

তাওহিদের মৃত্যু ছাত্র-জনতাকে একত্রিত করে আরও দৃঢ়ভাবে। তার প্রতি সম্মান জানিয়ে আন্দোলনকারীরা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে মাদারীপুরকে আওয়ামী সন্ত্রাসমুক্ত শান্তির পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাওহিদ সন্যামাত ছিলেন এক সাধারণ ব্যক্তি, যার হৃদয়ে ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার দৃঢ় সংকল্প। তার আত্মত্যাগ মানুষকে এক নতুন শক্তি দেয় এবং তাকে স্মরণীয় করে রাখে ন্যায়ের প্রতীক হিসেবে।

শহীদ সম্পর্কে অনুভূতি

তাওহিদ ছিলো এক অমায়িক, স্নেহময় সন্তান, যে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জন্য ছিলো নিবেদিত প্রাণ। বড় ভাইয়ের কণ্ঠে ঝরে পড়ে তার আত্মত্যাগের করুণ গল্প, "তৌহিদ ছিলো সত্যিই এক অসাধারণ ছেলে। সে নিয়মিত নামাজ পড়তো, ধর্মীয় দায়িত্বগুলো নিষ্ঠার সাথে পালন করতো। যখন দেখলো পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা ভঙ্গুর, তখন নিজের স্বপ্নকে থামিয়ে দিয়ে আমার পড়াশোনার খরচ চালাতে এবং বাবাকে সহযোগিতা করতে পড়াশোনা ছেড়ে দিলো। বাবার পাশে দাঁড়িয়ে শ্রমিকের কাজে যোগ দিলো, যেন সংসারের চাকা সচল থাকে।"

মায়ের হৃদয়ে জমে থাকা কথা যেন অশ্রুবিন্দুর মতো গড়িয়ে পড়ে, "আমার ছেলে আমাকে বলতো, 'মা, তোমার আর কোনো চিন্তা নেই। আমি বিদেশে যাবো, ঘর বানাবো, তোমাদের সব কষ্ট দূর করবো। দুই ভাইয়ের দায়িত্ব আমি নেবো, বাবাকে আর কষ্ট করতে দেবো না।'" তাওহিদের প্রতিটি কথা যেন প্রতিশ্রুতির বাতিঘর হয়ে ঝলমল করছিলো, যে প্রতিশ্রুতির আলোয় তার মা-বাবার মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলো। তাওহিদ ছিলো পরিবারের জন্য আলোকবর্তিকা, যার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিলো ভালোবাসা, দায়িত্ব, আর আত্মত্যাগের এক নিঃস্বার্থ প্রদীপ। কিন্তু সেই প্রদীপ নিভে গেলো, রেখে গেলো তার স্বপ্ন আর প্রতিশ্রুতির অপূর্ণতা, আর পরিবারের বুকের গভীরে এক শূন্যতার কালো মেঘ।

প্রস্তাবনা

বাসস্থান প্রয়োজন।

বাবা অথবা বড় ভাইয়ের জন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে।

ছোট ভাইয়ের লেখা-পড়ার খরচ যোগাতে সহযোগিতা করা যেতে পারে।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

পুরো নাম	: তাওহিদ সন্যামাত
জন্মসাল	: ১৪/০৭/২০০৭
পেশা	: নির্মাণ শ্রমিক
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: সুচিয়াডাঙ্গা, ইউনিয়ন: মোস্তফাপুর, থানা: মাদারীপুর, জেলা: মাদারীপুর
পিতার নাম	: মো: সালাহ উদ্দিন সন্যামাত, পেশা: দিনমজুর, বয়স: ৬০ বছর
ঘটনার স্থান	: সার্বিক ফিলিং স্টেশন, খাগদি, মাদারীপুর
আক্রমণকারী	: সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ
আহত হওয়ার সময়কাল	: তারিখ-১৯ জুলাই বিকাল : ৪:০০টায়
নিহত হওয়ার সময়কাল	: তারিখ- ১৯ জুলাই, ২০২৪ সময়: ৬:০০ সন্ধ্যা
কবরস্থান	: পারিবারিক কবরস্থান

শহীদ ছোবহান মুন্সি

ক্রমিক: ২২১

আইডি: ঢাকা বিভাগ ০৮৮

জন্ম পরিচয়

ছোবহান মুন্সি ২ জানুয়ারি ১৯৯১ সালে মাদারীপুর জেলার রাজৈর থানার বাসুদেবপুর গ্রামে একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আয়ুব আলী মুন্সি। যার বর্তমান বয়স ৬০ বছর, এবং মাতার নাম মোছা: রুববান, বয়স ৫২ বছর। ছোবহানের পরিবার সবসময়ই অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতো। দারিদ্র্যতার কারণে ছোবহান ছোটবেলা থেকেই নানা সংকটের মুখোমুখি হন, যার ফলে তিনি স্কুলে যাওয়া এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। ছোট বয়সেই সংসারের হাল ধরতে হয় সোবহানকে। ঢাকায় পাড়ি জমিয়ে ফুটপাতে হকারির কাজ শুরু করেন, যার মাধ্যমে অন্ন, বস্ত্র এবং পরিবারের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করতেন। মাসিক আয় ছিল মাত্র ১৫,০০০ টাকা, যা দিয়ে কোনো রকমে পরিবারের ভরণ-পোষণ চালাতেন। তার এই আয়ে নির্ভর করত তার মা-বাবা ও সন্তানরা। সোবহান ছিলেন সৎ এবং পরিশ্রমী একজন মানুষ। জীবনের প্রতিটি ধাপে তিনি হালাল উপার্জন করে সংসার চালানোর চেষ্টা করতেন। ছোবহান তার ছোটবেলা থেকেই দারিদ্রের সাথে লড়াই করে বড় হয়েছেন। তিনি কখনও সুযোগ পাননি স্কুলে পড়ার, তবে নিজের সন্তানদের জন্য তিনি স্বপ্ন দেখতেন ভালো ভবিষ্যতের। ঢাকায় হকারির কাজ করে সন্তানদের পড়াশোনার খরচ মেটাতেন এবং পরিবারের সুখ-শান্তির জন্য নিরলস পরিশ্রম করতেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ঢাকায় আন্দোলনের সময়, ছোবহান মুন্সি পুলিশের গুলিতে নিহত হন। তার এই আত্মত্যাগ ছিল দেশের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের একটি অংশ। তার মৃত্যুতে তার পরিবার চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে এবং তাদের জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে ওঠে। ছোবহান মুন্সির মতো একজন পরিশ্রমী এবং সৎ মানুষের মৃত্যুতে সমাজ এক নিষ্ঠাবান কর্মীকে হারিয়েছে।

শহীদের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ ছোবহান মুন্সির জীবন ছিল সংগ্রামমুখর এবং দুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ। তিনি একজন দিনমজুর হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করতেন, এবং তার উপার্জনের একমাত্র মাধ্যম ছিল ঢাকার ফুটপাথে হকারি করা। প্রতিদিনকার পরিশ্রমের মাধ্যমে যে সামান্য আয় করতেন, তা দিয়েই তিনি তার পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতেন। সুবহানের জীবনের প্রতিটি দিনই ছিল কঠিন সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি, যেখানে তার আয়েই নির্ভর করত পুরো পরিবারের ভাগ্য। ছোবহানের সংসারে তিনটি ফুটফুটে রয়েছে, যারা সবাই পড়াশোনা করছে। তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য ছোবহান কঠোর পরিশ্রম করতেন। তিনি তার কষ্টার্জিত টাকায় মেয়েদের স্কুলে পাঠাতেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষাই তাদের জীবনের পরিবর্তন আনবে। কিন্তু তার এই আকাঙ্ক্ষা মাঝপথে থেমে গেল, যখন ৫ আগস্ট ২০২৪ সালের আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে তার মৃত্যু হয়।

ছোবহানের মৃত্যুতে পুরো পরিবারটি যেন অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। তার মা-বাবাও ছিল তাকে কেন্দ্র করে, কারণ পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন ছোবহান। তিনি যেভাবে পরিবারের দেখাশোনা করতেন, তার উপর নির্ভর করেই মা-বাবা বাকি জীবন কাটানোর স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু সেই স্বপ্নগুলো এখন শুধুই ভগ্নাংশ, কারণ ছোবহানের মৃত্যুতে ইনকামের একমাত্র চাকা থেমে গেছে। পরিবারটি এখন মানবেতর জীবনযাপন করছে, তাদের কোনো আয়ের উৎস নেই। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা এখন বন্ধ হওয়ার উপক্রম। স্কুলের ফি, বইপত্র, এবং অন্যান্য খরচ মেটানোর আর কোনো উপায় নেই। ছোবহান তার মেয়েদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যে স্বপ্ন দেখতেন, তা এখন ধূলিসাৎ হওয়ার পথে। তাদেরকে হয়তো পড়াশোনা ছাড়তে হবে এবং অল্প বয়সেই কর্মজীবনে নামতে হবে পরিবারের খরচ মেটানোর জন্য। ছোবহানের মৃত্যুর পর তার পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। কোনো সরকারি বা বেসরকারি সাহায্য ছাড়াই তারা বর্তমানে দারিদ্রের সাথে লড়াই করছে। প্রতিদিনের খাবার জোগাড় করতেও তারা হিমশিম খাচ্ছে। ঋণের বোঝা বাড়ছে, আর জীবনযাপন হয়ে উঠেছে অসহনীয়। এই অসহায় পরিবারটি এখন সমাজের করুণ চিত্র, যারা দেশের জন্য একজন শহীদকে হারিয়ে নিজেরাই হারিয়ে যাচ্ছে দারিদ্রের অতলে।

শাহাদাতের বর্ণনা

৫ আগস্ট ২০২৪ সাল, একটি দিন যা বাংলাদেশের ইতিহাসে রক্তক্ষয়ী দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। দেশব্যাপী চলমান ছাত্র-জনতার আন্দোলন, ন্যায়ের শাসন, ভোটাধিকার এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। ফ্যাসিস্ট শাসন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে লাখো জনতা রাস্তায় নেমে এসেছিল। শেখ হাসিনার দীর্ঘকালীন স্বৈরাচারী শাসন, যেখানে ন্যায় শাসন, জবাবদিহিতা এবং মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছিল, সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনতার আন্দোলন ধীরে ধীরে গণজাগরণে পরিণত হয়। ছোবহান মুন্সি, একজন সাধারণ ছাত্র, তার মতো অসংখ্য তরুণের সাথে এই আন্দোলনে যোগদান করেন। ছোবহান একদিনের জন্যও পিছিয়ে থাকেননি; তিনি বিশ্বাস করতেন এই আন্দোলন শুধু তার নিজের জন্য নয়, দেশের সকল মানুষের স্বাধীনতা এবং অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য। শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর, জনতা বিজয়ের আনন্দে উল্লসিত হয়ে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে বিজয় মিছিল বের করে। সুবহান মুন্সি সেই মিছিলের সামনের সারিতে ছিলেন।

মিছিলটি যখন বংশাল থানার কাছে আসে, তখন পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শেখ হাসিনা সরকারের কিছু অতি উৎসাহী পুলিশ কর্মকর্তা মিছিলটিকে ভয় দেখাতে শুরু করে। হঠাৎই গুলির আওয়াজ শোনা যায়, এবং সেখানেই ঘটে যায় মর্মান্তিক ঘটনা। পুলিশ বাহিনী জনতার উপর বেপরোয়া গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। প্রথমে একটি গুলি এসে সুবহানের পায়ে লাগে, কিন্তু তাতেও তিনি থামেননি; তিনি আরও দৃঢ়তার সাথে সামনে এগিয়ে যেতে থাকেন। তারপর হঠাৎ আরেকটি গুলি এসে তার বুকে লাগে। মুহূর্তের মধ্যে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

মিছিলের অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরা তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে, চিকিৎসকরা তার অবস্থা সংকটাপন্ন ঘোষণা করেন। অবশেষে, চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকেল ৬:১৫ টায় সুবহান মুন্সি মৃত্যুবরণ করেন। তার এই আত্মত্যাগ কেবল তার নিজের পরিবারের জন্য নয়, গোটা দেশের জন্য এক বিরাট ক্ষতি। তিনি হাসিনার ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে নিজের জীবন দিয়ে প্রতিবাদ জানালেন।সুবহানের মতো হাজারো তরুণ-তরুণী শেখ হাসিনার সরকারের অধীনে ভয়াবহ দুর্নীতি, অন্যায় এবং অধিকার হরণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। তাদের একমাত্র চাওয়া ছিল একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন, ন্যায়বিচার এবং জনতার ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা। কিন্তু সেই দাবিগুলো দমন করতে পুলিশ বাহিনী নির্বিচারে গুলি চালায়, জীবন কেড়ে নেয় অসংখ্য নিরীহ মানুষের, ঠিক যেমনটি ঘটেছিল সুবহান মুন্সির সাথে। তার সাহসিকতা এবং আত্মত্যাগ সবসময়ই দেশের

তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে যাবে। দেশে ভোটাধিকার, ন্যায় শাসন, এবং জবাবদিহিতার দাবিতে তার এই অমর সাহসিকতা যেন নতুন করে জাগ্রত করে দেশের জন্য আত্মত্যাগের শক্তি।

শহীদ সম্পর্কে অনুভূতি

শহীদ ছোবহান মুন্সি সম্পর্কে তার প্রতিবেশীরা বলেন, তিনি ছিলেন একজন সৎ ও পরিশ্রমী মানুষ। হালাল উপার্জন করেই নিজের এবং পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতেন। তার জীবনে অসততার কোনো জায়গা ছিল না। এলাকায় কেউ বিপদে পড়লে সোবহানই প্রথমে এগিয়ে যেতেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। সবাই তাকে ভালোবাসত এবং তার সাহায্যপ্রবণ স্বভাবের জন্য তিনি এলাকায় খুবই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। এখন তার মৃত্যুর পর, সবাই তাকে গভীরভাবে স্মরণ করছে এবং তার অভাব অনুভব করছে।

এক নজরে

নাম	: ছোবহান মুন্সি
জন্মসাল	: ০২/০১/১৯৯১
পেশা	: ফুটপাতের হকার
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: বাসুদেবপুর, ইউনিয়ন: পাইকপাড়াপ, থানা: রাজৈর, জেলা: মাদারীপুর
পিতার নাম	: আয়ুব আলী মুন্সী, বয়স: ৬০ বছর
মাতার নাম	: মোছা: রুববান, বয়স: ৫২ বছর
মাসিক আয়	: ১৫০০০/-
আয়ের উৎস	: হকারী
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন
ছেলে-মেয়ে	: ১ ছেলে ২ মেয়ে
	: ১. ছেলে: সায়েম মুন্সি, বয়স: ১০ বছর, শিক্ষার্থী: বাসীদাতপুর প্রাইমারি স্কুল
	: ২. মেয়ে: মারিয়া, বয়স: ৭ বছর, নুরানি মাদরাসা
	: ৩. মেয়ে: সায়মা, বয়স: ৩ বছর
ঘটনার স্থান	: বংশাল
আক্রমণকারী	: ঘাতক পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল	: তারিখ: ০৫ আগস্ট ২০২৪, বিকাল : ৪:০০টায়
নিহত হওয়ার সময়কাল	: তারিখ: ০৫ আগস্ট ২০২৪, সন্ধ্যা: ৬:০০টায়
স্থান	: সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
কবরস্থান	: পারিবারিক কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১. স্থায়ী বসবাসের জন্য জায়গা।
২. সন্তানদের পড়া-লেখার ব্যবস্থা করে দেওয়া।
৩. স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া।

শহীদ মো: আল আমিন

ক্রমিক ২২২

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৮৯

পরিচিতি

আল আমিন, ১৯৯৫ সালে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার শৈশব ছিল কষ্টের, কিন্তু ভালোবাসা আর স্নেহের কোনো কমতি ছিল না। বাবা-মা তাকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতেন। তাদের একমাত্র আলোর প্রদীপ ছিল আল আমিন। সেই পরিবারটি প্রতিদিনকার জীবন সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, দিন এনে দিন খায়, ক্ষুধার তাড়নায় প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে। তবুও আল আমিনের শৈশব কাটে শান্তিতে, বাবা-মায়ের স্নেহময় আশ্রয়ে। শহরের ইট-পাথরের বুকে বেড়ে ওঠা আল আমিন যেন তার চারপাশের কোলাহল, ধূলাবালি, আর নির্মম বাস্তবতাকে খুব কাছ থেকে অনুভব করেছিল। ঢাকার কঠিন বাস্তবতায়ও তার হৃদয় ছিল কোমল, ন্যায়ের প্রতি ছিল প্রবল টান। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে বরাবরই ছিল সোচ্চার। বৈষম্যের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা তরুণদের দলে সে নিজেকে বিলিয়ে দিল, যেন সমাজের নিপীড়িতদের জন্য তার জীবন উৎসর্গ করাই ছিল তার শেষ লক্ষ্য। অবশেষে, একদিন সেই সংগ্রামের মিছিলে দাঁড়িয়ে আল আমিন হয়ে গেলেন শহীদ। বৈষম্যের শৃঙ্খল ভাঙার জন্য জীবন দিয়ে গেলেন, রেখে গেলেন এক শূন্যতা। তার মৃত্যুতে বাবা-মা পরিণত হলেন অসহায়, যেন তাদের সারা জীবনের সম্বল হারিয়ে গেছে। আল আমিনের স্মৃতি শুধু তার পরিবারের জন্য নয়, সমাজের নিপীড়িত মানুষের জন্যও এক অনুপ্রেরণা হয়ে রয়ে গেল।

শহীদ সম্পর্কে অনুভতি

শহীদ আল আমিন সম্পর্কে তার বড় ভাই বলেন, তিনি অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন। কখনও কোনো দ্বন্দ্বে জড়াতে দেখা যায়নি তাকে। বরং তিনি সবসময় সবার সাথে মিলে-মিশে চলার চেষ্টা করতেন। এলাকার সবাই তাকে একজন ভালো মানুষ হিসেবেই জানতেন। পরিবারের আবদার পূরণের জন্য আল আমিন সবসময় সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন। তার মধ্যে একটি মমতাময়, সহানুভূতিশীল স্বভাব ছিল, যা তাকে পরিবারের প্রিয় সদস্যে পরিণত করেছিল। তিনি পরিবার ও সমাজে সবার কাছে শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন, এবং তার অনুপস্থিতি পরিবার ও এলাকাবাসীর জন্য গভীর শোকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শাহাদাতের বিবরণ

শহীদ মো: আল আমিনের জীবন ও তার শাহাদাতের ঘটনা গভীর বেদনা ও ত্যাগের প্রতীক। ৫ আগস্ট, বিজয়ের দিন। বিকেলের আলো তখনও ফিকে হয়নি। আনুমানিক বিকাল ৩টার দিকে আল আমিন তার ছোট ভাইকে দোকান বন্ধ করার নির্দেশ দেন। দুজনেই তখন বিজয়ের আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে মিছিলে শামিল হওয়ার জন্য বাড্ডা মোড়ের দিকে পা বাড়ান। সেই মুহূর্তে তাদের মন ভরে ছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন আর ন্যায়বিচারের প্রত্যাশায়। মোড়ের কাছাকাছি পৌঁছালে হঠাৎ করে মিছিলের মধ্যে এক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। পরিস্থিতির অবনতি দেখে আল আমিন তার বড় ভাইকে বললেন, "তুমি বাসায় যাও, আমি পরে আসছি।" যেন সবকিছু শান্ত হলে তিনি ফিরে আসবেন। কিন্তু কে জানতো এটাই হবে তাদের শেষ কথা! আল আমিন সামনে এগিয়ে মোড়ে পৌঁছালে হঠাৎ করে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত গুলি তার দেহে আঘাত হানে। স্থানীয়রা তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে থেকে তাকে মুগদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। চিকিৎসকদের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, কিছুক্ষণ পরই আল আমিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। একটি স্বপ্নময় জীবন অকালে থেমে যায়। এই ঘটনার পর আল আমিনের ছোট ভাই তাকে খুঁজতে বের হন। বাড্ডা পৌঁছে একে-অপরকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন, তার ভাই গুলিবিদ্ধ হয়ে স্থানীয় হাসপাতালে আছেন। কিন্তু হাসপাতালের রেজিস্ট্রারের ভুলের কারণে তার ভাইয়ের কোনো খোঁজ তিনি পাননি। বিভিন্ন হাসপাতালে দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর, মুগদা মেডিকেল কলেজ আল আমিনের নিথর দেহের সন্ধান মেলে।

শহীদ ছিলেন একজন প্রখর রাজনৈতিক সচেতন যুবক। বয়সে তরুণ হলেও তিনি স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রামে সাহসিকতার সাথে অংশগ্রহণ করতেন। ফেসবুকসহ বিভিন্ন মাধ্যমে বাক স্বাধীনতার পক্ষে তিনি সবসময় সরব থাকতেন। কোটা সংস্কার আন্দোলনসহ বিভিন্ন সামাজিক ন্যায়ের দাবিতে মাঠে থাকতেন তিনি। ন্যায়বিচারের স্বপ্নে বেঁচে থাকা এই তরুণ, যিনি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সবসময় নিজের শক্তি ও সময় ব্যয় করতেন, তার এই অকাল প্রয়াণ যেন সেই স্বপ্নগুলোকে স্তব্ধ করে দিল। শহীদ আল আমিনের মৃত্যু কেবল তার পরিবারকেই শোকের সাগরে ভাসিয়ে দেয়নি, বরং সমাজের প্রতিটি স্তরে গভীর শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। তার মতো সাহসী এবং সৎ মানুষের অনুপস্থিতি একটি জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।

শহীদের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ

শহীদ মো: আল আমিনের জনক দীর্ঘদিন সৌদি প্রবাসী ছিলেন। দুই বছর পূর্বে দেশে ফিরে এসেছেন। বর্তমানে পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস টেকনিক্যাল কাজ। যার আয়ে চলে পরিবারের দৈনন্দিন জীবনযাপন। আল আমিনের শহীদ হওয়ার পর পরিবারটি গভীর অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে। তিনি পরিবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন এবং তার সাহায্য ছাড়া পরিবারের সমস্ত চাহিদা পূরণ করা দুঃসাধ্য ছিল। শহীদের অভাব এখন শুধু পরিবারের জন্য মানসিক শোকই নয়, বরং অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কারণও হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(UPSDR Form-3A)

People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar of Birth and Death
Bijhari Union Parishad
Naria, Shariatpur
Birth Certificate

Register No: 6

Date of Registration: 28-12-2011
Date of Issue: 21-05-2017

Birth Registration No: *19958616518019634

Name: MD. AL AMIN

Date of Birth: 08-10-1995
Eighth October Nineteen Hundred Ninety Five
Sex: Male

Place of Birth: VILL:SOUTH MOGAR, P.O:PANCHAPOLLI P.S:NARIA, DIST:SHARIATPUR

Father's Name: ISMAIL
Father's Nationality: BANGLADESHI
Mother's Name: ZIASMIN
Mother's Nationality: BANGLADESHI

Permanent Address: VILL:SOUTH MOGAR, P.O:PANCHAPOLLI P.S:NARIA, DIST:SHARIATPUR

UP Secretary - Seal and Signature
(Seal of the Registrar's Office)
(Signature and Name of Registrar with Seal)
Chairman

শহীদের প্রোফাইল

নাম	: মো: আল আমিন
জন্ম	: ০৮/১০/১৯৯৫
পেশা	: টেকনিশিয়ান
পিতা	: ইসমাঈল
মাতা	: জেসমিন
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: আফতাব নগর, সি-ব্লক, বাড্ডা, ১২১২
ঘটনার স্থান	: বাড্ডা
আক্রমণকারী	: ঘাতক পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল	: তারিখ: ৫ আগষ্ট ২০২৪
নিহত হওয়ার সময়কাল	: তারিখ: ৫ আগষ্ট ২০২৪, মুগদা মেডিকেল হাসপাতাল
কবরস্থান	: বাড্ডা কবরস্থান
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন

১) সুমি আক্তার, বয়স: ২৮, সম্পর্ক: স্ত্রী
২) সিয়াম, বয়স: ১৩ বছর, শ্রেণি: ৫ম, সম্পর্ক: ছেলে
৩) নূর, বয়স: ০৩ বছর, সম্পর্ক: ছেলে

প্রস্তাবনা

১. শহীদ স্ত্রীকে মাসিক বা এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে
২. শহীদ সন্তানদের লেখাপড়ার দায়িত্ব নেয়া যেতে পারে
৩. শহীদ সন্তানের লালনপালনে তাঁর স্ত্রীকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে

শহীদ বাঁধন

ক্রমিক : ২২৩

আইডি: ঢাকা বিভাগ ০৯০

শহীদের জন্ম পরিচয়

শহীদ বাঁধন ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সালে শরিয়তপুর জেলার ডিঙ্গামানিক ইউনিয়নের দক্ষিণ মালধ গ্রামে এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে বড় হয়েছেন। তার পরিবার ছিল অভাব-অনটনে জর্জরিত, যেখানে তার বাবা রোমান হাওলাদার ক্ষুদ্র ব্যবসা করে প্রতিমাসে মাত্র ৫,০০০ টাকা আয় করতেন। তার মা, বিথী আক্তার, একজন গৃহিনী। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ৪, যার মধ্যে বাধনের দুই ভাইও ছিল। বাধনের জীবনে শৈশব থেকেই ছিল দায়িত্বের বোঝা। পরিবারকে সহায়তা করার জন্য তিনি কম বয়সেই ওয়ার্কশপে কাজ করতে শুরু করেন। তার কাজের মাধ্যমে পরিবারের আর্থিক কষ্ট কিছুটা কমানোর চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। পরিবারের অভাব-অনটন থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সাহসী ও আত্মপ্রত্যয়ী।

বাঁধনের জীবন বদলে যায় ১৯ জুলাই ২০২৪ সালে, যখন তিনি যাত্রাবাড়ীতে ছাত্র-জনতার শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তবে সেই দিন পুলিশ বাহিনীর এক আক্রমণে বাঁধন গুরুতরভাবে আহত হন এবং তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায়, ২৩ জুলাই ২০২৪ সালে, বাঁধন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার মৃত্যুর পর তাকে গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, বাঁধন তার পরিবারের হাল ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন, যা তার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মনোভাবের প্রতীক। তার এই আত্মত্যাগের কাহিনী এখনো অনেকের জন্য প্রেরণা হিসেবে কাজ করে, বিশেষ করে যারা দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও সাহস ও সংগ্রাম করতে জানে।

শহীদ পরিবারের দারিদ্রতার ছাপ

বাঁধনের জীবনের কাহিনী হলো বাংলাদেশের এক দারিদ্র্য-পীড়িত পরিবারের প্রতিচ্ছবি। ছোটবেলাতেই তার বাবা-মায়ের বিচ্ছেদের ফলে জীবনের প্রথম ধাক্কা পান তিনি। মায়ের ভালোবাসা ও বাবার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে বাঁধনকে নানির কাছে থাকতে হয়। নানি অনেক কষ্ট করে তাকে বড় করেন, কিন্তু সংসারে অভাব-অনটন ছিল তার নিত্যসঙ্গী। বাঁধনের পরিবারের এমন পরিস্থিতি ছিল যে, তারা প্রতিদিনের খাবার জোগাড় করতেই হিমশিম খেত। বাঁধন কিছুটা বড় হয়ে স্বপ্ন দেখতেন একদিন বিদেশ যাবেন এবং পরিবারকে এই দারিদ্র্যের কবল থেকে মুক্ত করবেন। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তিনি ঢাকায় মায়ের কাছে যান এবং মোটর মেকানিকের কাজ শিখতে শুরু করেন।

কাজ শেখার পাশাপাশি মায়ের সঙ্গে থাকা, কিন্তু সেই সময়টাও ছিল কষ্টে ভরা। তার পরিবার দিনে এনে দিনে খেত। অর্থাৎ, আজকের দিনটি কাটানোর মতো কিছু খাবার জোগাড় হলে, কালকের জন্য নতুন করে সংগ্রামের মুখোমুখি হতে হতো। পরিবারের এই কঠিন বাস্তবতা বাঁধনকে জীবনের প্রতি বাস্তববাদী করে তোলে। স্বপ্ন ছিল বিদেশে গিয়ে বড় রোজগার করবেন, তবে বাস্তবতার কষাঘাতে সেই স্বপ্ন কতটা পূরণ হবে, তা ছিল অজানা। এমন দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটানো মানুষের কষ্ট ও সংগ্রাম যে কত গভীর, বাঁধনের জীবনের কাহিনী তারই একটি নিদর্শন।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

১৯ জুলাই ২০২৪, সোমবার দুপুরের দিকে বাঁধন ঢাকার যাত্রাবাড়ি এলাকায় শান্তিপূর্ণভাবে ছাত্রদের একটি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার প্রতিবাদ করা, যেখানে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মত প্রকাশের অধিকারকে দমন করার চেষ্টা হয়েছিল। ফ্যাসিস্ট সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতা একত্রিত হয়ে ন্যায়ের দাবি তুলে ধরতে রাস্তায় নামে।

বাঁধন মিছিলে সামনের দিকে অবস্থান করছিলেন, তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইতে তার ভূমিকা অপরিহার্য। কিন্তু পরিস্থিতি হঠাৎ করে পাল্টে যায়। শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চলতে থাকলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই সময় বাঁধন গুলিবিদ্ধ হন এবং গুরুতরভাবে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান। তাকে দ্রুত সহযোদ্ধারা উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।

সেখানে চিকিৎসকরা আপ্রাণ চেষ্টা করেন তাকে সুস্থ করে তোলার, কিন্তু চরম চেষ্টা সত্ত্বেও ২৩ জুলাই ২০২৪, রাত ৯ টা ৩০ মিনিটে বাঁধন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মোঃ বাঁধনের এই আত্মত্যাগ দেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাধীনতা, ন্যায় এবং গণতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ের এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে থাকে। তার স্বপ্ন ছিল একটি সমৃদ্ধ এবং ন্যায্য সমাজ গড়ে তোলার, কিন্তু তিনি তা দেখে যেতে পারলেন না। তবুও তার এই ত্যাগ ও সাহসিকতা তার সহপাঠীদের এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য প্রেরণা হয়ে থাকবে। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বাঁধনের অংশগ্রহণ তার সাহসিকতা ও ন্যায়বোধের পরিচায়ক, যেখানে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেও মানুষের অধিকারের জন্য লড়াই করে গেছেন।

শহীদ সম্পর্কে অনুভূতি

শহীদ বাঁধন সম্পর্কে প্রতিবেশীরা বলেন- বাঁধন অনেক সৎ ও সাহসী মানুষ ছিলেন। আন্দোলনে সক্রীয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তার অকাল মৃত্যুতে তার পরিবার মানবেতর জীবনযাপন করছে। সরকার ও দাতা সংস্থাদের পরিবারের পাশে দাড়ানোর আহবান জানান এবং এই নির্মম হত্যার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন।

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারকে এককালীন ও নিয়মিত আর্থিক সাহায্য প্রদান
২. শহীদের বাবাকে একটি ভালো ব্যবসা ধরিয়ে দেয়া
৩. শহীদের ভাইদের পড়াশুনার যাতে কোনোরকম ব্যাঘাত না ঘটে সে ব্যবস্থা করা

MAIR

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Dinga Manik Union Parishad
Naria, Shariatpur
(Rule 11, 12)
মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration: 20/08/2024
Death Registration Number: 20098616537100343
Date of Issuance: 20/08/2024

Date of Birth: 03/02/2009
Sex: Male
Date of Death: 06/08/2024
In Word: Sixth of August Two Thousand Twenty Four

নাম	বাধন	Name	Badhon
মাতা	বিথি আক্তার	Mother	Bithi Akter
মাতার জাতীয়তা	বাংলাদেশী	Nationality	Bangladeshi
পিতা	রোমান হাওলাদার	Father	Roman Howlader
পিতার জাতীয়তা	বাংলাদেশী	Nationality	Bangladeshi
মৃত্যুস্থান	শরীয়তপুর, বাংলাদেশ	Place of Death	Shariatpur, Bangladesh
মৃত্যুর কারণ	হত্যা	Cause of Death	Murder

20/08/2024
Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
Ripon Sadhu
Secretary
Dingamanik Union Parishad
Naria, Shariatpur

20/08/2024
Seal & Signature
Registrar
Al-Haj Abdul Aziz Sardar
Chairman
Dingamanik Union Parishad
Naria, Shariatpur

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য সমূহ

পুরো নাম	: বাঁধন
জন্মসাল	: ০৩/০২/২০০৯
পেশা	: ওয়ার্ক শপের কর্মচারী
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: দক্ষিণ মালধ, ইউনিয়ন: ডিঙ্গামানিক, থানা: নড়িয়া, জেলা: শরিয়তপুর
পিতার নাম	: রোমান হাওলদার, বয়স: ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, বয়স: ৪০ বছর
মাতার নাম	: বিথী আক্তার, ২৭, গৃহিনী
মাসিক আয়	: ৫০০০/-
আয়ের উৎস	: ব্যাবসা
পরিবারের ভাইদের নাম	: ২ জন
	১. নাবিল, ১১ বছর, শিক্ষার্থী, মাদরাসা
	২. আদনান, ১০ মাস
ঘটনার স্থান	: যাত্রাবাড়ী
আক্রমণকারী	: ঘাতক পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল	: তারিখ: ১৯ জুলাই ২০২৪
নিহত হওয়ার সময়কাল	: তারিখ: ২৩ জুলাই ২০২৪, সময়: ২:০০টা
স্থান	: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
কবরস্থান	: পারিবারিক কবরস্থান

শহীদ মো: রিয়াজুল তালুকদার

ক্রমিক: ২২৪

আইডি: ঢাকা বিভাগ ০৯১

পরিচিতি

২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের একজন শহীদ মো: রিয়াজুল তালুকদার। তিনি শরীয়তপুরের নড়িয়া থানার বিল আবুডা গ্রামে ৬ নভেম্বর ১৯৮৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মো: গিয়াসউদ্দিন তালুকদার এবং মোসা: সেহেরজান বিবির সন্তান। ছাত্র-জনতার গণ-বিপ্লবের শেষ প্রান্তে ৪ আগস্ট ২০২৪ শাহাদাত বরণ করেন তিনি।

ব্যক্তিগত জীবন

অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান রিয়াজুল তালুকদার। ছোট্ট একটা চাকরি করতো রিয়াজুল। কৃষক পিতার অস্বচ্ছল পরিবারের চার ভাইবোনের সংসার চলতো দুঃখে-কষ্টে। ছোট ভাইকে প্রতিষ্ঠিত করতে বিদেশেও তাকে টাকা পাঠাতে হয়েছে।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদের পিতা গিয়াসউদ্দিন তালুকদারের ছয়জনের সংসার। তিনি কৃষি কাজ করেন। তাতে সংসারে টানাপোড়েন যায় না। এ কারণে তিনি রিয়াজুলের ছোটভাইকে মালেশিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। সংসারে স্বচ্ছলতার আশায়, কিন্তু সে আশা পূরণ হয়নি। তাকেই বাংলাদেশ থেকে টাকা পাঠাতে হয়। কৃষি জমির ফল-ফসলাদি এবং রিয়াজুলের বেতনের টাকায় সংসার কোনক্রমে চলতো। তার মৃত্যুর পর এখন কিভাবে এ সংসার চলবে তা তারা জানেন না।

যেভাবে শহীদ হন মো. রিয়াজুল তালুকদার

৪ আগস্ট সন্ধ্যায় অফিস থেকে বাসায় ফিরছিলেন রিয়াজুল। রাস্তায় শিক্ষার্থী এবং পুলিশের মধ্যে ধাওয়া,পাল্টা-ধাওয়া চলছিল। হঠাৎ একটা গুলি এসে রিয়াজুলের বুকে লাগে। সন্ধ্যা ৭.৪০ মিনিটে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। মাত্র ৪০ মিনিটের মাথায় চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শহীদ সম্পর্কে তার পিতা ও ছোট ভাইয়ের প্রতিক্রিয়া

শহীদের পিতা গিয়াসউদ্দিন তালুকদার বলেন, "আমার ছেলে কোনদিন আমার সাথে বা কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করেনি। সব সময় সে পরিবারের সবার খেয়াল রাখত। চেষ্টা করত সকলের চাহিদা পূরণ করতে।" শহীদ সম্পর্কে তার ছোট ভাই বলেন, "আমার ভাইয়ের মতো ভাই হয় না। এলাকার সবাই তার প্রশংসা করতো। প্রয়োজন ছাড়া সে এক মুহূর্তও বাইরে থাকত না।

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান
২. শহীদের ছোট ভাইয়ের উন্নত চাকরির ব্যবস্থা করা

এক নজরে রিয়াজুল তালুকদার

পিতা	: মো. গিয়াসউদ্দিন তালুকদার
মাতা	: মোসা. সেহেরজান বিবি
পেশা	: চাকুরি
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ৬ নভেম্বর ১৯৮৭
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ৪ আগস্ট ২০২৪
শাহাদাৎ বরণের স্থান	: রাজপথ
দাফনের স্থান	: নিজ গ্রাম
স্থায়ী ঠিকানা	: বিল আবুড়া, নড়িয়া, শরীয়তপুর
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: বিত্তহীন পরিবার
ভাইবোন ও সন্তানের বিবরণ	: চার ভাইবোন

শহীদ মো: জুনায়েত হোসেন

ক্রমিক : ২২৫

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৯২

পরিচিতি

২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের একজন শহীদ মো: জুনায়েত হোসেন। তিনি শরীয়তপুরের নড়িয়া থানার বিল দেউনিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পেশায় শহীদ মো: জুনায়েদ হোসেন ছিলেন একজন লেদ শ্রমিক।

ব্যক্তিগত জীবন ও পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদের পিতা শাহ আলম ফরাজি একজন কৃষক এবং তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ। জুনায়েত হোসেনের মাতা ডলি আক্তার গৃহিনী। অসুস্থতার কারণে শাহ আলম ফরাজি কৃষিকাজও ঠিক মতো করতে পারেন না। মূলত পরিবারের ব্যয় মেটানোতে অসমর্থ হওয়ায় জুনায়েত হোসেনকে কাজের উদ্দেশ্যে ঢাকায় পাঠায় তার পরিবার। জুনায়েদ কাজ নেন লেদ শ্রমিক হিসেবে। এই অল্প বয়সে সংসারের বোঝা কাঁধে তুলে নিতে হয় তাকে। তার মৃত্যুতে পরিবারটি আর্থিকভাবে খুবই অসহায় হয়ে পড়েছে।

যেভাবে শহীদ হন মো: জুনায়েত হোসেন

দুপুরের খাবার শেষ করে ১৯ জুলাই বিকেল সাড়ে ৫টায় রাস্তায় বের হয় জুনায়েদ হোসেন। উদ্দেশ্য ছিল কর্মক্ষেত্রে যেয়ে কাজে যুক্ত হওয়া। সেদিন রাজপথে ছিল বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছাত্রদের অবস্থান। ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ অবস্থানে স্বৈরাচারী সরকারের পুলিশ ও আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী হামলা চালায়। অনবরত টিয়ারশেল, ছররা গুলি, হ্যান্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে রাজপথ থেকে ছাত্রদের সরাতে চেষ্টা করে সরকারী বাহিনী। এমনই এক উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে রাস্তায় গুলিবিদ্ধ হন জুনায়েত হোসেন। শুরুতে তাকে উদ্ধারে এগিয়ে আসতে ব্যার্থ হয় সবাই। কিছু সময় পরে সাহসী কিছু ছাত্রের সহযোগিতায় তাকে নেয়া হয় শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল হাসপাতালে। তারপর জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে। হাসপাতাল গুলোয় পুলিশ ও বিজিবি বাহিনীর অনুসন্ধানের ফলে এবং তাদের নিষেধাজ্ঞার কারনে ডাক্তারেরা জুনায়েতের মত আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। কিছু কিছু ছাত্র ফাইলে ভিন্ন রোগের কথা লিখে গোপণে চিকিৎসা নেয়ার চেষ্টা করে। উক্ত হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় পরদিন (২০ জুলাই) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শহীদ সম্পর্কে তার বড় চাচার প্রতিক্রিয়া

বড় চাচা শহীদ সম্পর্কে বলেন: জুনায়েত আমার সাথে সব সময় সম্মান দিয়ে কথা বলতো। দেখা হলেই সালাম দিতো। কোন খারাপ ছেলেদের সাথে মিশতো না; বরং পরিবারের কথাই চিন্তা করতো। কিন্তু পরিবারের অসচ্ছলতার কারণে পড়ালেখা করতে পারেনি।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Rajnagar Union Parishad
Naria, Shariatpur
(Rule 9, 10)

জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate

Date of Registration 12/12/2007 | Birth Registration Number 20018616594112102 | Date of Issuance 31/07/2024

Date of Birth: 18/12/2001 | Sex: Male
In Word: Eighteenth of December Two Thousand One

নাম: মোঃ জুনায়েত হোসেন | Name:
মাতা: মোসাঃ ডলি আক্তার | Mother:
মাতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী | Nationality: Bangladeshi
পিতা: মোঃ শাহআলম ফরাজী | Father:
পিতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী | Nationality: Bangladeshi
জন্মস্থান | Place of Birth:
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: বিলদেউনিয়া, পোষ্ট রাজনগর, রাজনগর, উপজেলা: নড়িয়া, জেলা: শরীয়তপুর। | Permanent Address

31-07-24
Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
Asibur Rahman Sumon
Administrative Officer
Rajnagar Union Parishad
Naria, Shariatpur

31-7-24
Seal & Signature
Registrar
ABU ALEM MADBAR
CHAIRMAN
RAJNAGAR UNION PARISHAD
NARIA, SHARIATPUR

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code.

এক নজরে শহীদ জুনায়েত

পিতা	: শাহ আলম ফরাজি
মাতা	: ডলি আক্তার
জন্ম তারিখ	: ১৮ ডিসেম্বর ২০০১
পেশা	: শ্রমিক
আহত হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ২০ জুলাই ২০২৪
শাহাদাৎ বরণের স্থান	: ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: বিল দেউনিয়া, নড়িয়া, শরীয়তপুর
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: নিঃস্ব

শহীদ মামুন মিয়া

ক্রমিক : ২২৬

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৯৩

শহীদ পরিচিতি

সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস এবং অসীম সাহস নিয়ে প্রথমে যে কয়েকজন শিক্ষার্থী ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিল শহীদ মামুন মিয়া তার মধ্যে একজন। অকুতোভয় এ বীর সন্তান জন্মগ্রহণ করেন শরীয়তপুরের পালং মডেল থানার চরচিকন্দি গ্রামে। ১৯ জুলাই রাত ২টায় তিনি রামপুরার ওয়াপদা রোড এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন এবং ঐদিনই ঢাকা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সাইন্স হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় শাহাদাতবরণ করেন।

(১ অক্টোবর ১৯৯৮-১৯ জুলাই ২০২৪)

ব্যক্তিগত জীবন

কৃষক পিতা আবদুল গণি মাদবর (৬০) এবং গৃহিনী মাতা মোসা. হেনা বেগমের সন্তান তিনি। সরকারি তিতুমীর কলেজের এমএ (রাষ্টবিজ্ঞান) বিভাগের ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন শহীদ মামুন মিয়া। অনেক স্বপ্ন নিয়ে এতোদূর এগিয়ে ছিলেন, বিদেশ যাবেন এবং সংসারের হাল ধরবেন। সেই স্বপ্ন এতো দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাবে তা কেউ পাবেনি।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ মামুন মিয়া কৃষক পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা আবদুল গণি মাদবর একজন কৃষক। সংসার চালিয়ে তার পক্ষে শহীদ মামুন মিয়ার পড়াশোনার খরচ চালানো কঠিন হয়ে উঠেছিল। সংসারের ওপর চাপ কমাতে মামুন টিউশনি করত এবং বিদেশ যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

যেভাবে শহীদ হন মামুন মিয়া

শহীদ মামুন মিয়া সরকারি তিতুমীর কলেজের ছাত্র। তিনি থাকতেন রামপুরার কাঁচাবাজার এলাকায়। 'আমাজান ডট কম' এর কাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। সকালে তিনি ব্রাক ইউনিভার্সিটি এলাকা আন্দোলনে গিয়েছিলেন এবং রাতে তার রুম থেকে বের হয়েছিলেন। এ সময় রামপুরা এলাকায় ব্যাপক তাণ্ডব চালায় পুলিশ এবং সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ-যুবলীগ। রামপুরার ওয়াপদা রোডে রাত ২টায় তিনি গুলিবিদ্ধ হন। সহযোদ্ধারা তাকে প্রথমে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। তারপর মুগদা মেডিকেল হাসপাতাল থেকে রেফার করা হয় ঢাকা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সাইন্সে। সেখানে তার অপারেশন হয়। কিন্তু অপারেশন সফল হয় না। ১৯ জুলাই ২০২৪ মধ্যরাত ২.৪০ মিনিটে শাহাদাত বরণ করেন মামুন।

শহীদ সম্পর্কে তার বন্ধুর প্রতিক্রিয়া

আতিকুর রহমান শহীদ মামুন মিয়ার সহকর্মী এবং রুমমেট। তিনি বলেন, "তখন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম হঠাৎ মামুনের ফোন থেকে একটা ফোন আসে কিন্তু অন্য একজনের কণ্ঠস্বর। আমাকে জানানো হলো মামুন গুলিবিদ্ধ। আমি যেন যতদ্রুত সম্ভব মুগদা হাসপাতালে যাই। তখনো চারদিকে গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আমি বের হলাম। নিজের শরীর থেকে তাকে রক্ত দিলাম কিন্তু আফসোস তাকে বাঁচাতে পারলাম না। নিউরো সাইন্সে সে মারা গেল। তার যে বিষয়টি আমাকে মুগ্ধ করত, তা হচ্ছে সে কখনো নামাজ বাদ দিত না এবং বিশ্বাসী ছিল। আমেরিকায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ভিসাও পেয়েছিল। কিন্তু তার আর যাওয়া হলো না!"

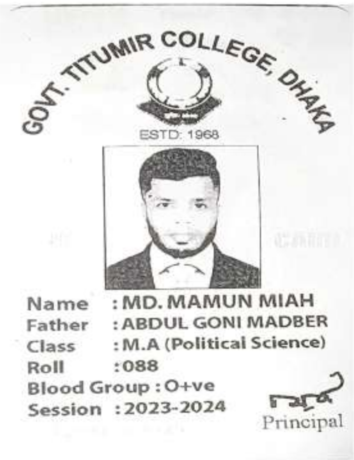

এক নজরে শহীদ মামুন মিয়া

পিতা	: আবদুল গণি মাদবর
মাতা	: মোসা. হেনা বেগম
পেশা	: শিক্ষার্থী
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১ অক্টোবর ১৯৯৮
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪
শাহাদাৎ বরণের স্থান	: ঢাকা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সাইন্স হাসপাতাল
দাফনের স্থান	: চরচিকন্দি গ্রাম, শরীয়তপুর
স্থায়ী ঠিকানা	: চরচিকন্দি গ্রাম, পালং মডেল থানা, শরীয়তপুর
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: নিম্নবিত্ত পরিবার

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান
২. শহীদের বাবাকে সমবায় কৃষি খামার করে দেয়া

শহীদ মো: মনোয়ার হোসেন

ক্রমিক : ২২৭

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৯৪

পরিচিতি

শহীদ মো: মনোয়ার হোসেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেন শরীয়তপুর জেলার ফাতেহ জাঙ্গাপুর ইউনিয়নের নড়িয়া গ্রামে। সেখানেই তিনি পরিবার পরিজন নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। তার বাবার নাম আশু চৌকিদার ও মা খতেজা বিবি। খুব সাধারণ পরিবারে অর্থকষ্টের মধ্য দিয়েই তিনি বড় হয়ে ওঠেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি বিভিন্ন ছোটবড় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। তিনি আন্দোলনের উত্তপ্ত ময়দানে যাত্রাবাড়িতে পুলিশের গুলিতে ৫ আগস্ট গুরুতরভাবে আহত হন। তাকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করানো হয়। ৬ আগস্ট পৃথিবীর সমস্ত মায়া ত্যাগ করে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল পঞ্চাশ বছর।

দিনকাল

শহীদ মো: মনোয়ার হোসেন সাধারণ জীবনযাপনে ছিলেন অভ্যস্ত। স্ত্রী ও তিন সন্তান নিয়ে তিনি নিজ জন্মভূমি শরীয়তপুর শহরে একটি টিনশেড বাড়িতে দুই রুমের একটি ঘর ভাড়া করে থাকতেন। তিনি শরীয়তপুর সুপার ডিলাক্স পরিবহনের ড্রাইভার ছিলেন। তার মাসিক আয় ছিল পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকার মতো। তবুও তিনি স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে সুখেই দিন কাটাচ্ছিলেন। একার উপার্জনে চলা সংসারটি তার বিদায়ের মধ্য দিয়ে গভীর সংকটে পড়েছে। ছোট ছোট সন্তানদের নিয়ে কিভাবে সামনের দিন কাটবে জানেন না তার স্ত্রী। তার স্বপ্ন ছিলো সন্তানদের পড়াশুনা করাবেন। নিজের একটা মাথা গোজার ঠাঁই হবে। স্ত্রী সন্তানদের মুখে হাসি দেখবেন। কিন্তু সকলের মুখে হাসি ফোটাতে গিয়ে নিজের জীবনই বিলিয়ে দিলেন। ছোট ছোট সন্তানদের এতিমের তালিকায় নাম লিখিয়ে চলে গেলেন পরপারে। মহান রবের সান্নিধ্যে। রেখে গেলেন হাজারো স্মৃতি। এতিম সন্তানেরা আর কাউকে ডাকতে পারবে না বাবা বলে। উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে পরিবারটি বহুকষ্টে দিনযাপন করছে।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালের জুলাই মাসেই শুরু হয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মেধা মূল্যায়নের দাবিতে শুরু এই আন্দোলনের। তারা চায় বৈষম্যপূর্ণ কোটার অবসান হোক। মেধার ভিত্তিতে চাকরি দেয়া হোক। শত হাজার পেরিয়ে গেছে বেকারত্বের সংখ্যা। নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তের একটাই ভরসার জায়গা তা হলো চাকরি। কুলি মজুরি করে খেয়ে না খেয়ে যারা পড়াশুনা করে একটা স্বপ্ন বুকে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায় তা হলো একটা চাকরির প্রত্যাশা। কিন্তু বিভিন্ন কোটার কারণে তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ওই পর্যন্ত পৌছাতেই পারে না। তাই তাদের একটাই দাবী বৈষম্য দূর করা। কিন্তু স্বৈরাচার সরকার তাদের এ দাবীর প্রতি সহানুভূতি না দেখিয়ে বরং অহমিকা প্রকাশ করেছে। বাধ্য হয়েই এই আন্দোলনের রূপরেখা পরিবর্তন হয়ে যায়। এক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলের শিক্ষার্থীরাও অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে। নতুনভাবে দেশ স্বাধীন করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে আসে।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে ত্যাগের নজির দেখে মো: মনোয়ার হোসেন নিজেও শামিল হন আন্দোলনে। এ আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলেন তার সন্তানও। তিনিও বাবা হয়ে তাদের পাশে থেকেছেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন অমায়িক চরিত্রের অধিকারী। সবার সাথে খুব সহজেই মিশে যেতেন। খুব বেশি পড়াশুনা করেননি তিনি। কিন্তু পড়াশুনার গুরুত্ব বুঝতেন। বিগত বছরগুলোতে কেমন করে দেশ চলছে তিনি জানতেন। ড্রাইভার ছিলেন বলে আরো বুঝতেন এ দেশের আইনের লোকগুলো কতোটা অনিয়ম করে চলেছে। যৌক্তিক ন্যায্য দাবীর কোন মূল্যায়নই নেই। নিজেদের যৌক্তিক দাবী আদায়ে কত সংগ্রাম আর ত্যাগের প্রয়োজন ছোট ছোট বাচ্চাদের সাথে শহীদ মনোয়ারও জানতেন।

শহীদ হবার সময়

জীবিকার তাগিদে মো: মনোয়ার বাড়ি থেকে ঢাকা চলে আসেন। সময়টি ছিল বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের চরম মুহূর্ত। তিনিও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দিয়ে পুলিশের নৃশংস আচরণের মোকাবেলা করছিলেন। ৫ আগস্ট তিনি যাত্রাবাড়ী থানার সামনে আন্দোলনে থাকাকালীন সময়ে মুহুর্মুহু গুলি বর্ষন হতে থাকে। ওই সময় অবস্থার ভয়াবহতা দেখে তিনি বাড়িতে তার স্ত্রীকে ফোন করেন। ফোনে স্ত্রীকে তিনি তখনকার অবস্থার বিররণ দিয়ে দোয়া করতে বলেন। তিনি তার স্ত্রীকে বলেন, 'আমরা সবাই অনেক বিপদের মধ্যে আছি। আমাদের জন্য দোয়া করো। ছেলেমেয়েদের দেখে-শুনে রেখ। সব পাশ থেকে পুলিশ আমাদের ঘিরে রেখেছে। অনবরত গুলি চালাচ্ছে। দেশের মানুষের জন্য দোয়া করো।' এই বলে তিনি ফোন রেখে দেন। এ ঘটনার কিছুক্ষন পর মো: মনোয়ার হোসেনের পাশে থাকা একজন তার স্ত্রীকে ফোন করে বলে ভাইয়ের বুকে গুলি লেগেছে। আমরা তাকে নিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছি। এরপর তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আগস্টের ৩ তারিখ থেকেই তিনি আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলেন। চিকিৎসারত অবস্থায় ৬ আগস্ট ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি শহীদ হবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

শহীদ পরিবারের আর্থিক অবস্থা

শহীদ মো: মনোয়ার হোসেন তিন ছেলে রেখে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। বড় ছেলে ইমন চৌকিদার (২৪) শরীয়তপুর কলেজে এইচএসসি তে পড়াশোনা করতেন। বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করেও তার আর যাওয়া হয়নি। মেঝো ছেলে রাকিব ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। অর্থের অভাবে বর্তমানে তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। আর ছোট্ট ছেলে সামিরের বয়স মাত্র ৩ বছর। শৈশবে বাবার আদর তার ভাগ্যে জোটেনি। শহীদ মনোয়ার হোসেন বড় ছেলেকে নিজেই বিয়ে করিয়ে ঘরে পুত্রবধু এনেছিলেন। তাদের সংসারেও গত ২৮ সেপ্টেম্বর কন্যা সন্তানের আগমন ঘটে। দাদার অন্তরে সেই নাতনির মুখ দেখার স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে যায়। তাঁর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে একটি সুখী সংসারের ভরণপোষণ চলছে বর্তমানে আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতার মাধ্যমে। উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে স্বচ্ছল একটি পরিবার আর্থিক দৈন্যদশায় দিনাতিপাত করছেন।

শাহাদাতের ঘটনার পরপরই বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী থেকে তারা দুই লাখ টাকা অনুদান পেয়েছিলেন। যা তাদের আর্থিক দুরাবস্থায় আশার আলো জাগায়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীদের অনুভূতি

শহীদ মো: মনোয়ার হোসেনের আচার-ব্যবহারে আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা সবাই মুগ্ধ ছিলেন। তার প্রতিবেশী দোকানদারেরা বলেন, 'মনোয়ার ভাই একজন ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি সবসময় হাসিমুখে কথা বলতেন। তার লেনদেন খুবই ভালো ছিল। কাউকে কষ্ট দিয়ে কখনও কথা বলতেন না। আমরা সবাই তার ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিলাম।'

শহীদের জীবনসঙ্গীনী নিজের স্বামী সম্পর্কে অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, 'আমার স্বামী নিজের সুখ শান্তির কথা বাদ দিয়ে সবসময় আমাদের সুখের কথা ভাবতেন। সন্তানদের খুব ভালোবাসতেন। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেই তিনি এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষার্থীদের পাশে ছিলেন সবসময়। কারো সাথে তার কোনো ঝগড়া-বিবাদ ছিল না। তিনি খুবই মিশুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।'

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Fateh Jangapur Union Parishad
Naria, Shariatpur
(Rule 11, 12)

মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration 20/08/2024 | Death Registration Number 19748616544113018 | Date of Issuance 20/08/2024

Date of Birth : 12/07/1974
Date of Death : 05/08/2024
Sex : Male
In Word : Fifth of August Two Thousand Twenty Four

নাম	: মোঃ মনোয়ার হোসেন	Name	: Md Monowar Hossain
মাতা	: খতেজা বিবি	Mother	: Khoteja Bibi
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: আশু চকিদার	Father	: Ashu Chokider
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
মৃত্যুস্থান	: ঢাকা, বাংলাদেশ	Place of Death	: Dhaka, Bangladesh
মৃত্যুর কারণ	: হত্যা	Cause of Death	: Murder

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
Nazneen Sultana
UP Administrative Officer
Fatehjangapur Union Parishad
Naria, Shariatpur

Fatehjangapur Union Parishad, Bangladesh, Naria, Shariatpur

Seal & Signature
Registrar
Md. Showkat Hossain Jewel
Birth & Death Register Officer
Chairman
Fatehjangapur Union Parishad
Naria, Shariatpur

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Cod

এক নজরে শহীদ মোঃ মনোয়ার হোসেন

নাম	: মোঃ মনোয়ার হোসেন
পেশা	: বাস ড্রাইভার
পিতা	: আশু চৌকিদার
মাতা	: খতেজা বিবি
ছেলে-মেয়ে	: ৩ ছেলে। বড় ছেলে: ইমন চৌকিদার, বয়স: ২৪ বছর মেঝো ছেলে: রাকিব, বয়সয় ১৭ বছর, ছোট ছেলে: সামির, বয়স: ৩ বছর
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১২ জুলাই ১৯৭৪। বয়স: ৫০ বছর
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: শিলঙ্গল, ইউনিয়ন: ফাতেহ জাঙ্গাপুর, থানা: নড়িয়া, জেলা: শরীয়তপুর
আহত হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ০৬ আগস্ট ২০২৪, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল
আক্রমণকারী	: পুলিশ
শাহাদাত বরণের স্থান	: যাত্রাবাড়ী থানা, ঢাকা
দাফন করা হয়	: নিজ মাতৃভূমি গ্রামের বাড়ি শিলঙ্গলের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৬ জন

আর্থিক সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবনা

১. শহীদের বড় ছেলে ইমন চৌকিদারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হলে পরিবারটির আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসবে।
২. শহীদ পরিবারের স্বচ্ছলতার জন্য স্থায়ী একটি আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা।

শহীদ মো: দুলাল

ক্রমিক : ২২৮

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৯৫

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: দুলাল জন্মগ্রহণ করেন শরীয়তপুর জেলার রুপবাবুর হাট ইউনিয়নের জাজিরা থানার চরগুটিয়া গ্রামে। তিনি শৈশব থেকেই বাবার সাথে কৃষিকাজ করতেন। পড়াশোনার খরচ চালানোর জন্য কৃষিকাজের পাশপাশি ভ্যানগাড়িও চালাতেন। অত্যন্ত মেধাবী হওয়ায় শৈশব থেকেই তিনি অনেক বড় হবার স্বপ্ন দেখতেন। বাবা মায়ের কষ্ট দূর করার জন্য দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রাম থেকেই সমাপ্ত করেন। পরবর্তীতে মাধ্যমিক ও উচ্চতর ডিগ্রি লাভের প্রত্যাশায় ঢাকায় চলে আসেন। সেখানে তিনি টিউশনি করে নিজ লেখাপড়ার ব্যয়ভার বহন করে পরিবারকেও আর্থিক সহযোগিতা করতেন। অত্যন্ত গরিব পরিবারের একজন সন্তান হয়েও তিনি জীবনের বাস্তবতায় সংগ্রামী হয়ে স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে গিয়েছেন।

দিনকাল

শহীদ দুলাল পেশায় একজন ব্যাংক কর্মকর্তা হিসেবে জীবনযাপন করেন। তিনি স্টান্ডার্ড ব্যাংকের এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি স্ত্রী, দুই সন্তান ও বাবা মা মিলে আজিমপুরে সরকারি কলোনিতে একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন। তার স্ত্রীও একজন কর্মজীবী মহিলা। তিনি একটি বেসরকারী স্কুলে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত। শহীদ দুলালের পাঁচ ভাই গ্রামে বসবাস করেন। তন্মধ্যে চার ভাই কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন এবং অপর এক ভাই অটোরিক্সা চালক। বলা যায় সব ভাই-ই আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল। বোনদের মধ্যে সবাই বিবাহিত এবং তারাও আর্থিকভাবে অনগ্রসর। একমাত্র দুলালই ভালো অবস্থানে ছিলেন। দুলাল তার সাধ্যানুযায়ী ভাই-বোনসহ পরিবারের সবাইকে সহযোগিতা করতেন। তিনি শৈশব থেকেই সবাইকে নিয়ে ভাবতেন। অনেক কষ্টে বড় হওয়ায় নিজ সন্তানদের নিয়েও তিনি স্বপ্ন দেখতেন। তার খুব আকাঙ্ক্ষা ছিলো তার একটি বাড়ি হবে। সেই স্বপ্ন থেকেই এক টুকরো জমি কিনেছিলেন নিজ জেলার গ্রামের বাড়িতে। কিন্তু একটি বুলেট সব স্বপ্নকে ধূলিস্যাৎ করে দিয়ে চলে যায়। স্বপ্নের বাড়িটি নির্মাণের আগেই তিনি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন।

শহীদ সম্পর্কে আপনজনদের মতামত

শৈশব থেকেই ছিলো মাটির সাথে সম্পর্ক। ছিলো আপনজনদের আত্মার আত্মীয় হয়ে। বিপদে আপদে সর্বদা সবার আগে থাকতো দুলাল। স্বপ্নের শিখরে পৌছে ভুলে যায়নি গ্রামের অশিক্ষিত খেটে খাওয়া ভাইদের। বাবা-মাকে হৃদয়ের গভীরে সম্মান দিয়ে ভালোবেসে নিজের কাছেই রাখত দুলাল। তার সম্পর্কে প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠী, নিকটাত্মীয়, তার শিক্ষক সকলে এক বাক্যেই বলেন, দুলাল ছিল অত্যন্ত দায়িত্ববান একজন ব্যক্তি। তার ছোট ভাই তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন,'ভাই ছিলেন অনেক দায়িত্ববান একজন। সবসময় আমাদের খোঁজখবর রাখতেন। তিনি সকলের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। এমনকি তিনি গ্রামের মুরব্বীদের বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করতেন। ভাই আমার ছোট-বড় সবার সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। শুধু নিজেদের নয় তিনি যে কারও বিপদে এগিয়ে যেতেন। আমাদের ভাই-বোনদের যে কোন জরুরি প্রয়োজনে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করতেন। আমার আব্বা-আম্মাও ছিলেন ভাইয়ের প্রতি সন্তুষ্ট।' এ থেকে সহজেই অনুমেয় শহীদ দুলাল কেমন ব্যক্তি ছিলেন। নতুন স্বাধীনতার যে স্বাদ আমরা আজ উপভোগ করছি এটা তাদেরই ত্যাগের ফসল। আগামীর বাংলাদেশ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করুক এই বীর যোদ্ধাদের। এটাই প্রত্যাশা।

আন্দোলনের প্রেক্ষিত

ঈদুল আজহা শেষ করে সব মানুষ তার কর্মস্থলের দিকে ধাবিত। তখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি ঈদুল আজহার আনন্দের রেশ। একযোগে পয়ত্রিশটি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। শিক্ষকেরা কর্মবিরতিতে। সরকারের এই বিষয়ে ছিলোনা কোন মাথা ব্যাথা। সামনেই ছিল ছাত্রদের সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা। শিক্ষকদের কর্মবিরতির এই সময়ে ছাত্ররা তাদের অধিকারের বিষয়ে সচেতন হয়। তারা চায় মেধার মূল্যায়ন। কোটা নয় মেধা। এটাই তাদের চাওয়া। এই চাওয়াকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের সূচনা। স্বৈরশাসক তরুণদের এই চাওয়াকে মূল্যায়ন করেননি। বরং কটাক্ষ করেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতির সাথে। শুরু হলো আন্দোলন। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত ঢাবি ক্যাম্পাস। শিক্ষার্থীদের মুখে মুখে; চেয়েছিলাম অধিকার/ হয়ে গেলাম রাজাকার; আমি কে? তুমি কে?/ রাজাকার, রাজাকার। কে বলেছে? কে বলেছে? স্বৈরাচার! স্বৈরাচার!! গত পনেরো বছরের দুঃশাসনে 'রাজাকার' শব্দটি ছিল ফ্যাসিবাদ ও এর সহযোগীদের প্রধান অস্ত্র। ঢাবির শিক্ষার্থীদের পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রের চক্ষুশূল হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে এতোদিনের ফ্যাসিবাদের অস্ত্রকে অকেজো করে ফেলে। মুহূর্তে ভেঙে পড়ে ফ্যাসিবাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। কতোটা কষ্ট, রাগ ও হতাশা থেকে এসেছিলো এই শব্দ। জুলাই গণ-অভুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ইতিহাস সৃষ্টি করে।

যেভাবে শহীদ হলেন

১৯ জুলাই ২০২৪ সারাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দাবী আদায়ে ছাত্ররা যখন রাজপথে কর্মসূচী পালনে ব্যস্ত তখন আইনের পোশাক পরিহিত পুলিশ বাহিনি তাদের উপর মারাত্মকভাবে চড়াও হয়। মানুষকে ন্যায় দেয়ার কাজে নিয়োজিত সৈনিক নির্বিচারে এলোপাথাড়ি গুলি বর্ষণ করতে থাকে। এ সময় অসংখ্য ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয় এবং অনেকেই মারাত্মকভাবে জখম হয়। দুলাল আন্দোলনের শুরু থেকেই ছাত্রদের পাশে ছিলেন। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে সংগ্রামী দুলাল জানতেন তার মতো শতশত তরুণেরা আজ এতোগুলো বছর ধরে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। হয় কোটা নয় টাকা। এ দুটো যাদের নেই তাদের মনে হয় বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও নেই। কি নির্মম পরিহাস! এখানেই প্রশ্ন আসে এমন দিন দেখার জন্যই কি ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হয়েছিল! দুলাল অন্যান্য দিনের মতো ১৯ তারিখে আনুমানিক বিকেল ৫টায় ব্যাংক থেকে বের হয়ে বাসায় যাবার পথ ধরেন। তিনি আজিমপুর কলোনীতে এসে পৌছার পথে চারিদেকে কেবলই গুলির শব্দ। দ্রুত পথচলা দুলালের বুকের বাম পাশে একটি গুলি এসে বিদ্ধ হয়ে পেছন হয়ে বেরিয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। চারিদিকে তখনো গোলাগুলি চলছে। বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীরা দৌড়াদৌড়িতে ব্যস্ত। মাটিতে অনাদরে পড়ে থাকা দুলালের শরীর থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে থাকে। আশে-পাশের ছাত্ররা তার এ অবস্থা দেখে তাকে আরো জনতার সাহায্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তাকে দেখে কর্তব্যরত ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেন। তিনি শহীদ হবার গৌরব অর্জন করেন।

শহীদ পরিবার

শহীদ মো: দুলালের চলে যাওয়ায় তার পরিবারের সদস্যগণ আর্থিক সমস্যায় পড়েছেন। তিনি পরিবারের মধ্যে একমাত্র স্বাবলম্বী ব্যক্তি ছিলেন। তার রেখে যাওয়া দুই সন্তানের মধ্যে ছেলের বয়স ৭ বছর আর মেয়ের বয়স ৩ বছর। তাঁর স্ত্রী কর্মজীবী নারী। আয়ের সিংহভাগ খরচ হয়ে যায় বাড়ি ভাড়ায়। তবুও তার বৃদ্ধ বাবা-মাসহ

তার সন্তানদের ভবিষৎ হুমকির সম্মুখীন। তার গরিব ভাই-বোন একমাত্র তাকে অবলম্বন করেই চলছিলেন। কিন্তু তাকে হারিয়ে আজ তারা দিশেহারা। পুলিশের একটি গুলি কেড়ে নিল সন্তানের কাছ থেকে তার পিতা, একজন স্ত্রীর কাছ থেকে তার স্বামী, অসহায় বৃদ্ধ বাবা-মায়ের শেষ বয়সের সম্বল। শহীদ পরিবারের একটাই চাওয়া যে জন্য তার ভাইকে এভাবে খুন করা হলো তাদের খুঁজে এনে আইনের মাধ্যমে বিচার নিশ্চিত করা। যারা তাদের দিয়ে এসব করিয়েছে তাদেরও যেনো বাংলাদেশের মাটিতেই শাস্তি হয়। এ দেশের জনগণ যেন এসব দেখে বুঝে নেয় অন্যায় করার শাস্তি কতোটা ভয়াবহ।

এক নজরে শহীদ মোঃ দুলাল

নাম	: মোঃ দুলাল
পেশা	: ব্যাংক কর্মকর্তা (এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, স্টান্ডার্ড ব্যাংক)
পিতা	: ছিদ্দিক খালাশী
মাতা	: জোলেখা বেগম
ছেলের বয়স	: ৭ বছর
মেয়ের বয়স	: ৩ বছর
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১৮ জুলাই ১৯৮৪
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: চরখাগুটিয়া, ইউনিয়ন: রুপবাবুর হাট, থানা: জাজিরা, জেলা: শরীয়তপুর
আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান	: ১৯ জুলাই ২০২৪, বিকেল ৪:০০টা, আজিমপুর কলোনী, ঢাকা-এর সামনে রাস্তায়
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪ বিকেল ৫:০০টা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
শাহাদাত বরণের স্থান	: ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল
দাফন করা হয়	: গ্রামের বাড়ি চরখাগুটিয়ায় পারিবারিক গোরস্থানে
ভাইবোনের বিবরণ	: ৫ ভাই
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৭ জন

শহীদের জন্য আর্থিক সহযোগিতার প্রস্তাবনা

১. ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার দায়িত্বভার গ্রহণ করা একান্ত জরুরি

২. স্থায়ীভাবে ভাতার ব্যবস্থা করলে পরিবারটি স্বচ্ছলভাবে জীবনযাপন করতে পারবেন

“যে মৃত্যু তুচ্ছ নয়,ধরণীর বুকে চির অমর করে নেয়”

শহীদ আশরাফুল হাওলাদার

ক্রমিক : ২২৯

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০৯৬

জন্ম পরিচয়

মাদারীপুর জেলার ছিলারচর ইউনিয়নের চরলক্ষীপুর গ্রামের একজন মেধাবী শিক্ষার্থী উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম আশরাফুল হাওলাদার। যার জন্ম হয়েছিল ২০০৪ সালের ১ জানুয়ারি।

দরিদ্র পরিবারে তিন সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ আশরাফুল হাওলাদার। বন্ধুদের মত আশরাফুলেরও স্বপ্ন ছিল পড়ালেখা শেষ করে বড় কিছু হয়ে পরিবারকে সহযোগিতা করার।

সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রুপ দেওয়ার আগেই পরিবারের আর্থিক টানাপোড়নের কারণে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়ার সুযোগ হয়েছে আশরাফুলের।

অভাবের সংসারে যেখানে খাদ্যের চাহিদা মেটানো দুষ্কর সেখানে পড়াশোনা করে বড় কিছু হতে চাওয়া তো নিছক কল্পনারই নামান্তর।

তাইতো আশরাফুলকে যোগ দিতে হলো গ্যারেজের কাজে। আশরাফুল বাড্ডা থানার আফতাফনগরে গাড়ির গ্যারেজে ইঞ্জিনের কাজ করতো।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

বাবা, মা, বড় ভাই, ভাবি ও ভাইয়ের ছেলেসহ ৭ জনের গোছানো একটি দরিদ্র্য পরিবার। যেখানে পরিবারের মূল উপার্জনের ভারই ছিলো আশরাফুলের উপর। আশফুলের বাবা ভাড়াকৃত সিএনজি চালক এবং বড়ভাই ভাড়াকৃত ভ্যানচালক। বাবা ও ভাইয়ের আয়ে পরিবারের ভরণপোষণ চালানো কষ্টসাধ্য হয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি তাদের কোন জমি নেই ফসল উৎপাদনের মতো। ৫ শতাংশ জমির উপর টিনের চালাবিশিষ্ট দুই রুমের ছোট্ট একটি বাড়ি আছে।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

শহীদ আশরাফুলের প্রতিদিনের অভ্যাস ছিল গ্যারেজে কাজ করে দুপুরে বোনের বাসায় এসে খাবার খাওয়া।ঘটনার দিন ৫ আগস্ট মুঠোফোনে বোনকে খাবার খেতে আসার কথা বলেও আর আসা হয়নি। গ্যারেজ থেকেই সরাসরি বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যোগদান করে।আনন্দ মিছিল উদযাপন করার সময়ে ফ্যাসিস্ট স্বৈরশাসক হাসিনার মদদকৃত দুষ্কৃতিকারী মনুষ্য বৈশিষ্ট্য বিহীন পুলিশ কর্মকর্তাদের দ্বারা বিকাল ৫ টা ৩০ মিনিটে গুলিবিদ্ধ হয়।পুলিশ নামধারী অমানুষগুলো আশরাফুলকে গুলি করে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি তারা আশরাফুলের লাশ গুম করার জন্য সর্বাত্মক অপচেষ্টা চালায় এবং লাশ গায়েব করার উদ্দেশ্যে শহীদ আশরাফুলের মৃতদেহ হাতিরঝিলে নিয়ে যায়।সেখানে আশরাফুলের পরিচিত একজন লাশ দেখে চিনতে পেরে আন্দোলনের সহযোগীদের কে ফোন দেয়। পরিস্থিতি প্রতিকূলে দেখে ফ্যাসিস্ট সরকারের পালিত পুলিশ নামধারী অমানুষ গুলো আশরাফুলের লাশ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। রাতে পরিবার খবর পেয়ে হাসপাতালের মর্গ থেকে আশরাফুলের লাশ শনাক্ত করে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যান এবং সেখানেই শহীদ আশরাফুলকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

শহীদের নিকট আত্মীয়ের স্মৃতিচারণ

মায়ের আদরের ধনকে এভাবে হারিয়ে নির্বাক প্রায় মা। যেন তিনি বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। অনেকদিন হয়ে গেল বুকের মানিক হারিয়েছেন তবুও মা প্রতিদিন কাঁদেন এই বলে যে, "আমার বাজান ভাত খেতে আর আসতে পারলো না, ওরা আমার বাজানকে দুপুরের খাবারও খেতে দিল না।" মা প্রতিদিন কবরের কাছে যান আর বুকের মানিকের জন্য এভাবে আর্তনাদ করতে থাকেন। মায়ের কাছ থেকে জানতে পারি আশরাফুল পাখি পালন করা পছন্দ করত। দুই রুমের ছোট্ট একটা ঘরে চারিদিকে যেন আশরাফুলের রেখে যাওয়া স্মৃতি পড়ে আছে।আর আশরাফুলের রেখে যাওয়া সেই পোশা পাখি, এগুলো দেখে প্রতিনিয়ত মা অশ্রুষিক্ত হন।

বাবার কাঁধে সন্তানের লাশ যে কত ভারী তা বাবা ছাড়া আর কেউই জানে না। বাবা বলেন আশরাফুল খুব মেধাবী ও পরিশ্রমী ছেলে ছিলো।কখনো অন্যায় সহ্য করতে পারতো না। "স্বপ্ন ছিল একদিন আশরাফুল সম্পূর্ণরূপে পরিবারের হাল ধরবে সেদিন আর আমাকে সিএনজি চালাতে হবে না। "আমি আমি সেই সিএনজি চালক রয়ে গেলাম কিন্তু আমার মানিক আর নেই।"

বোন কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলেন, "আশরাফুল আমার একমাত্র আদরের ছোট ভাই। পিঠেপিঠি ভাইবোন আমরা। শৈশব কৈশোর সব একত্রেই কেটেছে। আমাকে আপু আপু করে পাগল করার ভাইটি আর রইল না। কাজ শেষে বাসায় ফিরে সারাদিনের গল্পগুলো বলার আর কেউ নেই। আশরাফুলের মুখেই প্রথম আপু ডাক শুনেছিলাম। "

বড়ভাই বলেন, "বড় ভাইয়ের জায়গাটা তো হয় বাবার মত। আমার একমাত্র আদরের ভাইটিকে ফ্যাসিস্ট সরকার শেষ করে দিল। ওর মুখেই প্রথম ভাইয়া ডাক শুনেছিলাম, আমাকে এখন আর কেউ ভাইয়া বলে ডাকবে না। ভালোমন্দ সবকিছুই শেয়ার করতো আশরাফুল। সবসময় পরামর্শ করতো কিভাবে পরিবারের অভাব দূর করা যায়, ঘরকে গুছানো যায়।"

শহীদ সম্পর্কে আপন চাচা জানান, "আশরাফুল খুব চমৎকার একটা ছেলে ছিলো। বিনয় ও নম্রতা ছিল চোখে পড়ার মতো। ও শুধু আমাদের পরিবারের নয় পুরো এলাকার চোখের মনি ছিল। "

আশরাফুলের ফুপু জানান, "সম্মান ও ভালবাসার জায়গাটা অসাধারণ ছিল। ওর আদর মাখা ফুপু ফুপু ডাক আজও কানে বাজে। ওরা আমার বাজানকে কতো নির্মম ভালো শেষ করে দিলো। "

বন্ধুদের স্মৃতিচারণ, আশরাফুল ছিল খুবই মিশুক প্রকৃতির ছেলে। কখনো কোন বাজে নেশা করতে দেখিনি। সবসময় হাসিমুখে কথা বলতো। পরিবার নিয়ে সব সময় চিন্তা করত। খুব পরিশ্রমী একটা ছেলে ছিলো। নিজের সব কাজ নিজে করতে ভালোবাসতো। আমাদেরকে সবসময় ভালো পরামর্শ দিতো। নামাজী ছেলে ছিলো।

সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১। বাসস্থান প্রয়োজন

২। বাবা/ভাইয়ের জন্য কোনো ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের সুযোগ করে দিলে ভালো হবে।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

পুরো নাম	: আশরাফুল হাওলাদার
জন্ম	: ০১/০১/২০০৪
পেশা	: গ্যারেজে গাড়ির ইঞ্জিনের কাজ শিখতো
স্থায়ী ঠিকানা ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: চরলক্ষ্মীপুর, ইউনিয়ন: ছিলারচর, থানা: মাদারীপুর সদর, জেলা: মাদারীপুর
পিতার নাম	: মো: আনোয়ার হোসেন
বয়স	: ৫০ পেশা: সিএনজি চালক
মাতার নাম	: আসমা বেগম
বয়স	: ৪০, পেশা: গৃহিণী
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৭
ভাই বোনের সংখ্যা	: ২
	: ১। ভাই: রফিকুল ইসলাম (২৪), পেশা: ভ্যানচালক
	: ২। বোন: হাফিজা আক্তার (২৩), পেশা: গৃহিনী
ঘটনা স্থান	: বাড্ডা থানার সামনে
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়	: তারিখ: ০৫/০৮/২০২৪, সময়: বিকাল ৫.৩০
মৃত্যুর সময় ও তারিখ	: ০৫/০৮/২০২৪, বিকাল ৫.৩০
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: নিজ গ্রামের বাড়ি

“একবিংশ শতাব্দীর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র তাহমিদ”

শহীদ তাহমিদ ভূঁইয়া

ক্রমিক: ২৩০

আইডি: ঢাকা বিভাগ ০৯৭

শহীদের জন্ম পরিচয়

নরসিংদী জেলার সদর থানার চিনিশপুরে ২০০৯ সালের ৮ মে পিতা-মাতার কোল আলোকিত করে জন্ম নেয় এক শিশু। কে জানত এই শিশুটি যৌবনে পদার্পণের পূর্বেই উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে যাবে!

পরিবার থেকে শিশুটির নাম দেওয়া হয়েছিলো তাহামিদ ভূঁইয়া।অসাধারণ প্রতিভা ও তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী তাহমিদ ভূঁইয়া। পরিবারের তিন সন্তানের মধ্যে তাহমিদই বড় ছেলে ও একমাত্র ছেলেসন্তান।ত াহমিদের জন্মের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো মা হয়েছিলেন মোসাঃ তাইয়্যেবা বেগম এবং বাবা হয়েছিলেন মোঃ রফিকুল ইসলাম।সেদিন তাহমিদের জন্মের মাধ্যমে রফিকুল ও তাইয়্যেবা দম্পতি নিজেদের পরিচয় পেয়েছিলেন বাবা মা হিসেবে।

পরিবার, আত্মীয়, প্রতিবেশী ও বন্ধুদের কাছে তাহমিদ পরিচিতো ছিল একজন ঈমানদার, সৎ, সত্যবাদী, বিনয়ী, পরিশ্রমী ও মেধাবী বালক হিসেবে। ছোটবেলা থেকেই তাহমিদ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তো।

এন. কে. এম. স্কুল এন্ড হোমস এর নবম শ্রেণীর একজন মেধাবী শিক্ষার্থী ছিলো শহীদ তাহমিদ। ইংরেজী কবিতা লেখা তাহমিদের শখ ছিলো। পাশাপাশি ক্রিকেট খেলতে তাহমিদ খুব ভালবাসতো। স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে একজন ভালো ক্রিকেটার হবে।ক্রিকেট খেলার সকল সরঞ্জামই তাহমিদের ছিলো। ক্রিকেট খেলার জার্সি, মাথার হ্যাট, ব্যাট, বল সবকিছুই পড়ে আছে ঘরে। শুধু তাহমিদ নেই। খেলার এই সরঞ্জাম গুলোও যেন তাহমিদকে খুঁজছে বার বার। বাবা মায়ের কি জানা ছিলো বাবা মায়ের স্বপ্নপূরণকারী সেই ছোট্ট তাহমিদ পিতা-মাতা কে রেখে একাই চলে যাবে অনন্তকালের পথে। একমাত্র পুত্র সন্তান তাহমিদকে বড় করতে করতে পিতা-মাতা হয়তো এই স্বপ্ন বুনছিলেন যে একদিন ছেলে বড় হয়ে অনেক ভালো কিছু করবে, পরিবারের ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। যেদিন হয়তো তাহমিদের পিতাকে আর গ্রামে গ্রামে ঘুরে পল্লী চিকিৎসা করতে হবে না হয়তো ঘুচে যাবে মায়ের দুঃখ গুলো।

এভাবেই হাজারো মায়ের বুক খালি করে দিয়েছে এই স্বৈরাচার ফ্যাসিস্ট সরকার। এমন কোন ঘৃণ্য কাজ নেই যা এই স্বৈরাচার সরকার করেনি।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

বাবা, মা ও ছোটো দুটি বোন সহ চারজনের গোছানো একটি পরিবার। এই নিম্নমধ্যবৃত্ত পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তাহমিদের বাবা মো: রফিকুল ইসলাম। পেশায় তিনি একজন পল্লী চিকিৎসক। তাহমিদই ছিল পরিবারের একমাত্র ছেলে সন্তান। তাহমিদের ছোট দুটি বোন আছে ১৩ বছর বয়সী ও দেড় বছর বয়সী। তার পরিবার নিজস্ব বাড়িতে বসবাস করে। নিজেদের ধান উৎপাদনযোগ্য কোন জমি নেই। মাত্র চার শতাংশ জমির উপর ছোট একটা ঘর।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

সময়টা ছিল ১৮ জুলাই ২০২৪। দেশে একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি চলছে। এক দিকে ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন অন্যদিকে স্বৈরশাসক ও তার পদলেহনকারী প্রশাসন (পুলিশ, বিজিবি, আর্মি)। এ যেন এক নতুন মুক্তিযুদ্ধ চলছিলো। শিক্ষার্থীরা সারা দেশে কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা করেছে। পুরো দেশব্যাপী থমথমে অবস্থা ছিলো। অধিকার আদায়ে উত্তাল শিক্ষার্থীদেরকে কোনভাবেই যেন দমানো যাচ্ছে না। একের পর এক গুম, খুন, গ্রেফতার চলছে। অধিকার আদায়ে একতাবদ্ধ শিক্ষার্থীদেরকে দমানো যখন দুষ্কর ঠিক সেই মুহূর্তে ফ্যাসিস্ট সরকার সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে সারাদেশে ইন্টারনেট ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়। যাতে করে শিক্ষার্থীরা যোগাযোগ করে একতাবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে নামতে না পারে। ১৮ জুলাই বাঙালির ইতিহাসের এমন এক কলুষিত দিন যখন সারাদেশে থমথমে পরিবেশ। সবার মধ্যে আতঙ্ক। এর মধ্যে দুটি বড় গুজব ছড়িয়ে পড়ে, কেউ কেউ বলে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে, আবার কেউ কেউ বলে বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া মৃত্যুবরণ করেছেন। অপরদিকে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন কোন দিকে রূপ নিয়েছিলো সারা দেশের সাধারণ জনগণের তা জানার কোন উপায় ছিল না। পিতা মাতা সন্তানদেরকে মাঠে নামিয়ে দিয়ে সময় গণনা করছিলেন সন্তান আদৌ জীবিত বাসায় ফিরবে নাকি লাশ হয়ে ফিরবে।

এমনই এক থমথমে পরিস্থিতিতে সকলের প্রিয় ছোট্ট তাহমিদ দুপুরে গোসল সেরে পাঞ্জাবি পায়জামা পড়ে জোহরের নামাজ পড়তে মসজিদে যায়। মসজিদ থেকে নামাজ শেষে বাসায় ফিরে আসে। এরপর প্রতিদিনের মতো পরিবারের সকলের সাথে দুপুরের খাবার শেষ করে।

তাহমিদের মন পড়েছিলো আন্দোলনের মাঠে। তাইতো প্রতিদিনের থেকে একটু তাড়াহুড়ো করে খাবার শেষ করলো। খাবার শেষে তাহমিদ পরিবারের কাউকে না বলে বাসা থেকে বের হয়ে যায়। ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য জেলখানার মোড়ে যায়। জেলখানার মোড়ে যাওয়ার পথে ফ্যাসিস্ট সরকারের পা-চাটা পুলিশের রোষানলে পড়ে। পুলিশ তাহমিদকে লক্ষ্য করে অটবি ফার্নিচারের বিল্ডিং এর উপর থেকে অতর্কিত গুলি চালায়। ১টা/২টা নয় একজন বালকের উপর অসংখ্য গুলিবর্ষণ করে। গুলির তীব্রতা বেশি হওয়ার কারণে তাহমিদ আর দাড়িয়ে থাকতে পারে না। মুহূর্তের মধ্যে রাস্তার উপর পড়ে যায়। সাথে সাথে ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। সময়টা ছিল বিকাল সাড়ে চারটা। এতটুকু ছোটো এক বালক কতোগুলো গুলির ভার বহন করতে পারে!

লাশ নিয়ে পরপর ৩ বার পুলিশের রোষানলে পড়তে হয় তাহমিদের বন্ধু ও সহযোদ্ধাদের।

১ম বার: ছাত্র জনতা তাহমিদকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিতে চাইলে ফ্যাসিস্ট পুলিশের বাধার সম্মুখীন হন। বাধা কাটিয়ে কোনরকমে তাহমিদকে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছালে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাহমিদকে মৃত ঘোষণা করে।

২য় বার: তাহমিদের লাশ নিয়ে হাসপাতালে অবস্থান করা কালীন ছাত্র-জনতা পুলিশের রোষানলের শিকার হন। হাসপাতালে থাকাকালীন তাহমিদের অনেক সহপাঠী আহত হন। একটা দেশের পুলিশ কিভাবে এত নির্মম হতে পারে! যে লাশ নিতে আসা স্বজন বা সহপাঠীদের গুলি করে আহত করে দেয়।

৩য় বারঃ তাহমিদের অনেক সহপাঠী গুলি খেয়ে আহত হওয়ার পরেও কোনরকমে তাহমিদের লাশ নিয়ে স্কুল মাঠে পৌঁছায়। সেখানেও ছাত্র-জনতা ও তাহমিদের সহপাঠীদের উপর পৈশাচিক পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। তাহমিদের অনেক সহপাঠী আহত হয়। ফ্যাসিস্ট সরকারের সহযোগী পুলিশের পশু সুলভ আচরণের নজির পৃথিবীতে খুবই বিরল। পরিবার, প্রতিবেশী, সহপাঠী ও আত্মীয়দের কাঁদিয়ে এভাবেই তাহমিদ চলে যায় না ফেরার দেশে। চিনিশপুর সামাজিক কবরস্থানে দাফন করা হয় সকলের প্রিয় তাহমিদকে।

শহীদের নিকটআত্মীয়ের স্মৃতিচারণ

মা : একমাত্র ছেলে সন্তানকে হারিয়ে মা মূর্ছা প্রায়। যেন কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন। মাঝে মাঝে একমাত্র পুত্র সন্তানের জন্য পাগলের মত আচরণ করছেন। যার হারিয়েছে তিনিই বুঝতে পারেন বিচ্ছেদের ঃ কি যন্ত্রনা। মা বারবার বলেন, তাহমিদের মুখেই প্রথম মা ডাক শুনেছিলাম। আনন্দের ছিল সেই দিন। এত অল্পতেই বিষাদে পরিণত হলো। বিজ্ঞান বিভাগের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র তাহমিদ। আমার ছেলে ক্রিকেট খেলতে খুব ভালবাসত। ক্রিকেট খেলার সব সরঞ্জাম তার বাবা তাকে কিনে দিয়েছিল। তাহমিদের স্কুলের পোশাক,তার ক্রিকেটের ব্যাট ক্রিকেটের হ্যাট,স্টাম্প বারবার ধরে দেখছেন ও কাঁদছেন। কাঁদতে কাঁদতে মায়ের চোখের পানি যেন শুকিয়ে গেছে কিন্তু কমে যায়নি হৃদয়ের হাহাকার।মায়ের হাহাকার কি দিয়ে থামাবো তা আমাদের জানা নেই। তাহমিদের মা বলেন, "ঘরের প্রতিটি কোণে আমি তাহমিদকে খুঁজে বেড়াই এই যেন শুনতে পাই মা বলে ডাকছে"।

বাবা : আমি খুব বেশি মিস করি আমার সন্তানকে। ছোটবেলা থেকেই আমার সন্তান আমার সাথে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করত এমনকি ফজরের সালাতও জামায়াতে পড়তো। যেদিন আমার ছেলেটাকে সম্পূর্ণ অন্যায় ও নৃশংস ভাবে মেরে ফেলে সেদিনও তাহমিদ আমার সাথে জামায়াতে ফজরের সালাত আদায় করেছিল। কি করে ভুলবো আমার প্রথম সন্তানকে। নামাজে দাঁড়ালেই মনে হয় এই বুঝি তাহমিদ এসে আমার পাশে দাঁড়ালো। যেখানেই যাই বারবার যেন কানে ভাসে তাহমিদ বাবা বাবা বলে ডাকছে। আমি তাহমিদের ঠিক বাবা নয় ছিলাম অতি উত্তম বন্ধু। বন্ধুর মতোই আমার বাজান আমার সাথে সবকিছু শেয়ার করতো। একসাথে নামাজে যাওয়া, বাজারে যাওয়া, স্কুলের পথে হাঁটা, আরো কত শত স্মৃতি যা বলে শেষ করা যাবে না। শুধু একটাই কামনা প্রকৃত অন্যায়কারীর যেন সুষ্ঠু বিচার হয়। যেন আর কোন বাবাকে সন্তানের লাশ বহন করার মত ভারী কিছু বহন করতে না হয়। আর কোন মায়ের কোল যেন এভাবে খালি হয়ে না যায়।

ছোট বোন : ভাইয়া ছিল আমার পড়ার সাথী, গল্প বলার সাথী দুষ্টুমির সাথী। ভাই বোন ছোট বড় ঠিক এমনটা না আমরা দুজন ছিলাম একেবারে সমবয়সী বন্ধুর মতো। যেদিন ভাইয়াকে ঘাতকরা শহীদ করে দেয় তার আগের রাতেও অনেক রাত করে আমরা একসাথে পড়াশোনা করেছি। আমার মন খারাপের গল্পগুলো সোনার আর কেউ নেই। যখন কথা বলতে শিখি তখন আমার মুখে ভাইয়া ডাক শোনার জন্য কত আগ্রহ ছিল আমার ভাইয়ের। আমার ভাইটি আর অধীর আগ্রহে থাকবে না আমার ভাইয়া ডাক শোনার জন্য। আমার এইটুকু ছোট জীবনে ভাইয়ার মত এতটা নামাজী, সৎ, মেধাবী, পরিশ্রমী বিনয়ী ও বন্ধু ভাবাপন্ন দ্বিতীয় কাউকে দেখিনি। ফ্যাসিস্ট সরকারের পদলেহনকারী দোসররা এভাবে করে আমার বন্ধুভাবাপন্ন অভিভাবককে শেষ করে দিল তা ভাবতেই পারছিনা। শহীদ হওয়ার দুই মাস পেরিয়ে গেলেও ভাইয়ার স্মৃতিগুলো কোনভাবেই ভুলতে পারছি না। ভাইয়াকে ছাড়া

পড়ার টেবিলে মন বসছে না। পড়াশোনায় কোন ভাবে মনোযোগ ফিরিয়ে আনতে পারছি না। চিৎকার করে খুব বলতে ইচ্ছে করে," আমার সবকিছু নিয়ে যাও তবু আমার বন্ধু ভাইয়াকে ফিরিয়ে দাও"। যদিও তা কখনও সম্ভব না শুধু অবুঝ মনের আকুতি।

দেড় বছরের ছোট বোন : বয়সে এতটাই ছোট যে ভাইকে যে হারিয়ে ফেলেছে/ভাই কোথায় গেছে তা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। প্রতিনিয়তই মাকে বাবাকে ভাই কোথায় এই প্রশ্ন করে। ঘরের আনাচে কানাচে সব জায়গায় ভাইকে খুঁজে ফেরে।

চাচা : তাহমিদ ঠিক আমার ভাতিজা নয় ছিলো নিজ সন্তানের মতো।অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলো আমার ভাতিজা। ঘাতকরা আমার আদুরে ভাতিজার প্রতিভাগুলোকে বিকশিত করার সুযোগটুকু দিলোনা।

ফুপু : তাহমিদ ছিলো আমার কলিজার টুকরা ভাতিজা। কতো আদরমাখা ভালোবাসার কণ্ঠে ফুপু বলে ডাকতো। বাজানকে হারানোর ব্যাথা আমরা সহ্য করতে পারছিনা।

শিক্ষক : আমাদের প্রতিষ্ঠানের নবম শ্রেনীর বিজ্ঞান বিভাগের একজন অসাধারন প্রতিভা ও মেধার অধিকারী ছাত্র ছিলো। কতটা মায়াবী ছিলো ছেলেটা।

শিক্ষকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও কথায় বিনয়ীভাব ছিলো হৃদয়কাড়ার মতো। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সবাই ই তাহমিদকে খুব মিস করে পাশাপাশি তাহমিদের এই আত্মত্যাগে আমাদের প্রতিষ্ঠানের সবাই গর্বিত।

বন্ধুদের স্মৃতিচারণ : আমরা বন্ধু হারাইনি হারিয়েছি আপন ভাইকে।কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগলে তাহমিদ চট করেই একটা উত্তম পরামর্শ/বুদ্ধি বের করে দিতো। মসজিদ থেকে ক্লাসরুম, ক্লাসরুম থেকে খেলার মাঠ সবজায়গায়ই আমরা তাহমিদ কে মিস করছি। পাশাপাশি আমরা সবাই গর্বিত যে এমন একজন আত্মত্যাগী বন্ধু পেয়েছিলাম।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য সমূহ

পুরো নাম	: তাহমিদ ভূঁইয়া
জন্ম তারিখ	: ০৮/০৫/২০০৯
পেশা	: ছাত্র
ঠিকানা	: গ্রাম: চিনিশপুর, ইউনিয়ন: চিনিশপুর, থানা: নরসিংদী সরদ, জেলা: নরসিংদী
পিতার নাম	: মো: রফিকুল ইসলাম
বয়স	: ৪৬, পেশা: পল্লী চিকিৎসক
মাতার নাম	: তায়্যিবা বেগম; বয়স: ৩৬; পেশা: গৃহিনী
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৪
ভাই বোনের সংখ্যা	: ২
	: ১। লিনাত ভূঁইয়া (১৩বছর), পড়াশোনা: ক্লাস সেভেন
	: ২। তাছফিয়া ইসলাম (১.৫ বছর)
ঘটনাস্থান	: জেলখানা মোড়, নরসিংদী
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী হাসিনার ঘাতক পুলিশ
আহত হওয়ার তারিখ	: ১৮/০৭/২০২৪
মৃত্যুর সময় ও তারিখ	: ১৮/০৭/২০২৪, বিকাল ৪.৩০টা
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: চিনিশপুর সামাজিক কবরস্থান

শহীদ মো: জোনায়েদ

ক্রমিক: ২৩১

আইডি: ঢাকা বিভাগ ০৯৮

শহীদের জন্ম পরিচয়

শহীদ মো: জোনায়েদ ১৯৯৭ সালের ১৫ জানুয়ারি নরসিংদী জেলার হাসনাবাদ রায়পুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পেশায় তিনি একজন অটোরিক্সা চালক ছিলেন। তাঁর পিতার নাম আনোয়ার হোসেন এবং মাতার নাম হালিমা। তিনি একজন গৃহিনী।

পারিবারিক জীবন

শহীদ জোনায়েদ ছিল পরিবারের বড় ছেলে। তাঁর বাবার একটা পাকা বাড়ি আছে কিন্তু কোন আয় নেই। জোনায়েদ মিরপুর এলাকায় ৪/৫ বছর ধরে অটো রিক্সা চালাতো এবং পরিবার নিয়ে মিরপুর জল্লাদ থানার এলাকায় থাকত। তাঁর বাবা কিছু করতে অক্ষম। তার পিতা আনোয়ার হোসেন জানান,তার তিন পুত্র সন্তান এবং এক কন্যা সন্তান ছিল। জোনায়েদ সবার বড়। তারপরে কারিমা খাতুন নামে এক কন্যা সন্তান ছিল। গত করোনা মহামারির সময় পিত্তথলিতে পাথর হয়ে সে মারা যায়। অপর দুই পুত্র সন্তানের নাম আরিফুল ইসলাম ও আশরাফুল ইসলাম। অতি দরিদ্র পরিবারের সন্তান হওয়ায় তার ভাগ্যে পড়ালেখার সুযোগ হয়নি। কোন রকমে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে জীবন জীবিকার তাগিদে রাজধানী ঢাকা শহরে অটোরিকশা চালিয়ে সংসার চালাতো। ছোটভাই,আরিফুল ও ট্রাকের হেলপার হিসাবে কাজ করে। জোনায়েদ ২০২০ সালে নরসিংদী, চালাকচর গ্রামের হাফছা খাতুনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তির অকাল মৃত্যুতে বর্তমানে নিদারুন কষ্টে দিনাতিপাত করছে স্ত্রী হাফছা খাতুন সহ গোটা পরিবার।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে জনগণ নানান অন্যায়, শোষণ, নিপীড়ন ও জুলুমের নির্মম ভুক্তভোগী। এদেশের মুক্তিকামী জনতা সময়ের দাবিতে সাড়া দিয়ে এহেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে বারংবার রুখে দাঁড়িয়েছে। সেই সাথে হুংকার দিয়ে সংগ্রামী জনতার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে ছাত্রবৃন্দ। উপরুন্ত গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সাক্ষী, দেশের ক্রান্তিকালে বরাবরই ছাত্রদের মাধ্যমে আন্দোলন সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটে।

দীর্ঘ ১৫ বছরে আওয়ামী দুঃশাসন, ভোটচুরি, দুর্নীতি, খুন, অন্যায়, অত্যাচার জনমনে ফেলেছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কোটা প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবার ষড়যন্ত্র শুরু করে আওয়ামী সরকার। ২০১৮ সালে ছাত্রছাত্রীদের প্রবল আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সকল দাবী মেনে নিলেও তার অন্তরে ছিল হিংসার অগ্নিগিরি। তাই ২০২৪ তালে একটি বিরোধী দলহীন নির্বাচনে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর আবার কোটা ফিরিয়ে আনতে চাইল হাসিনা সরকার। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল গত ১ জুলাই থেকে। অহিংস এই আন্দোলন ১৫ জুলাই থেকে সহিংস হয়। আন্দলোনে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর সশস্ত্র ঘাতক ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও পুলিশ সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে। রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাতের পর থেকেই আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নিরীহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় নিরস্ত্র নিপীড়িত জনতা।

আন্দোলনে যোগদান

বাংলাদেশ নামক গাড়িটা যখন এমনভাবে ব্রেক ফেইল করলো আর বাংলাদেশী নামক যাত্রীরা যখন আতঙ্কিত; চারদিকে যখন কষ্ট, বেদনা, চিৎকার, আহাজারি আর নিশ্চিত ধ্বংসের সুস্পষ্ট লক্ষণ, তখন শহীদ জোনায়েদের মত রিকশা চালকও কি বসে থাকতে পারে? তার হৃদয়ে কি দাগ কাটতে পারেনা? পেশায় রিকশা চালক হলেও রাষ্ট্রযন্ত্রের এমন বর্বরতা দেখে সমাজ সচেতন একজন জোনায়েদের মনেও আঁচড় কাটতে পারে। কেননা সবকিছু তো তার সামনেই ঘটছে। তিনি নিজের কানেই শুনছেন মানুষের নিদারুণ আর্তনাদ; ব্যথিত মনের হাহাকার। নিজের চোখে দেখছেন কিভাবে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করছে শাসক নামধারী শোষক গোষ্ঠী। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে, ২০২৪ সালের ৪ আগষ্ট রবিবার, দুপুরে জোনায়েদ তাঁর বন্ধুদের সাথে আন্দোলনে যোগ দেয়।

যেভাবে শহীদ হন

শহীদ জুনায়েদ এই আন্দোলন মিছিলে দু,বার গুলি বিদ্ধ হয়।প্রথম বার বেঁচে গেলেও দ্বিতীয়বার তার শেষ রক্ষা হয়নি। গত ২৫ জুলাই মিছিলে থাকাকালীন কল্যানপুর এলাকায় তার ডান পায়ে রাবার বুলেটের ২ টি গুলি লাগে। তারপর পা থেকে প্রথম বার রাবার বুলেট বের করতে সক্ষম হলেও দ্বিতীয়বার মাথায় আঘাত করা রাইফেল এর গুলিতেই জুনায়েদ শাহাদাত বরণ করে। প্রথম বার তার পা থেকে গুলি বের করার পর কিছুটা সুস্থ্য হলে আবারো ৪ আগস্ট রাজধানী ঢাকা শহর যখন হাসিনা সরকারের অপসারণ দাবিতে মিছিলের জনসমুদ্রে পতিণত হয়। জুনায়েদ তখন সেই মিছিলের অগ্রভাগে থাকায় মিছিলকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে সরকারের পুলিশ বাহিনী যখন বেপরোয়া ভাবে মিছিলকারীদের লক্ষ্য করে গুলি করতে থাকে তখন জুনায়েদ এর মিছিলটি দুপুর ২ ঘটিকায় মিরপুর আইডিয়াল কলেজ অতিক্রম করার সময় ঘাতক পুলিশের রাইফেল থেকে ছোঁড়া ২টি বুলেট তার মাথায় আঘাত হানে এবং মস্তক ভেদ করে পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। অন্যান্য সাথীরা তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় আগারগাঁও নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে ভর্তি করার পর তাঁর মাথা থেকে প্রচুর রক্ত ক্ষরনের ফলে রাত ১২ টা ৩০ মিনিটে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। রচিত হয় দ্বিতীয় স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী ইতিহাস।

জানাযা ও দাফন

৫ আগস্ট শহীদ মোঃ জোনায়েদ এর মরদেহ বাড়িতে আনার পর বাদ যোহর নামাজের পর তাঁকে দক্ষিণ মির্জানগর পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে প্রতিবেশীর বক্তব্য

জুনায়েদ এর অকাল মৃত্যুতে তার পরিবারের বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে দক্ষিন মির্জানগরের বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী, সংগঠক, প্রতিভা টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট নরসিংদীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক শর্ট কোর্স ঐক্য পরিষদ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের প্রধান সমন্বয়ক মো: নাসিরুদ্দিন ভুঁইয়া বলেন, এই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে জুনায়েদ তাঁর বুকের তাজা রক্ত দিয়ে লিখে গেছে দ্বিতীয় স্বাধীনতার ইতিহাস।এই তরুন শহীদ বীর কে আমি স্যালুট জানাই।

প্রস্তাবনা

১. পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান ও নিয়মিত মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা।
২. সন্তানদের ভবিষ্যতের ভরণপোষণ নিশ্চিত করা।
৩. শহীদের ছোট ভাইয়ের ভালো চাকুরীর ব্যবস্থা করা।

একনজরে শহীদের ব্যগতিগত তথ্যাবলি

নাম	: মো: জোনায়েদ
পেশা	: রিকশা চালক
জন্ম	: ১৫-০১-১৯৯৭
ঠিকানা	: গ্রাম : পূর্ব পাড়া, ইউনিয়ন : আমিরগঞ্জ, থানা: রায়পুর
জেলা	: নরসিংদী
পিতা	: আনোয়ার হোসেন
মাতা	: হালিমা, পেশা : গৃহিণী
ঘটনার স্থান	: মিরপুর ১০ (মিরপুর আইডিয়াল কলেজ)
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৪ আগস্ট ২০২৪ দুপুর ২.০০ টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ৫ আগস্ট ২০২৪ রাত ১২.৩০ টা
শহীদের কবরের অবস্থান	: হাসনাবাদ পূর্বপাড়া (পারিবারিক কবরস্থান)

শহীদ মো: আযিযুল মিয়া

ক্রমিক: ২৩২

আইডি: ঢাকা বিভাগ ০৯৯

শহীদের জন্ম পরিচয়

মোঃ আযিযুল মিয়া নরসিংদী জেলার সদর উপজেলায় ২০০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আলমাস মিয়া এবং মাতার নাম রাবেয়া। ডানপিটে এই তরুণ পারিবারিক অস্বচ্ছলতার কারনে অল্প বয়সেই পড়ালেখা থেকে ছিটকে পড়ে। পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে ছেলেবেলাতেই বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হন। সর্বশেষ তিনি রাস্তায় ডাব বিক্রি করতেন। অদম্য সাহসী এই তরুণ দেশের জন্য অল্প বয়সেই নিজের জীবনকে আত্মত্যাগ করেন।

শহীদের পারিবারিক অবস্থা

মো: আযিযুল মিয়ার পিতা আলমাস মিয়া ৫৫ বছরের একজন বৃদ্ধ। পুরো পরিবারের দায়িত্ব ছিলো আযিযুল মিয়ার উপর। তাঁর ভাই প্রবাসী (মালয়েশিয়া) হলেও সে তেমন আর্থিক সাহায্য করতে পারে না। বর্তমানে মেয়ে জামাই পরিবারের দেখাশোনা করছে। আযিযুল মিয়ার ছোট একজন ভাই আছে; যিনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। বাড়িতে বিবাহযোগ্য একজন বোন (২০) রয়েছে। তাদের ৪ শতাংশ জমির উপর একটি টিনের বাড়ি রয়েছে এবং ২০ শতাংশ আবাদি জমি আছে।

আন্দোলনে যোগদান

১৯ জুলাই ২০২৪ শুক্রবার সকালে বিপ্লবী আযিযুল মিয়া বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হয়। তিনি নরসিংদী জেলখানা মোড়ে শান্তি সমাবেশে অংশ নেয়।

শাহাদাতের ঘটনা

আযিযুল মিয়াদের শান্তি সমাবেশ নরসিংদী জেলখানা মোড়ে অবস্থান করছিলো। স্বৈরাচারী নরখেকো শেখ হাসিনার সন্ত্রাসী ঘাতক পুলিশ বাহিনী কোনরকম সতর্কতা ছাড়াই শান্তিপ্রিয় ছাত্র জনতার উপর অনবরত গুলি ছুঁড়তে থাকে। রাষ্ট্রযন্ত্রের লেলিয়ে দেয়া ঘাতক বাহিনীর সশস্ত্র আক্রোমণকে উপেক্ষা করে অকুতোভয় আযিযুল মিয়া ছাত্রদের সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে এবং সবাইকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানায়। এ সময় ছাত্ররা নিজেদের রক্ষার পাশাপাশি দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তাৎক্ষনিক আহত ছাত্রদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করাসহ মারাত্মক আহতদের হাসপাতালে পাঠানোর জন্য একদল ছাত্র বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আযিযুল পুলিশের নিক্ষিপ্ত টিয়ারশেল থেকে রক্ষা করতে ছাত্র-জনতাকে উপায় বাতলে দেয়। এছাড়া পুলিশের নিক্ষিপ্ত টিয়ারশেল গুলো দ্রুত পুলিশের অবস্থানের দিকেই ছুড়ে মারতে থাকে। হঠাৎ সন্ত্রাসী পুলিশ ও যুবলীগের সন্ত্রাসীদের থেকে নিক্ষিপ্ত একটি গুলি তার কোমড়ে লাগে যা অপর পাশ দিয়ে বের হয়ে যায়। মুহূর্তেই তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। প্রচন্ড গোলাগুলির ভেতর ছাত্র জনতা অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে ৩ দিন নিবিড় তত্ত্বাবধানের অভাবে কাতরাতে থাকে প্রতি রাতে। মরণযন্ত্রণা সহ্য করতে করতে ২২ জুলাই আল্লাহর ডাকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তেজোদ্দীপ্ত আযিযুল।

জানাযা ও দাফন

২২ জুলাই শহীদ আযিযুল মিয়ার মরদেহ নিজ বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে বাড়ির পাশে তাঁর নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। পরে দরিপাড়া হাজীপুর কবরস্থানে তাঁকে চির নিদ্রায় শায়িত করা হয়।

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারের বাসস্থান প্রয়োজন।
২. বোনের বিয়ের ব্যবস্থা করা।
৩. স্থায়ীভাবে আয়ের ব্যবস্থা করা।

একনজরে শহীদ সম্পর্কে তথ্যাবলি

নাম	: মোঃ আযিযুল মিয়া
পেশা	: ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী
জন্ম	: ০১-০৭-২০০২
ঠিকানা	: গ্রাম: বাদুয়ারচর, ইউনিয়ন: হাজীপুর, থানা: সদর, জেলা: নরসিংদী
পিতা	: আলমাস মিয়া, পেশা: কৃষক, বয়স: ৫৫
মাতা	: মর্জিনা বেগম, পেশা : গৃহিণী, বয়স: ৪৫
ঘটনার স্থান	: জেলখান মোড়, নরসিংদী
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী।
আহত হওয়ার সময়কাল	: ১৯-০৭-২০২৪ , বিকাল ৫.০০ টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ২২-০৭-২০২৪ , দুপুর ১২ টা
শহীদের কবরের অবস্থান	: দরিপাড়া, হাজীপুর, কবরস্থান

শহীদ ডাঃ সজিব সরকার

ক্রমিক: ২৩৩

আইডি: ঢাকা বিভাগ ১০০

শহীদের পরিচয়

শহীদ ডা: সজিব সরকার ১৯৯৩ সালে নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মো: হালিম সরকার এবং মাতার নাম ঝর্না বেগম। প্রচন্ড মেধাবী সজিব সরকার এমবিবিএস পাশ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেছিলেন। তিনি মেডিসিন বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। ঢাকায় মা-বাবা ও ভাইবোনকে নিয়ে ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। মেধাবী এই যুবকের মৃত্যুতে পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে ।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল গত ১ জুলাই ২০২৪ থেকে। অহিংস এই আন্দোলন ১৫ জুলাই থেকে সহিংস হয়। আন্দলোনে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর সশস্ত্র ঘাতক ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও পুলিশ সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে। রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাতের পর থেকেই আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নিরীহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় নিরস্ত্র নিপীড়িত মুক্তিকামী জনতা।

শাহাদাতের ঘটনা

১৮ জুলাই ২০২৪ বৃহঃস্পতিবার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের ডাকে সারা দেশের ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচী চলছিলো। এদিন মোঃ সজিব সরকার তার ছোট ভাইকে আনতে উত্তরার আজমপুরে যান। ২০২৪ সালে বাংলাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় ঢাকার উত্তরা এলাকায় ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই আন্দোলন শিক্ষার্থীদের ন্যায্যতা, শিক্ষার মান এবং সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছিল। উত্তরা এলাকার শিক্ষার্থীরা সংগঠিত হয়ে আন্দোলন শুরু করে, যা দ্রুত সমগ্র ঢাকায় ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনের সময় উত্তরা এলাকায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়, যেখানে নিরাপত্তা বাহিনী শক্তি প্রয়োগ করে এবং হয়ে উঠে সবচেয়ে অনিরাপদ ভয়ের কারণ। কাঁদানে গ্যাস, রাবার বুলেট ও জলকামান ব্যবহার করা হয়। এই সংঘর্ষে অনেক ছাত্র-জনতা শহীদ হয়, গুরুতর আহত হয় এবং গণগ্রেফতার করা হয়। গোটা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, যা সাধারণ জনমনের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনকারীরা রাস্তা অবরোধ করে এবং সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়। সরকারের দমন-পীড়নের ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়ে। সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুসারে, উত্তরা এলাকায় পুলিশের অভিযান চলাকালীন বেশ কিছু গুরুতর আহত হয় এবং চিকিৎসার অভাবে অনেকের অবস্থা খারাপ হয়। এই আন্দোলন দেশের রাজনৈতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে এবং বৈষম্য ও মানবাধিকারের প্রশ্নে নতুন আলোচনার সূচনা করে। উত্তরা এলাকার ঘটনার কারণে সামাজিক সচেতনতা বাড়ে এবং আন্দোলনের শক্তি ও একতা প্রকাশ পায়। সজিব সরকার ছোট ভাই মোঃ আব্দুল্লাহ উত্তরার আশরাফুল উলুম মাদরাসায় পড়াশোনা করেন। এমন উত্তপ্ত পরিস্থিতে সজিব সরকার উত্তরার আজমপুরে বাস থেকে নেমে পায়ে হেঁটে মাদ্রাসার দিকে যাচ্ছিলেন। কিছুদুর যাওয়ার পর স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের ঘাতক পুলিশ বাহিনীর একজন সদস্য তাকে অহেতুক আটকায় এবং নির্দয়ভাবে লাথি মারে। সেই সাথে আশেপাশের সাধারণ পথচারীদের হঠাৎ লাঠিপেটা শুরু করে। পিশাচ পুলিশের আঘাতে সজিব সরকার মাটিতে পড়ে যায়। এমতাবস্থায় এক উন্মাদ পুলিশ সদস্য খুব কাছে থেকে নির্মমভাবে তাকে গুলি করে। তাৎক্ষণিক শুরু হয় রক্তক্ষরন। অসহায়ভাবে রাস্তায় পড়ে থাকে তিনি। পুলিশের এলোপাথ-াড়ি গুলিতে কেউ পাশে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছিলো না এবং আহতদের উদ্ধার করা যাচ্ছিলো না। প্রত্যক্ষদর্শীর তথ্যমতে, সজিব দীর্ঘক্ষণ পড়ে থাকায় প্রচুর রক্তপাত হয়েছিলো এবং তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলেন। পুলিশ গুলি করতে করতে অন্যদিকে এগিয়ে গেলে সুযোগ বুঝে পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে উত্তরার আধুনিক হাসপাতালে নিয়ে যায়। দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে পর্যবেক্ষণ করে মৃত ঘোষণা করেন এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরনে মৃত্যু হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

জানাজা ও দাফন

হাসপাতাল থেকে শহীদ সজিব সরকারের মরদেহ নিজ গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রামের বাড়িতে জানাজা শেষে চরসুবুদ্ধি কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

শহীদের পারিবারিক অবস্থা

মো: সজিব সরকারের বাবা মো: হালিম সরকার ৫৮ বছরের বৃদ্ধ। তার বাবার সামান্য আয় দিয়ে পরিবারের ভরণপোষণ করছেন। ডা: সজিব সরকার মেডিকেল কলেজের লেকচারার হওয়ায় পরিবারের অভাব অনেকটায় কমে এসেছিলো। তার পিতা মো: আব্দুল হালিম সরকার, ডাঃ সজিব সরকারের বেতনের ভরসায় মেয়েকে উচ্চ শিক্ষার জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করেন, যা অনেক ব্যয়বহুল। দায়িত্বশীল প্রিয় পুত্রের শাহাদাতের পর তার বোনের পড়ালেখা অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। শহীদের ছোট ভাই একজন মাদরাসায় পড়াশোনা করছে। সজীব সরকারের মাতা ঝর্না বেগম দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। তিনি হার্ট, কিডনী ও ডায়াবেটিস রোগে ভুগছেন। তার চিকিৎসা বাবদ প্রতি মাসে অনেক টাকা ব্যয় হয়। ঢাকায় ডা: সজিবের পুরো পরিবার একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করেন। গ্রামে তাদের ৪ শতাংশ জমি আছে তবে সেখানে কোনো ঘর নেই।

প্রস্তাবনা

১. বাসস্থান প্রয়োজন।
২. মায়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
৩. ছোটভাই-বোনদের লেখা-পড়ার খরচ যোগানে সহযোগিতা করা যেতে পারে।

একনজরে শহীদ ডা: সজিব সরকার

পূর্ণ নাম	: ডা: সজিব সরকার
জন্ম	: ১২-১০-১৯৯৩
জন্মস্থান	: নরসিংদী
পেশা	: ডাক্তার
পেশাগত প্রতিষ্ঠান	: ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মাঝিরকান্দি, ইউনিয়ন: মির্জানগর, থানা: রায়পুরা, জেলা: নরসিংদী
পিতার নাম	: মো: হালিম সরকার
মায়ের নাম	: ঝর্না বেগম
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ৬ জন
ঘটনার তারিখ ও স্থান	: ১৮-০৭-২০২৪ , বিকাল ৫.০০ মিনিট; উত্তরা আজমপুর
আক্রমণকারী/আঘাতকারী	: স্বৈরাচারি সরকারের ঘাতক পুলিশ
শহীদ হওয়ার তারিখ, সময়, স্থান	: ১৮-০৭-২০২৪, বিকাল ৫.৩০ মিনিট; উত্তরা আধুনিক হাসপাতাল
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: চরসুবুদ্ধি কবরস্থান, রায়পুরা, নরসিংদী

শহীদ মো: সিয়াম

ক্রমিক : ২৩৪

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১০১

শহীদের পরিচয়

শহীদ মো: সিয়াম ২০০৮ সালে নিজ জেলা নরসিংদীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে শাষপুর দারুল উলুম হুসাইনিয়া মাদ্রাসার একজন হাফেজিয়া ছাত্র ছিলেন। তার মহাগ্রন্থ পবিত্র আল কুরআনের ২০তম পারা শেষ করে ২১ তম পারা মুখস্থ চলছিল। তার পিতার নাম শিবলী রেজা এবং মাতার নাম মরিয়ম বেগম । মেধাবী, ভদ্র এই ছেলের মৃত্যুতে পুরো পরিবার শোকাহত ।

শহীদের পারিবারিক অবস্থা

সিয়ামের একটি ছোট বোন আছে যিনি প্রতিবন্ধী। পিতার অকাল মৃত্যুতে দিশেহারা মা নানীর বাড়িতে চলে যায় এবং নানীকে সাথে নিয়ে সেখানেই বসবাস শুরু করে। তার মামাতো ভাই এর সাহায্যে পরিবার চলছিল এবং এতিমখানায় থেকে সিয়াম পড়ালেখা করছিল। শহীদ সিয়ামের মা ২ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে সৌদি আরবে কাজের সন্ধানে গিয়েছিল। হঠাৎ ছেলের মৃত্যুর সংবাদে মা দেশে চলে আসে ।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালের জুলাই মাসে শহীদ মোঃ সিয়াম তার বন্ধু আর সহপাঠীদের কাছে জানতে পারে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের কথা। আরও ৪ বছর আগে ২০১৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা শুরু করেছিল কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলন। সে বছর তারা স্বৈরাচার সরকারের হঠকারিতা ও একগুঁয়েমিতার কারণে সম্পূর্ণ খালি হাতে ঘরে ফিরতে বাধ্য হয়েছিলো। সাধারণ শিক্ষার্থীদের সেই আন্দোলন ২০২৪ সালে আবার ফিরে এসেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নামে।

সে বছর শহীদ মোঃ সিয়াম আরো ছোট ছিলেন। তাই সেদিনের কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে তিনি ছিলেন না। ছোট বলে কেউ কিছু বুঝাতেও আসেনি তাকে। তবে কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলন না বুঝলেও ঐ বছর স্কুল কলেজ আর মাদ্রাসার ছোট ছোট শিক্ষার্থীদের ডাকা নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে সহপাঠীদের সাথে শহীদ মোঃ সিয়ামও ছিলেন। ঐ বছর দীর্ঘদিন তারা রাজপথে থেকে আন্দোলন করেছিলেন স্বৈরাচার আওয়ামী সরকারের বিরুদ্ধে।

যৌক্তিক ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্যও যে এদেশে কত সংগ্রাম আর ত্যাগের প্রয়োজন হয় তা ছোট ছোট শিশুদের সাথে শহীদ সিয়ামও অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাইতো দূর্নীতিবাজ স্বৈরাচার সরকারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন তার চেনা; এই রাজপথ তার পরিচিত।

২০২৪ সালের জুন মাসে ছাত্ররা দেখলো আবারও তারা বৈষম্যের চেতনাবাদী সরকারের কুটচালের শিকার হচ্ছে। তাই জুলাইয়ের শুরুতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যখন থেকে রাজপথকেই তাদের দাবি আদায়ের শেষ ঠিকানা হিসেবে নির্ধারিত করলো সিয়ামও তখন থেকেই পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে নিয়মিত আন্দোলনের খোঁজ নিতে শুরু করলে।

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চলছে রাজপথে। এর মধ্যে স্বৈরাচার আওয়ামী সরকার অস্ত্র হাতে তুলে নিলেন নিরস্ত্র সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে। ১৬ জুলাই আন্দোলনরত নিরীহ-নিরস্ত্র সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর নির্বিচারে গুলি করলো খুনি গোপালীশ পুলিশ।

শহীদ হলেন রংপুর রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৬ জন শিক্ষার্থী। এই ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠলো দেশের প্রতিটি সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। আন্দোলনের সাথে যোগ দিলো অনেক স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী। যোগ দিলেন শহীদ মোঃ সিয়ামও।

আন্দোলনে যোগদান

বন্ধুদের সাথে ১৯ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে সরাসরি যোগদান করেন মাদ্রাসা ছাত্র মোঃ সিয়াম। ১৯ জুলাই বৃহস্পতিবার সারাদেশে সাধারণ শিক্ষার্থীদের গণহারে হত্যা করে

রক্ত পিপাসু হাসিনা সরকারের ঘাতক পুলিশ বাহিনী। সেদিন শুধুমাত্র পানি বিতরনের অপরাধে হত্যা করা হয় স্বেচ্ছাসেবক মেধাবী ছাত্র মুগ্ধকে। ঐদিন রাতে ইন্টারনেট বন্ধ করে সারাদেশ কারফিউ জারি করে অবৈধ আওয়ামী সরকার।

১৯ জুলাই একদিকে কারফিউর কারণে বাসা বাড়ি থেকে বের হওয়া যাচ্ছে না আবার অন্যদিকে ইন্টারনেট বন্ধ। তাই সারাদেশে কোথায় কি হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারেনি সাধারন জনতা। কিন্তু শহীদ সিয়াম বের হয়েছিলেন; কখনোই বেশি দূরে যেতে পারেননি তিনি। বারবার বাধা পেয়ে ফিরে আসতে হয়েছে তাকে। তাছাড়া এমনিতেই এর আগের চার পাঁচ দিন সারাদেশের সাধারন শিক্ষার্থীরা ব্যাপকভাবে আহত, নিহত হয়েছে। তার উপর আবার কারফিউ এবং ইন্টারনেট বন্ধ হওয়ায় কোথাও কোথাও শিক্ষার্থীরা অন্তত কারফিউ শেষ হওয়ার অপেক্ষায় ছিলো। তাই মোটামুটি ঘরে বসে বা মহল্লায় থেকেই সাধ্যমতো সহযোগিতা করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না সিয়ামের।

শাহাদাতের ঘটনা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন তখনও সরকার পতনের আন্দোলনে রূপ নেয়নি। এমন সময় ১৯ জুলাই বিকেল থেকে নরসিংদী জেলার ইটাখোলা পুলিশ ফাঁড়ির সামনে পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করতে থাকে। এক পর্যায়ে আন্দোলনের সামনে থাকা কুরআনের পাখি মেধাবী হাফেজ ছাত্র সিয়াম গুলিবিদ্ধ হয়। নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে যখন নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলো ঠিক তখনই আরেকটি গুলি এসে লাগে তার বুকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সেখানেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

স্মৃতিচারণ

সিয়ামের খালু মোঃ সিদ্দিক শহীদ সম্পর্কে বলেন, সিয়াম খুব ভালো ছেলে ছিলো । সে পড়াশোনায় খুব ভালো এবং মনোযোগী ছিল। সে নাযারানা শেষ করে হাফেজিয়া ভর্তি হয় । সে ছোট থেকেই নামায পড়ত ।

জানাযা ও দাফন

নিজ এলাকায় জানাজার নামাযের পর শহীদ মিনার কবরস্থানে এই কুরআনের পাখি শহীদ মোঃ সিয়ামকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারের বাসস্থান প্রয়োজন।
২. ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা।
৩. প্রতিবন্ধী বোনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

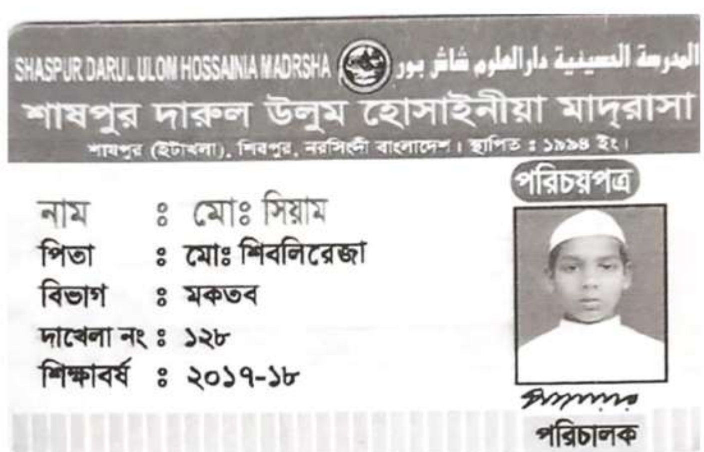

SHASPUR DARUL ULOM HOSSAINIA MADRSHA المدرسة الحسينية دار العلوم شاش بور

শাষপুর দারুল উলুম হোসাইনীয়া মাদ্‌রাসা

শাষপুর (ইটাখলা), শিবপুর, নরসিংদী বাংলাদেশ। স্থাপিত : ১৯৯৪ ইং।

পরিচয়পত্র

নাম ঃ মোঃ সিয়াম
পিতা ঃ মোঃ শিবলিরেজা
বিভাগ ঃ মকতব
দাখেলা নং ঃ ১২৮
শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০১৭-১৮

পরিচালক

একনজরে শহীদ সম্পর্কে তথ্যাবলি

নাম	: মো: সিয়াম
পেশা	: ছাত্র
জন্ম	: ২৮-০৪-২০০৮
ঠিকানা	: গ্রাম: শাষপুর, ইউনিয়ন : আয়ুবপুর, থানা: শিবপুর, জেলা: নরসিংদী
পিতা	: মো: শিবলি রেজা, মৃত
মাতা	: মরিয়ম বেগম, পেশা : গৃহিণী, বয়স: ৩৮ বছর
ঘটনার স্থান	: ইটাখোলা হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ি
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী
আহত হওয়ার সময়কাল	: ১৯-০৭-২০২৪ , বিকাল ৫.৪০টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ২২-০৭-২০২৪ , আনুমানিক বিকাল ৫.৫০টা
শহীদের কবরের অবস্থান	: শহীদ মিনার কবরস্থান

শহীদ মোঃ সুজন মিয়া

ক্রমিক : ২৩৫

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১০২

জন্ম পরিচয়

শহীদ সুজন মিয়া ৩ মার্চ ২০০১ সালে নরসিংদী জেলার শিবপুর থানায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মোঃ মোস্তফা কামাল এবং মাতার নাম সামসুর নাহার। অল্প বয়সে পিতার মৃত্যুতে পরিবার যখন অচল, তখন পড়ালেখা বাদ দিয়ে বিভিন্ন কাজে যুক্ত হন এই সাহসী তরুণ। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ভাড়ায় রিক্সা চলাতেন। কঠোর পরিশ্রমী, ভদ্র এই ছেলের মৃত্যুতে পুরো পরিবার শোকাহত।

শহীদের পারিবারিক অবস্থা

মৃত পিতার অবর্তমানে পরিবারের সম্পূর্ণ ভার মো: সুজন মিয়ার উপরেই ছিলো। তার বাবা ছিলেন রাজমিস্ত্রী। ৪ বছর আগে পিতার মৃত্যুর পর অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। পরিবারের খরচ চালাতে তিনি অটো রিক্সা চালানো শুরু করেন। নিজের রিক্সা না থাকায় তিনি ভাড়ায় রিক্সা চালাতেন। শহীদের স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটেছে বিধায় একমাত্র কন্য দাদীর কাছে লালিত-পালিত হচ্ছে।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল গত ১ জুলাই থেকে। অহিংস এই আন্দোলন ১৫ জুলাই থেকে সহিংস হয়। আন্দোলনে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর সশস্ত্র ঘাতক ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও পুলিশ, জঅই সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে। রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাতের পর থেকেই আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নিরীহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় নিরস্ত্র নিপীড়িত মুক্তিকামী জনতা।

আন্দোলনে যোগদান

সুজন মিয়া নিজের কানেই শুনেছেন মানুষের নিদারুণ আর্তনাদ; ব্যথিত মনের হাহাকার। নিজের চোখে দেখেছেন কিভাবে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করছে শাসক নামধারী শোষক গোষ্ঠী। নিজের সন্তানতুল্য আহত, নিহত শিক্ষার্থীদের নিজের রিক্সায় করে নিয়ে যখন ছুটেছেন হাসপাতালে হাসপাতালে, তখন কি তার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে না? তিনিও তো রক্তে মাংসে গড়া একজন মানুষ। এরকম শত সহস্র প্রশ্ন জেগে উঠতো সুজনের হৃদয়ে। কোনো উত্তরই তিনি খুঁজে পেতেন না। আর যখন খুঁজে পেলেন, তখন নিজেকে তিনি আবিষ্কার করলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের পাশে। এই যে শিক্ষার্থীদের জন্য তার মন কাঁদে; কম ভাড়ায় বা বিনা ভাড়ায় আহত, নিহত শিক্ষার্থীদের নিয়ে ছুটোছুটি করেন; নিহত শিক্ষার্থীদের পরিবারের আর্তনাদে যে তার খুব কষ্ট হয়, এটা কেন? আস্তে আস্তে তিনি বুঝতে পারেন নিজের অজান্তেই এতোদিন শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে সমর্থন করে এসেছেন। কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করে দিলেন মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে। সিদ্ধান্ত নিলেন, এখন থেকে প্রকাশ্যে এবং পুরোপুরিভাবেই যোগদান করবেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে।

যেই ভাবনা সেই কাজ। প্রতিদিন রিক্সা চালিয়ে যা উপার্জন হত তা থেকেই একটা অংশ ব্যয় করতেন আন্দোলনের জন্য। এককথায় আন্দোলনের সাথে সম্পূর্ণভাবেই নিজেকে যুক্ত করেন তিনি।

শাহাদাতের ঘটনা

স্বৈরাচারী সরকার শেখ হাসিনা পতনের জন্য ছাত্র-জনতার মিছিলে অংশগ্রহণ করতে শহীদ মোঃ সুজন মিয়া ৫ আগস্ট ২০২৪ সোমবার আনুমানিক দুপুর ১ টায় খাবার খেয়ে বাসা থেকে বের হয়। তিনি ছাত্র-জনতার মিছিলে বিভিন্ন স্লোগানের মাধ্যমে প্রতিবাদ করছিলো। এক পর্যায়ে সাভার থানা স্ট্যান্ড এলাকায় পুলিশের ৩ টি জিপ এসে থামে। পুলিশ গাড়ি থেকে নেমেই নির্বিচারে গুলি ছোঁড়া শুরু করে। ফ্যাসিবাদি সরকারের পেটুয়া পুলিশ বাহিনীর ছোঁড়া গুলিতে ছাত্র-জনতা দিশেহারা হয়ে দিগ্বিদিক ছুটোছুটি শুরু করে। মুহুর্তেই পুরো এলাকা পরিণত হয় রণক্ষেত্রে। নিমিষেই কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হয় এবং রাজপথে লুটিয়ে পড়ে। সুজন মিয়া তাদের উদ্ধার করার জন্য কয়েকজনকে সাথে নিয়ে এগোতে থাকে। হঠাৎ খুনি শেখ হাসিনার ঘাতক পুলিশের একটি গুলি এসে লাগে সুজন মিয়ার শরীরে। তিনি যন্ত্রণায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ছাত্র-জনতা তাকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করে কিন্তু মুহুর্মুহু গুলির মধ্যে কেউ তার নিকট পৌছাতে পারছিলো না। কিছুক্ষণ পর একজন গিয়ে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে কিন্তু ততক্ষনে দেরি হয়ে গেছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে পৃথিবীর সকল মোহ ত্যাগ করে দেশের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে আল্লাহর ডাকে সারা দিয়ে চলে গেছে না ফেরার দেশে।

নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

মো: সুজন মিয়া সম্পর্কে তার মামাতো ভাই মো: জুয়েল মিয়া জানান, সুজন খুব কর্মঠ ছিলো। তার বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই সে অটো রিক্সা চালিয়ে পরিবার চালায়। সে অসৎ পথে উপার্জন করত না।

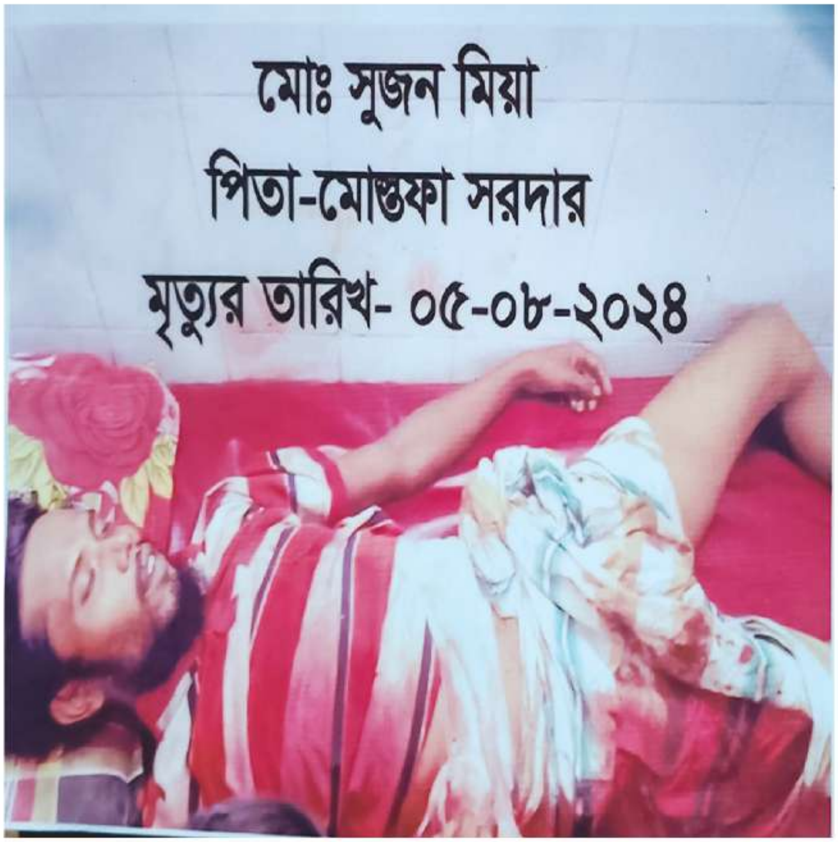

একনজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

পূর্ণ নাম	: মো: সুজন মিয়া
জন্ম	: ০৩ মার্চ ২০০১
জন্মস্থান	: নরসিংদী
পেশা	: রিক্সা চালক
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ঘাসিরদিয়া, ইউনিয়ন: শিবপুর, থানা: শিবপুর, জেলা: নরসিংদী
পিতার নাম	: মো: মোস্তফা কামাল
মায়ের নাম	: সামসুর নাহার
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ৩ জন
ঘটনার তারিখ ও স্থান	: ০৫-০৮-২০২৪, সাভার বাসস্ট্যান্ড, সাভার
আহত হওয়ার সময়	: ০৫-০৮-২০২৪, বিকাল ৩.০০টা
আক্রমণকারী/আঘাতকারী	: স্বৈরাচারি সরকারের ঘাতক পুলিশ বাহিনী
শহীদ হওয়ার তারিখ, সময়, স্থান	: ০৫-০৮-২০২৪, বিকাল ৩.৩০টা, সাভার বাসস্ট্যান্ড
শহীদের জানাজা	: ঘাসিরদিয়া দক্ষিণপাড়া, শিবপুর
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: ঘাসিরদিয়া দক্ষিণপাড়া কবরস্থান, শিবপুর

প্রস্তাবনা

মেয়ের লেখা-পড়ার খরচ যোগানে সহযোগিতা করা যেতে পারে

শহীদ তামিন হৃদয়

ক্রমিক: ২৩৬
আইডি: ঢাকা বিভাগ ০১০৩

পরিচয়

শহীদ তামিন হৃদয়। তামিন নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলায় দক্ষিণ সাধারচর গ্রামে ২ আগস্ট ২০০৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা তমিজ উদ্দিন মীর ও মাতা রুমি বেগম। অল্প বয়সেই তার মা ইন্তেকাল করেন। দাদীর কাছেই তমিন বড় হয়ে ওঠে। তামিন হরিন্দ পশ্চিমপাড়া আল আহেলিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার ছাত্র। তিনি নযরানা শেষ করে হাফিজিয়া পড়ছিলেন। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তার নয় পারা মুখস্ত ছিল। মা হারা ভাইদের মধ্যে বাবা ও দাদীর তামিনকে নিয়েই ছিল অনেক স্বপ্ন। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের স্বীকার হয়ে ১৯ জুলাই ২০২৪ আনুমানিক সন্ধ্যা ৬টায় তিনি শহীদের রক্তে রঞ্জিত হন।

জুলাই ২০২৪ এর আন্দোলন ছিল তরুণদের আন্দোলন। এটি ছিল অধিকারের লড়াই। একটি যৌক্তিক চাওয়াকে কেন্দ্র করে ঝরে গেল তাজা শতশত প্রাণ। জীবনের চেয়ে মূল্যবান কি আছে? ছিল না শাসক শ্রেণীর সঠিক ভূমিকা। দীর্ঘ সময় ক্ষমতা তাদের হৃদয়কে পাথর বানিয়ে দিয়েছিল। ন্যায়ের প্রতি ছিল না কোনো শ্রদ্ধা সম্মান। মানুষের অধিকার ছিল যেন একটি খেলনাতুল্য। অথচ আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা তরুণের শক্তি সাহসকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছিল। আল্লাহ তাআলা তরুণদের মাধ্যমে দেখিয়েছেন পৃথিবীর ক্ষমতা যত দীর্ঘই হোক তার ভিত্তি ততটোই দুর্বল। অসহায়ের চোখের পানির মূল্য অনেক। মাত্র একটি কোটা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসকে পাল্টে দিয়েছে। স্বৈরশাসনের পিষ্টে নিষ্পেষিত জাতি অন্ধকারের অতল গহ্বরে যখন নিমজ্জিত ঠিক সেই সময়ে তরুনরা নিজের বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশকে একটি নতুন পথের দিকে আহ্বান জানায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণদের সাথে হাজির হয় স্কুল কলেজ মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা। অভিভাবকগণও ছিল তাদের পাশে। তাদের পদচারনায় বাংলাদেশের চিত্র বদলে যায়। আপামর জনসাধারণ উপলব্ধি করে পরিবর্তনের সময় এখনই। দেশকে বাঁচাতে হবে। বাঁচাতে হবে দেশের যুব সম্প্রদায়কে। হাজারো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আজকের এই বাংলাদেশ। একমাত্র তরুণদের দিয়েই সম্ভব আগামীর আলোকিত বাংলাদেশ গড়া। তাদের ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়েই অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্বাধীনতা ২০২৪।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ তামিনরা ছিল চার ভাই। তার মেজো ভাই রিহান মীর সৈয়দেরখোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র। সেজো ভাই রিয়াদ মীর হরিন্দা মাদরাসায় নাযরানা পড়ছে। ছোট ভাই সিয়াম দক্ষিণবাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২য় শ্রেণীর ছাত্র। ভাইদের মধ্যে তামিনই ছিল বড়। মায়ের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে দাদির নিকটই বড় হয়ে ওঠে। তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছয়। তাদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তার বাবা। তিনি কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তাদের বর্তমান বাড়িটি পাকা কিন্তু অনেক পুরনো। কৃষিকাজ করার জন্য তাদের রয়েছে ১.৫ বিঘা জমি। খুবই অল্প বয়সে এই মেধাবী তরুণের মৃত্যুতে পুরো পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। মায়ের মৃত্যুর পর বাবা ও দাদীর কাছে তারা চার ভাই ছিল বেঁচে থাকার প্রেরণা। তামিন একদিন হাফেজ হবে বাবা ও দাদীর সব আশা আকাঙ্ক্ষাকে শেষ করে তামিন শহীদের অমীয় সুধা পান করেন। তার সব স্মৃতি স্মরণ করেই দিন কাটছে তামিনের পরিবারের।

আন্দোলনের প্রেক্ষিত

তরুনদের কোটা নয় মেধা এই একটি দাবী হয়ে উঠেছিল জুলাই ২৪ এর গণ বিস্ফোরণ। স্বৈরাচার হাসিনা সরকার তরুণদের এই চাওয়াকে গুরুত্বের সাথে নেয়নি। তাদের যৌক্তিক দাবিকে যেভাবে কটাক্ষ করেছিল তাতে টগবগে তরুণদের রক্তে আগুনের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছিল। তখনো ঈদুল আযহার রেশ কাটেনি। ঈদের আনন্দ শেষে মানুষ তার কর্মস্থলে ফিরছে। ছাত্ররা ফিরছে তাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠানে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলছে শিক্ষকদের কর্মবিরতি। শেখ হাসিনা তার ক্ষমতায় এতোটাই অহংকারী হয়ে উঠেছিল শিক্ষকদেরও অসম্মান করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেননি। বলা হয় অহংকারই পতনের মূল। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তার মুখ থেকে তরুণদের উদ্দেশ্যে যে কটাক্ষবাণী তিনি দিয়েছেন তার বিনিময়ে তরুন সমাজ স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত করেছে বাংলাদেশ। শুরু হয় আন্দোলন। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত ঢাবি ক্যাম্পাস। শিক্ষার্থীদের মুখে মুখে; চেয়েছিলাম অধিকার/ হয়ে গেলাম রাজাকার। কে বলেছে কে বলেছে স্বৈরাচার; স্বৈরাচার। ঢাবির শিক্ষার্থীদের পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রের চক্ষুশূল হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে এতোদিনের ফ্যাসিবাদের অস্ত্রকে অকেজো করে ফেলে। মুহূর্তে ভেঙে পড়ে ফ্যাসিবাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ইতিহাস সৃষ্টি করে।

যেভাবে শহীদ হলেন

হাফেজি পড়া একটি ছাত্র জানে শহীদের মর্যাদা কতোটা। যৌক্তিক আন্দোলনে সমর্থন ছিল মাদ্রাসার ছাত্রদের। তামিনও ছিল সমর্থনদের অন্যতম। হরিন্দা পশ্চিম পাড়া আলিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার হাফিজিয়া ছাত্র শিক্ষক সকলেই ১৯ জুলাই শুক্রবার জুমআর নামাযের পর আন্দোলনে যোগ দেয়। শহীদ তামিন হৃদয়ও এই আন্দোলনে ছিল সক্রিয়। সেদিন নরসিংদী জেলার শিবপুর থানার ইটাখোলা পুলিশ ফাঁড়ি এলাকায় আসলে পুলিশ ছাত্র জনতার উপর অতর্কিত হামলা করে। পুলিশের লাঠি, টিয়ারসেল নিক্ষেপের সাথে চলে গুলির বহর। দিকবিদকশূন্য হয়ে সবাই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক এমনই একটা সময়ে পুলিশের গুলি এসে তামিনের বুকে এবং পায়ে বিদ্ধ হয়। সেখানেই তামিন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। মাগরিবের আজানের পর গুলিবিদ্ধ অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখা যায় শহীদ তামিনকে। এশার ওয়াক্ত হয়ে গেলেও যখন তামিন বাড়ি ফিরল না। পরিবারের সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন তাকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছিল না তখন হাসপাতালে খোঁজ নিয়ে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে। প্রিয় সন্তানের মৃতদেহ পেয়ে বাবা বাকরুদ্ধ। কিছুই যেন বলার নেই। কার কাছে অভিযোগ করবে। কারন এতো পুলিশের গুলিতেই শহীদ হয়েছে। নিজ গ্রামে তামিনের জানাজার নামাজ শেষে সামাজিক কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।

এক নজরে শহীদ তামিন হৃদয়

নাম	: তামিন হৃদয়
পেশা	: ছাত্র
পিতা	: তমিজ উদ্দিন মীর
মাতা	: রুমি বেগম
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ০২ আগস্ট ২০০৭। বয়স ১৭ বছর
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: দক্ষিণ সাধারচর, থানা/উপজেলা: শিবপুর, জেলা: নরসিংদী
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার আনুমানিক সন্ধ্যা ৬.৩০টা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
শাহাদাত বরণের স্থান	: ইটাখোলা পুলিশ ফাড়ি শিবপুর, নরসিংদী
দাফন করা হয়	: সামাজিক কবরস্থান, সাধারচর
কবরের জিপিএস লোকেশন	: সামাজিক কবরস্থান, সাধারচর, নরসিংদী
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: ১.৫ বিঘা কৃষি জমি। একটি পাকা বাড়ি যা অনেক পুরোনো
ভাইবোনের বিবরণ	: ৪ ভাই
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৫ জন

শহীদ মোঃ সুজন মিয়া

ক্রমিক: ২৩৭

আইডি: ঢাকা বিভাগ ১০৪

জন্ম পরিচয়

মো: সুজন মিয়া ৬ এপ্রিল ২০০৭ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আবুল কাসেম ও ছালেহা বেগমের পুত্র। তার বাবা সুজনের জন্মের কিছুদিন পরই মারা যান। অর্থনৈতিকভাবে একেবারে নিঃস্ব পরিবারের সন্তান সুজন। তিনি মুনসেফেরচর গ্রাম পুটিয়া ইউনিয়ন শিবপুর থানার নরসিংদী জেলার নাগরিক। জন্মসূত্রে ঠিকানা আছে, কিন্তু তাদের ঘরবাড়ি কিছুই নাই। নানীর বাড়িতে তারা আশ্রিত।

বন্ধুর লাশ আনতে গিয়ে শহীদ হলেন সুজন

১৯ জুলাই ,নরসিংদী জেলার ইটাখোলা হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির সামনে পড়ে থাকে তার বন্ধুর গুলিবিদ্ধ লাশ।

এদিন সারাদেশে সরকার আন্দোলন দমন করতে সশস্ত্র হামলা চালায়। আন্দোলনটি ছিল অহিংস। খালি হাতে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে। নিরস্ত্রই ছিল তারা। নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের দমন করতে সরকার লেলিয়ে দেয় আওয়ামীলীগের সকল সন্ত্রাসীদের। রাজপথে নামায় পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব, সেনাবাহিনী। সরকার মসনদ টিকিয়ে রাখতে মরিয়া। দেশে জারি করে অঘোষিত যুদ্ধ। নিজের দেশের মানুষ মারতে প্রয়োগ করে সেনাবাহিনীর ভারী অস্ত্র। হেলিকপ্টার থেকে গুলি করে খুন করে নাগরিকদের। আহত ও নিহতদের চিকিৎসা কাজে বাঁধা দেয় দলীয় সন্ত্রাসীরা। লাশ দাফনেও বাঁধাগ্রস্থ হয় পরিবার।

১৯ জুলাই আন্দোলনে যোগ দেয় সুজন ও তার বন্ধুরা। সরকারের অনিয়ম,অন্যায়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সর্বশ্রেণীর মানুষ। সুজন একজন লেগুনা ড্রাইভার। দেশের পরিস্থিতি তাকেও ভাবিয়ে তোলে। ছাত্ররা কোটা আন্দোলনের ডাক দেয়। সেই আন্দোলনের পরিবর্তিত রূপ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন। আন্দোলন যখন তুঙ্গে ওঠে সরকার তখন চালায় এক নারকীয় হত্যাযজ্ঞ। সুজনরা রাজপথেই থাকে। থাকতে হয় পেশার তাগিদে। সেখানে নির্মমতা প্রত্যক্ষ করেন। নিরীহ ছাত্রদের বুকে পাষণ্ড পুলিশের গুলি, দলীয় সন্ত্রাসীদের নির্মমতা তাদের ক্ষুব্ধ, বিক্ষুব্ধ করে। আন্দোলনে অংশ নেয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীও। তারা ইটাখোলা হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ি, নরসিংদীর সামনে জড়ো হয়। খালি হাত নিরস্ত্র প্রতিবাদী জনতা। তাদের দমন করতে হাসিনার ঘাতক পুলিশ গুলি ছুঁড়ে মিছিলে। সুজনের বন্ধু গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। রাস্তায় লাশ পড়ে থাকে। হত্যাকারী পুলিশের ভয়ে কেউ লাশ আনতে যায়নি। সুজন তার বন্ধুর লাশ রেখে যেতে পারেনি। সন্ধ্যার সময় অসীম সাহসী সুজন, বন্ধুর লাশ আনতে যায়। বর্বর পুলিশ আবারও গুলি করে। লাশ আনতে যাওয়া একজন নিরীহ মানুষকে গুলি করে পুলিশ নামের আওয়ামী বর্বরেরা। সুজন গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে থাকে। আর কেউ সাহস করেনি লাশ আনতে। রাস্তায় পড়ে থাকে দুই বন্ধুর লাশ। পরে নিকটস্থ সরকারী হাসপাতাল থেকে লাশ হস্তগত হয় পরিবারের। জানাজা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে দাফন করা হয় সুজনকে।

পারিবারিক অবস্থা

চব্বিশের শহীদ মোঃ সুজন মিয়া। জন্মের কিছুদিন পরই মারা যায় তার বাবা। মা তাকে নিয়ে আশ্রয় নেন নানীর বাড়িতে। সুজনদের কোন ঘরবাড়ি নাই। নানীর বাড়িতেই থাকেন।

আবদুল্লাহ নামে তার একটি প্রতিবন্ধী সৎ ভাই আছে। মা অন্যের বাড়িতে কাজ করে। নানী ভিক্ষা করে। সুজনই ছিল একমাত্র উপার্জনক্ষম পুরুষ। নিঃস্ব একটি পরিবারে সেই উপার্জনের মানুষটি শহীদ হলেন। পরিবারটির সামনে আর কোন সহায় রইল না। খুবই দুরাবস্থায় দিন যাচ্ছে তাদের।

প্রতিবেশীর বক্তব্য

মোঃ নুরুল ইসলাম মোঃ সুজন মিয়ার প্রতিবেশীর নানা, তার ভাষ্যমতে সুজন শৈশব থেকেই দুঃখী মানুষ। তার বাবা মারা যাওয়ায় সে ছোট থেকেই দুঃখে কষ্টে জীবন অতিবাহিত করছে। সে স্থানীয় রোডে লেগুনার হেলপারি করত। তারপর চালক হয়েছিল। তার মা মানুষের বাসায় কাজ করে। দুঃখ ও দরিদ্রতা তার নিত্য সঙ্গী। আচার ব্যবহার খুব ভালো ছিল। কারও সাথে উচ্চ কণ্ঠে কথা বলত না। খুব ভদ্র, নম্র ছিল।

প্রস্তাবনা-১: বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।
প্রস্তাবনা-২: এককালীন অনুদান অবশ্যই প্রদান।
প্রস্তাবনা-৩: মাসিক ভাতা তাদের একান্ত আবশ্যক। মা, নানী ও প্রতিবন্ধী ভাইয়ের জীবন যাপনের সুব্যবস্থা করা।

একনজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: মো: সুজন মিয়া
পেশা	: লেগুনা চালক।
জন্ম	: ০৬-০৪-২০০৭ সালে
পিতা	: আবুল কাসেম
মাতা	: ছালেহা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মুনসেফেরচর, ইউনিয়ন: পুটিয়া, থানা: শিবপুর জেলা: নরসিংদী
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: মুনসেফেরচর, ইউনিয়ন: পুটিয়া, থানা: শিবপুর, জেলা: নরসিংদী
সদস্য	: মা, প্রতিবন্ধী এক ভাই ও নানী
কবরস্থান	: পূর্ব সৈয়দ নগর কবরস্থানে তার কবর

শহীদ আনোয়ার মিয়া

ক্রমিক : ২৩৮

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১০৫

পরিচিতি

আনোয়ার মিয়া ১৯৭৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতা আমির হোসেন এবং মাতা মরিয়ম বেগমের সন্তান। আনোয়ার মিয়ার স্থায়ী ঠিকানা শেখেরচর গ্রামে, শিলমান্দি ইউনিয়নের মাধবদি থানায়, নরসিংদী জেলায়। বর্তমানে তিনি একই ঠিকানায় বসবাস করছেন। পেশায় তিনি একজন দর্জি এবং কাপড় ব্যবসায়ী। তাঁর সংসারে দুই ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। মেয়ে বিবাহিত, বড় ছেলে বাবার সাথে ব্যবসায় যুক্ত আছে, এবং ছোট ছেলে পড়াশোনা করছেন। আনোয়ার মিয়া তাদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন, পাশাপাশি পরিবারের ব্যাবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছেন।

সামগ্রিক ঘটনা

৫ আগস্ট হাসিনা পালিয়ে গেলেন লক্ষ্মণ সেনের মতো। তার আগে দেশে ঘটিয়ে গেলেন তাণ্ডব। সারাদেশে তার লেলিয়ে দেওয়া বাহিনী খুন করে নির্বিচারে। কত নিষ্পাপ মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে এদেশের মাটি তার ইয়ত্তা নাই।

২১ জুলাই নরসিংদির মাজার বাসস্ট্যান্ডে হত্যা করা হয় নিরীহ আনোয়ার মিয়াকে। আনোয়ার মিয়াদের রক্ত বৃথা যায়নি। তাদের রক্তের বিনিময়ে আসে ৫ আগস্ট। এদিন বিজয় হয় আন্দোলনকারীদের।

৫ আগস্ট ছিল লং মার্চ টু ঢাকা। ঘেরাও গণভবন। এই কর্মসূচী এগিয়ে আসছে ধাপে ধাপে। জুলাই জুড়েই ছিল আন্দোলন মুখর। আন্দোলনের সূত্রপাত কোটা নিয়ে।

কোটা বিরোধী আন্দোলন হয়ে যায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ছিল একটি অহিংস আন্দোলন। নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার স্লোগানে মুখর ছিল রাজপথ। সরকার এই আন্দোলনকে করলেন রক্তাক্ত। রাজপথ নিরীহ ছাত্রদের তরতাজা রক্তে রঞ্জিত হল। ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করল শত ছাত্রকে। মানুষ নেমে গেলেন রাস্তায়। বুকের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ঢাললেন মিছিলে।

মিছিলে আসলেন কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, কবি, সাংবাদিক সব শ্রেণী পেশার মানুষ। ৪ আগস্ট দেশ মৃত্যুর নগরী হয়ে গেল। ছেলে, বুড়ো, নারী, পুরুষ এখন একস্রোতে। ঢাকা ঘেরাও। সরকার প্রমাদ গুনলেন। কোথাও অবশিষ্ট রইল না সরকারের শক্তি। কেউ ভাবতেই পারেনি একটু পরই পালাবেন সরকার। সরকারের পালিত বাহিনী রাজনীতি, বা জনতার পালস বুঝতে ব্যর্থ হলেন। তারা তখনও খুনি ও স্বৈরাচারের আজ্ঞাবহ।

আগস্টের ৫ তারিখ। আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হাসিনার পতন, গণভবন ঘেরাও। হাসিনা পালিয়ে যায়। তার আগে নির্বিচারে খুন করে এদেশের মানুষকে।

২১ জুলাই যোহরের নামাজ পড়েন আনোয়ার মিয়া। বাসা থেকে বের হন বাজার করতে। বাজার করে ফিরছেন। পথিমধ্যে হাসিনার খুনি বাহিনী তার পথ আগলে ধরে। কাছে ডাকেন কথা শুনতে। আনোয়ার মিয়া সহজ সরল মানুষ। সরল মনেই বিশ্বাস করে হাসিনার গুণ্ডাবাহিনীর বিজিবি ও আওয়ামী সন্ত্রাসীদের। তিনি কাছে আসতেই কোন কথা না শুনে তাকে গুলি করে। সাথে সাথে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আনুমানিক ২ টা ২৫ মিনিটে তিনি মারা যান ছটফট করতে করতে। বাজার করে তার বাসায় ফেরার কথা। দেরী হওয়ায় তাকে ফোন করেন। কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। তাকে পাওয়া যায় সদর হাসপাতালে। তারপর পরিবারের লোকজন বাসায় নিয়ে আসেন তার লাশ। পরদিন জানাজা শেষে তাকে দাফন করা হয় গয়নার গাঁও শাহী ঈদগাহ

কমপ্লেক্স শেখেরচরে।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ আনোয়ার মিয়া দর্জি ছিলেন। সাথে কাপড় বিক্রি করতেন। তার বড় ছেলেও তার সাথে কাজ করতেন। একমাত্র মেয়ে বিবাহিত। ছোট ছেলে পড়াশোনা করে। তার নিজস্ব কোন জায়গা জমি নাই। তার বাড়িও নাই। ছোট একটি দোকানে কাপড় বিক্রি করতেন। নিজেই কাপড় সেলাই করতেন। তার কোন সঞ্চয় নেই বরং ৫ লক্ষ টাকা ঋণ আছে। আনোয়ার মিয়ার মৃত্যুতে তার পরিবার শোকগ্রস্ত ও অর্থনৈতিক সংকটে নিপাতিত।

প্রতিবেশীর বক্তব্য

এনামুল হকের মতে শহীদ আনোয়ার মিয়া একজন সহজ, নম্র ও ভদ্র ছিলেন। তিনি কারো সাথে জোর গলায় কথা বলতেন না। সবসময় হাসি মুখে কথা বলতেন। তিনি চরমোনাই পীরের মুরিদ ছিলেন। অপ্রয়োজনীয় কথা তিনি বলতেন না। ধার্মিক লোক ছিলেন। নামাজ পড়তেন পাঁচ ওয়াক্ত। তার মৃত্যুতে এলাকাবাসী শোকাহত।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য সমূহ

নাম : আনোয়ার মিয়া
জন্ম : ০২-০২-১৯৭৩ সালে
পিতা : আমির হোসেন
মাতা : মরিয়ম বেগম
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: শেখেরচর, ইউনিয়ন: শিলমান্দি, থানা: মাধবদি, জেলা: নরসিংদি
বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম: শেখেরচর, এলাকা: শেখেরচর, থানা: মাধবদি, জেলা: নরসিংদি
পেশায় তিনি দর্জি ও কাপড় ব্যবসায়ী। তার দুই ছেলে, এক মেয়ে
মেয়ে বিবাহিত। বড় ছেলে বাবার সাথে কাজ করেন, ছোট ছেলে পড়াশোনা করেন
আনোয়ার মিয়া শহীদ হন ২১ জুলাই, বিজিবির গুলিতে
তাকে দাফন করা হয় গয়নার গাঁও শাহী ঈদগাহ কমপ্লেক্স শেখেরচরে

প্রস্তাবনা

১. প্রথমেই এককালীন অনুদান দিলে ছেলে ব্যবসা চাঙ্গা করতে পারবে। তার ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করা যায়
২. বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। ছেলেকে পড়ালেখায় সহযোগীতা করা
৩. মাসিক ভাতা দেওয়া যায়

শহীদ আরমান মোল্লা

ক্রমিক : ২৩৯

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১০৬

পরিচয়

শহীদ আরমান মোল্লা। নারায়নগঞ্জের আড়াইহাজারের গোপালদী পৌরসভার কলাগাছিয়া নয়াপাড়া গ্রামে ১৯৮৮ সালের ৩ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ইছব মোল্লা, মাতার নাম জোবেদা আক্তার। আরমান মোল্লা পেশায় একজন ঝালমুড়ি বিক্রেতা ছিলেন। ষাটোর্ধ্ব পিতা- মাতা, স্ত্রী এবং তিন ছেলে- মেয়ের জীবনে তিনি যেন ছিলেন আশার আলো, অভাবের সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি।

শহীদের অর্থনৈতিক অবস্থা

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে শহীদ আরমান মোল্লা একজন ঝালমুড়ি বিক্রেতা ছিলেন। স্বল্প আয়ে পরিবার এর খরচ বহন করা ছিল কষ্টসাধ্য। তারপরও তিনি স্বপ্ন দেখতেন তার ছেলেমেয়েদের তিনি উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করবেন। তার স্বপ্ন ছিল তিনি নিজে জীবনে যা করতে পারেননি, তার ছেলেমেয়ে তা করে দেখাবে, তারা পড়াশোনা শিখে মানুষের মত মানুষ হবে, আর তাইতো তার স্বল্প আয় নিয়েও তিনি তার বড় মেয়েকে দারুত তাওহীদ সালফিয়া মাদরাসায় হিফজ করতে দিয়েছিলেন, আর একমাত্র ছেলেকে একই মাদরাসায় প্রথম শ্রেনীতে ভর্তি করিয়েছিলেন।

পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যুতে পরিবারটি এখন দিগভ্রান্ত এর মত হয়ে পড়েছে, নিজস্ব বাড়িঘর নেই। শহীদের স্ত্রীর কাজ করার মত শারিরীক সক্ষমতা নেই তার সন্তানদের ভবিষ্যত এখন অন্ধকারের মুখে।

বর্তমানে শহীদের স্ত্রী তার সন্তানদের নিয়ে নরসিংদীর মাধবদীতে নিজ বাবার বাড়িতে অবস্থান করছেন। আরমান মোল্লার শ্বশুর আপাতত তার পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। গুলি লাগা স্বামীর নিথর দেহের চিত্র বারবার স্ত্রীর চোখের সামনে ভেসে উঠছে। তিন বছরের শিশু কন্যা আফরা মনি বাবাকে বেশিদিন কাছে পেলনা। ছোট ছোট তিনটি সন্তান বাবাকে ভুলতে পারছেনা, কেঁদেই যাচ্ছে। তাদের মা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত।

শহীদী মৃত্যুর প্রেক্ষাপট

২১ জুলাই, ২০২৪। দিনটা ছিল রবিবার। ঘড়িতে সময় দুপুর ১ ২টা বেজে ৩০ মিনিট। ব্যক্তিগত কাজে শেখেরচর ইউনিয়ন পরিষদে যান আরমান মোল্লা। ইউনিয়ন পরিষদের কাছাকাছি গেলে পুলিশ অতর্কিত হামলা চালায়।

বলে রাখা ভালো, দেশের পরিস্থিতি তখন একদম ভালো না। বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের নেতৃত্বে তখন সারা দেশে চলছে তুমুল আন্দোলন। সরকারের নির্দেশে সারাদেশে ইন্টারনেট সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। দেশের কোথায় কি হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে জানার উপায় নেই। এছাড়া ফ্যাসিস্ট সরকারের নির্দেশে পুলিশবাহিনী পাখির মত মানুষ মারছে। এমনই এক পাখি ছিল আরমান মোল্লা। সে কিছু বুঝে উঠার আগেই হঠাৎ করে পুলিশের একটি গুলি তার বুকে এসে লাগে, পিঠ ভেদ করে বের হয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই

কিছুক্ষণের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন তিনি যদিও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে তার মৃতদেহ নিজ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়।

শহীদ আরমান মোল্লা তার নিজ বাড়ি নারায়নগঞ্জের আড়াইহাজারের গোপালদী পৌরসভার কলাগাছিয়া নয়াপাড়া গ্রামে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন।

প্রস্তাবনা

শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান ও নিয়মিত মাসিক ভাতা প্রদান।

২. শহীদের সন্তানদের ভবিষ্যতের সব দায়িত্ব গ্রহণ করা।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য সমূহ

পুরো নাম	: আরমান মোল্লা
জন্মতারিখ	: ০৩/০৭/১৯৮৮
পেশা	: ঝালমুড়ি বিক্রেতা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: কলাগাছিয়া নয়াপাড়া, ইউনিয়ন: গোপালদী পৌরসভা, থানা: আড়াইহাজার , জেলা: নারায়নগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: চোয়ার বড়টেক, এলাকা: মেহেরপাড়া, থানা: মাধবদী, জেলা: নরসিংদী
পিতার নাম	: ইছব মোল্লা, বয়স: ৭০
মাতার নাম	: জোবেদা আক্তার, বয়স: ৬০
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৬ জন
ছেলে মেয়ের সংখ্যা- ৩ জন	: ১. মাহী আক্তার, বয়স: ১০, পেশা: শিক্ষার্থী
	২. রাফি, বয়স: ৭, পেশা: শিক্ষার্থী
	৩. আফরা মনি, বয়স: ৩
ঘটনার স্থান	: ইউনিয়ন পরিষদ, শেখেরচর
আক্রমনকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল	: তারিখ: ২১/০৭/২০২৪ , সময়: দুপুর - ১২:৩০
মৃত্যুর তারিখ ও সময় স্থান	: ২১/০৭/২৪ , ঘটনাস্থলে দুপুর: ১২:৩৫
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: নিজ গ্রাম কলাগাছিয়া নয়াপাড়ায়

শহীদ মোঃ রাসেল মিয়া

ক্রমিক : ২৪০

আইডি : ঢাকা বিভাগ-১০৮

জন্ম ও শৈশব

চারদিকে দিগন্ত বিস্তৃত বিস্তীর্ণ মাঠ, মাঝখানে সবুজ দ্বীপের মতো চোখ জুড়ানো গ্রাম। প্রভাত-কাকলির মধ্যে প্রতিদিন উঠে আসে রক্তিম সূর্য। গরু-চরা মাঠ এবং প্রশস্ত আকাশ পূর্ণ করে বাজতে থাকে রাখালিয়া বাঁশি। প্রাকৃতিক প্রাচুর্যে ভরা এমনই এক গ্রাম দুলালকান্দি। এই গ্রামেই ১৯৯২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর মোঃ হাসান আলী ও মাতা মোছাঃ আছিয়া বেগমের কোল আলো করে করে পৃথিবীতে আসেন শহীদ মোঃ রাসেল মিয়া। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ব্রহ্মপুত্র নদ গিয়ে মিশেছে আশুগঞ্জের কাছে মেঘনা নদীর মোহনায়। এখানেই দুরন্ত শৈশব কেটেছে তাঁর। গ্রামের পাশে একটি বিদ্যালয়ের হাতেখড়ির পর দুলালকান্দি দাখিল মাদ্রাসায় ভর্তি হন তিনি। সেখান থেকে দাখিল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে, পরবর্তীতে স্থানীয় একটি কলেজে ভর্তি হন তিনি। এরপর কর্মের তাগিদে চলে আসেন রাজধানী ঢাকায়।

অকুতোভয় রাসেলের আসীম আত্মত্যাগ

২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু প্রথম দফার আন্দোলনের পর আন্দোলনে দ্বিতীয় দফার ঢেউ লাগে ২০২৪ সালের ৫ই জুন থেকে। এদিন ২০১৮ সালের ৪ই অক্টোবর কোটা বাতিল করে জারি করা সরকারি পরিপত্র অবৈধ বলে ঘোষণা করে রায় দেয় হাইকোর্ট। এরপর থেকে পুরো জুন জুড়েই হাইকোর্টের বাতিলকৃত পরিপত্র বাতিল ও সরকারি চাকরিতে মেধাভিত্তিক নিয়োগ বহাল রাখার দাবি ছড়িয়ে পড়ে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি মানতে সরকারকে ৩০ জুন পর্যন্ত সময় বেঁধে দেন। এই সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে সর্বাত্মক আন্দোলনের ঘোষণা দেন তারা। ১৬ জুলাই থেকে বিক্ষোভ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। দিনভর দেশজুড়ে চলে ব্যাপক বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ। সেদিন চট্টগ্রামে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাথী ফয়সাল মাহমুদ শান্ত ও রংপুরের আবু সাঈদের মৃত্যু আন্দোলনে নতুন গতি সঞ্চার করে। ১৯ জুলাই কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা 'কমপ্লিট শাটডাউন' বা সর্বাত্মক অবরোধের কর্মসূচি ঘোষণা করে। ১৯ জুলাই ২০২৪ রোজ শুক্রবার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ছাত্র-জনতার শান্তিপূর্ণ অবস্থানের উপর দেশের বিভিন্ন জায়গায় স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের পুলিশ বাহিনী গুলিবর্ষণ করে। রাসেল মিয়া ১৯ জুলাই সকালের খাবার খাওয়ার পর আন্দোলনে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হন। তিনি ছাত্র-জনতার সাথে ঢাকার রামপুরায় অবস্থান নেন। ছাত্রদের অবস্থানের অদূরে রামপুরা ব্রিজের কাছেই পূর্বদিকে স্বৈরাচারের পুলিশ ও বিজিবি অবস্থান নেয়। আনুমানিক দুপুর ২ টায় অবস্থানরত নিরস্ত্র মুক্তিকামী ছাত্র-জনতার উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ শুরু করে ঘাতক বাহিনী। ছাত্রজনতা জীবন বাঁচাতে এদিক সেদিক ছোটাছুটি করে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে থাকে। রাসেল মিয়াও তাদের মধ্যে ছিলো। হঠাৎ একটি গুলি এসে সাহসী রাসেলের পায়ে লাগে এবং তিনি মাটিতে বসে পড়ে। অহত অবস্থায় নিরাপদ স্থানে যাওয়ার চেষ্টা করলেও, মুহূর্তেই আরেকটি গুলি এসে লাগে তাঁর বুকের বাম পাশে। এবার মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন তিনি। পুলিশ আর বিজিবির নির্বিচার গুলির মধ্যে কেউ তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছিল না। বেশ কিছুক্ষণ পর যৌথবাহিনী সরে গেলে পথচারীরা তাকে উদ্ধার করে মুগদা মেডিকেলে নিয়ে যায়। ততক্ষণে অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে, শহীদের খাতায় এভাবেই নাম লেখালেন মো: রাসেল মিয়া। হয়তো পৃথিবীর সাময়িক যাত্রা শেষ হলো তাঁর, তবে তিনি রয়ে গেলেন অনন্তকালের ইতিহাসে।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের স্মৃতিচারণ

শহীদ মোহাম্মদ রাসেল মিয়া সম্পর্কে তাঁর মামা সাইদুল হক বলেন, "আমার ভাগ্নে ছোট থেকেই সরল প্রকৃতির। কখনো কারো সাথে কোন ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হতো না সে। কর্মসূত্রে দীর্ঘ ৭-৮ বছর ধরে ঢাকাতে বসবাস করছে সে, সেখানে এবার মাল্টিমিডিয়া রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে কর্মরত সে। একমাত্র স্ত্রী মুক্তাকে নিয়ে সেখানেই থাকতো তাঁরা। ঈদের ছুটি ছাড়া তেমন গ্রামে আসার সুযোগ হয়তো না তাঁদের।"

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা

শহীদ মোঃ রাসেল মিয়া মূলত তাঁর পিতার দ্বিতীয় স্ত্রী আছিয়া বেগমের সন্তান। আছিয়ার সংসারে সে ছাড়াও তাঁর আরো দুই সহোদর বোন রয়েছে। এর মধ্যে বড় বোন শেফালী কামরুন্নাহার আর ছোট বোন হাসনাত রেহেনা। হাসনাত রেহেনার বিবাহ বিচ্ছেদের পর, একমাত্র কন্যা সন্তানকে নিয়ে ঢাকায় একটি ছোট্ট ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা তিনি। সে পরিবারেও নিয়মিত আর্থিক সহায়তা করতো মো: রাসেল মিয়া। আবার আছিয়া বেগমের ভরণপোষণের দায়িত্ব ছিল, তার পৌঢ় বয়সের সম্বল একমাত্র পুত্র সন্তানের ওপর। তাই শহীদ মো: রাসেল মিয়াকে হারিয়ে দিশেহারা অসহায় শহীদ জননী।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Death Registration Certificate

শহীদ মোঃ রাসেল মিয়ার ব্যক্তিগত তথ্যসমূহ

নাম : মো: রাসেল মিয়া
জন্ম তারিখ : ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২
পেশা বা পদবী : চাকুরীজীবী

ঠিকানা সংক্রান্ত তথ্য

স্থায়ী ঠিকানা ও বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম: দুলালকান্দি, ইউনিয়ন: নারায়ণপুর, উপজেলা: বেলাবো, জেলা: নরসিংদী
পিতার নাম : মুক্তিযোদ্ধা মো: হাসেন আলী
পেশা ও বয়স : কৃষি, ৮৪ বছর
মাতার নাম : মোছা: আছিয়া বেগম
মাতার পেশা ও বয়স : গৃহিণী, ৬৫ বছর
স্ত্রীর নাম : মোছা: মুক্তা
স্ত্রীর পেশা ও বয়স : গৃহিনী, ২৮ বছর
পরিবারের মাসিক আয় : শহীদের অবর্তমানে পরিবারের কোন আয় নেই। তাই চরম অসহায়ত্বে পড়েছে তাঁর মা ও স্ত্রী। কারণ তাঁর পিতা প্রথম স্ত্রী মোছা: ফাতেমার সংসারের ভরনপোষণ করেন।
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ৪ জন

পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও শহীদের সাথে তাঁদের সম্পর্ক

নাম : মোছা: হাসনাত রেহেনা, শহীদের বোন
পেশা ও বয়স : ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ৩০ বছর
নাম : মোছা: মরিয়ম, শহীদের ভাগ্নী
পেশা ও বয়স : শিক্ষার্থী, ১৪ বছর
আহত হওয়ার সময়কাল : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪, সময় আনুমানিক ২টা বেজে ১৫ মিনিট
আহত হওয়ার স্থান : রামপুরা ফ্লাইওভারের নিচে
আক্রমণকারীর পরিচয় : স্বৈরাচারী হাসিনার পুলিশ ও বিজিবি
নিহত হওয়ার সময়কাল : ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, সময় আনুমানিক ২টা বেজে ৪৫ মিনিট
নিহত হওয়ার স্থান : রামপুরা, ঢাকা
শহীদের কবরের অবস্থান : দুলালকান্দি পারিবারিক কবরস্থান, বেলাবো, নরসিংদী
জিপিএস লোকেশন : 24°04'04.7"N 90°52'59.9"E

পরিবারটির সহযোগিতা প্রসঙ্গে

শহীদ আয়ের ওপর নির্ভরশীল তাঁর মা ও স্ত্রীকে এককালীন অর্থ ও স্থায়ী কোন সহযোগিতা করা অত্যন্ত জরুরী

শহীদ মো: লাল মিয়া

ক্রমিক : ২৪১

আইডি : ঢাকা বিভাগ-১০৯

জন্ম পরিচয়

মো. লাল মিয়া, জন্ম ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮০। টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর থানার মাঝিরা গ্রামের নিবাসী এই মানুষটি পেশায় পোল্ট্রি ব্যবসায়ী। জীবনের প্রতিটি ধাপে সংগ্রাম, ছোট্ট মুরগির দোকানের আয় দিয়ে অভাবের সংসার চালান তিনি। পিতা মৃত জুলহাস মিয়ার রেখে যাওয়া সংসারের হাল ধরেছেন। মা, আম্বিয়া বেগম, বৃদ্ধা, তার সংসারে যেন নীরব সাক্ষী হয়ে আছেন।

দিন এনে দিন খাওয়া মানুষ লাল মিয়ার মনে সমাজের প্রতি অগাধ ভালোবাসা। অভাব-অনটনের মধ্যেও তিনি গ্রামের প্রতিটি মানুষের পাশে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন। গ্রামের সবুজ মাঠে তার নিয়মিত পদচারণা যেন প্রকৃতির সঙ্গে তার অটুট সম্পর্কের প্রতীক। সেই চির সবুজ মাঠই যেন তার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় আশ্রয়। গ্রামের প্রতিটি গাছ, প্রতিটি ধূলিকণা তাকে ভালোবাসার বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। তিনি জানেন, এই মাটির সঙ্গেই তার জীবনের রচনা। সাধারণ মানুষের জীবনে অসাধারণ গল্প থাকে। লাল মিয়ার জীবনের গল্প তেমনই। যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি এগিয়ে চলেছেন, তা জীবনের প্রতি তার অদম্য ভালোবাসা এবং সমাজের প্রতি তার গভীর মমতারই প্রতিচ্ছবি।

শহীদ পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ মোঃ লাল মিয়ার পরিবার এখন চরম দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন। আবাদযোগ্য কৃষি জমির অভাবে, তিনি বিভিন্ন গ্রাম থেকে মুরগি ক্রয় করে ঢাকার বাজারে বিক্রি করতেন। এই সামান্য আয়ের মাধ্যমেই তিনি তাঁর ৬ সদস্যের পরিবারের ভরণ-পোষণ করতেন। কিন্তু তাঁর শাহাদাতের পর, পুরো পরিবার যেন এক অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেছে।

লাল মিয়ার স্ত্রী আলপনা এখন দুই মেয়ে, এক ছেলে এবং ৭০ বছরের বৃদ্ধ শাশুড়িকে নিয়ে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি। একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মৃত্যু তাদের জীবন থেকে সমস্ত নির্ভরতা কেড়ে নিয়েছে। আলপনা শারীরিকভাবে অসুস্থ, তাই পরিবারের দায়িত্ব পালন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বৃদ্ধা শাশুড়ি একা হয়ে গেছেন, তাঁকে দেখাশোনা করার কেউ নেই। সন্তানদের ভবিষ্যৎও আজ অনিশ্চিত। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে প্রতিদিনের খাবারও যেন দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। একদিকে সন্তানেরা ক্ষুধার্ত, অন্যদিকে বৃদ্ধা মায়ের দুঃসহ কষ্ট; সবকিছু মিলিয়ে আলপনার জীবনে যেন এক অমানিশার অন্ধকার নেমে এসেছে। তাদের এই দুর্দশা কারো সহানুভূতি না পেলে খুব শিগগিরই হয়তো বেঁচে থাকা দুরূহ হয়ে পড়বে।

শহীদ লাল মিয়া সম্পকে অনুভতি: শহীদ লাল মিয়াকে ঘিরে যে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বিরাজমান, তা কেবল তার পরিবার বা বন্ধুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং ছড়িয়ে পড়েছে এলাকাবাসীর হৃদয়ে। লাল মিয়া ছিলেন এক শান্ত, সদালাপী ও পরিশ্রমী, যার প্রতিটি কাজ এবং আচরণ তাকে সবার কাছে প্রিয় করে তুলেছিল। পরিবারের প্রতি তার দায়বদ্ধতা এবং সবার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তাকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ছোট্ট একটি ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করলেও, লাল মিয়া সবসময়ই বৃহত্তর কল্যাণ এবং সামাজিক ন্যায়ের প্রতি নিজের দায়িত্ব অনুভব করতেন। এই দায়িত্ববোধ থেকেই তিনি কোটা সংস্কার আন্দোলনে অংশ নেন, যার কারণে তার জীবন থমকে গেল। কিন্তু তার আত্মত্যাগ একদিকে যেমন পরিবারকে শোকাহত করেছে, অন্যদিকে অনুপ্রাণিত করেছে সমাজকে। পরিবারের এই গভীর শোকের মাঝে লাল মিয়ার আত্মত্যাগের মূল্য তাদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে।

লাল মিয়ার বন্ধুরা স্মরণ করে বলেছেন, তিনি ছিলেন এক আদর্শবান মানুষ, যার মূল্যবোধ এবং কাজকর্ম সকলকে অনুপ্রাণিত করেছে। তার এই শাহাদাত শুধু তাদের ব্যক্তিগত জীবনে নয়, বরং তাদের নৈতিকতাকেও দৃঢ় করেছে। এলাকার মানুষের চোখে লাল মিয়ার আত্মত্যাগ দেশের জন্য এক মহান ত্যাগ। তাদের বিশ্বাস, লাল মিয়ার মতো বীর সমাজের পরিবর্তনের সূচনা করেন। তাদের সাহসিকতা এবং আত্মত্যাগ সমাজকে একটি নতুন দিকনির্দেশনা দেয়। মধ্যবয়স্ক লাল মিয়ার প্রতিবেশী, গভীর শ্রদ্ধায় বলেন, "লাল মিয়া নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন, এবং সকলকে নামাযে ডাকতেন। তিনি শান্ত, ভদ্র এবং সহযোগিতাপূর্ণ ছিলেন। কখনো কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করতেন না। লাল মিয়ার মৃত্যুতে এলাকাবাসী যেমন শোকাহত, তেমনি তার এই আত্মত্যাগে তারা গর্বিত। তারা মনে করে, লাল মিয়ার মতো সাহসী ত্যাগেই সমাজে সত্যিকার পরিবর্তন আসে, আর তাদের এই বলিদানই ভবিষ্যতের আলো হয়ে জ্বলবে।

যেভাবে শহীদ হলেন

শহীদ মোঃ লাল মিয়ার জীবন ছিল সংগ্রামের প্রতীক। যার শেষ অধ্যায়টি লেখা হলো এক নির্মম বিদায়ে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন যখন দেশে বিক্ষোভের আগুন জ্বালালো, লাল মিয়া তাতে শরিক হন শুধুমাত্র একজন ব্যবসায়ী হিসেবে নয়, বরং একজন ন্যায়পরায়ণ নাগরিক হিসেবে। দুর্নীতি, অপশাসন, গুম-খুনের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ ছিল বলিষ্ঠ। তিনি স্বাধীন দেশের জন্য লড়াই করেছিলেন, অথচ স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ বুঝে ওঠার আগেই তাঁকে এই পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নিতে হলো। ২০২৪ সালের ৪ঠা আগস্ট, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অসহযোগ কর্মসূচি চলছিল দেশব্যাপী। সাভারের বাইপাইল মোড়ে আন্দোলনকারীরা যখন প্রতিরোধের বুলন্দ আওয়াজ তুলছিল, তখন লাল মিয়া তাঁর দৈনন্দিন দায়িত্ব পালন করে ঢাকার বাজার থেকে মুরগি বিক্রি শেষে টাঙ্গাইলের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। কিন্তু দূরপাল্লার বাস বন্ধ থাকায় পায়ে হেঁটে বাইপাইল মোড়ে পৌঁছালে, হঠাৎ করেই পরিস্থিতি পাল্টে যায়। পুলিশের এলোপাতাড়ি গুলির শব্দে মুহূর্তেই সবকিছু থমকে যায়। লাল মিয়া তখন বুঝতে পারেননি, এটাই হবে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত।

বিকাল ৪টার দিকে একটি গুলি তাঁর তলপেটে আঘাত করলে তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সবুজ ঘাস রঞ্জিত হলো লাল রক্তে। সেখানকার স্থানীয় লোকজন তাকে তৎক্ষণাৎ সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা অন্য কিছু ছিল। দুইদিন পর, ৬ আগস্ট ২০২৪ সালে বিকাল ৫টায়, তিনি চিকিৎসাধীন। অবস্থায় পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেন। লাল মিয়ার মৃত্যু শুধু তাঁর পরিবারের জন্য নয় বরং পুরো জাতির জন্য এক অশ্রুসিক্ত বেদনার গল্প। যাঁর কণ্ঠস্বর ছিল দুর্নীতি, গুম, এবং হত্যার বিরুদ্ধে, যিনি ছিলেন এক দফা আন্দোলনের এক বলিষ্ঠ সৈনিক, সেই কণ্ঠস্বর আজ চিরতরে নীরব হয়ে গেছে। এই নীরবতা এক অশুভ সময়ের প্রতীক, যেখানে স্বপ্ন দেখার আগেই স্বপ্নচুর্ণ হলো, যেখানে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে চাওয়া মানুষটিও আর ফিরলো না তাঁর গ্রামে। লাল মিয়ার মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রী আলপনা, দুই মেয়ে, এক ছেলে এবং বৃদ্ধা মায়ের জীবনে যেন এক গভীর শূন্যতার সৃষ্টি হলো। তিনি বেঁচে থাকলে হয়তো দেশের দুর্নীতির অন্ধকারেও আলোর দ্বীপ জ্বালাতে পারতেন, কিন্তু তিনি শহীদের মর্যাদা নিয়ে অমর হয়ে থাকলেন ইতিহাসের পাতায়।

এক নজরে শহীদ মো: লাল মিয়া

নাম	: মো: লাল মিয়া
জন্মসাল	: ০৭-০২-১৯৮০
পেশা	: পোল্ট্রী ব্যবসায়ী
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: মাঝিরা, ইউনিয়ন: মাঝিরা, থানা: মধুপুর, জেলা: টাঙ্গাইল
পিতার নাম	: মৃত জুলহাস মিয়া
মাতার নাম	: আম্বিয়া বেগম, বৃদ্ধা
মাসিক আয়	: ১০০০০/-
আয়ের উৎস	: মুরগীর দোকান
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ০৫
ছেলেমেয়ের সংখ্যা	: ০৩
	১) লামিয়া আক্তার, বয়স: ২০ বছর, বিবাহিতা, সম্পর্ক-মেয়ে
	২) ননিয়া আক্তার, বয়স: ১৫, শিক্ষার্থী-হেদায়া, সম্পর্ক-মেয়ে
	৩) মো: আহাদ, বয়স: ১২, শিক্ষার্থী-নূরানী, সম্পর্ক-ছেলে
ঘটনার স্থান	: সাভার বাইপাইল মোড়
আক্রমণকারী	: ঘাতক পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল	: তারিখ: ০৪ আগস্ট ২০২৪, বিকাল ০৪ টা
নিহত হওয়ার সময়কাল	: ০৬ আগস্ট ২০২৪ বিকাল ৫ টা, এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
কবরস্থান	: পারিবারিক কবরস্থান, টাঙাইল

প্রস্তাবনা

১. ছোট ছেলে-মেয়ের লেখা-পড়ার খরচ এবং বৃদ্ধা মায়ের ভরণ পোষণ যোগানে সহযোগিতা করা যেতে পারে

শহীদ মারুফ মিয়া

ক্রমিক : ২৪২

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১১০

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মারুফ মিয়া। পিতা মজনু মিয়া ও মাতা মোরশেদা বেগম। টাঙ্গাইল জেলার সদর উপজেলার সাবালিয়া মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন শহীদ মারুফ মিয়া। প্রবাসী বাবার একমাত্র পুত্র সন্তান। বাবা সৌদি প্রবাসী হওয়ায় টাঙ্গাইলের নিজ বাড়িতে মা এবং ছোট বোন সানজিদাকে নিয়ে বসবাস করতেন দশম শ্রেণির দুরন্ত কিশোর শহীদ মারুফ।

শাহাদাতের ঘটনা

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জুলাই মাস জুড়ে চলা বিভিন্ন কর্মসূচির প্রতি সংহতি জানিয়ে দেশের আপামর ছাত্র জনতা বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদের মাধ্যমে স্বৈরাচারী সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পুলিশ-র‍্যাব-বিজিবির নির্বিচার গুলিবর্ষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এমন পরিস্থিতিতে আগস্ট মাসের ৫ তারিখে মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এই কর্মসূচিকে পেশিশক্তি দ্বারা প্রতিহত করতে চাইলে ছাত্র-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের মুখে স্বৈরাচারী খুনি হাসিনা দেশ থেকে পালাতে বাধ্য হয়। সারাদেশের মানুষ আনন্দে ফেটে পড়ে এবং বিভিন্ন জায়গায় মিষ্টি বিতরণ ও আনন্দ মিছিল হয়।

এমনই একটি আনন্দ মিছিলে টাঙ্গাইলের সাবালিয়া মদের মোড় এলাকায় যোগ দেন শহীদ মারুফ মিয়া। বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে মদের মোড় এলাকার আয়শা খানম ক্লিনিকের সামনে পৌঁছালে স্বৈরাচারের সহযোগী পুলিশ এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ শুরু করে। একটি গুলি এসে আঘাত করে কিশোর শহীদ মারুফের ডান কানে। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন মারুফ। গুলিবিদ্ধ শহীদ মারুফকে টাঙ্গাইল সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শহীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

নাম	: মারুফ মিয়া
পেশা	: দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী, শাহিন স্কুল টাঙ্গাইল
পিতা	: মজনু মিয়া
পেশা	: সৌদিপ্রবাসী
মাতা	: মোরশেদা বেগম
ভাই-বোন	: এক ভাই, এক বোন
অবস্থান	: বড়
স্থায়ী ঠিকানা	: সাবালিয়া, টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল
শহীদ হওয়ার স্থান	: সাবালিয়া মদের মোড়, আয়শা খানম ক্লিনিকের সামনে
শহীদ হওয়ার সময়	: ৫ আগস্ট বিকেল সাড়ে পাঁচটা
আঘাতের ধরন	: পুলিশের বুলেট ডান কানে আঘাত করে

প্রস্তাবনা

আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন নেই, তবে পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা দরকার।

নিউজ লিংক

১. https://www.somoynews.tv/news/2024-09-22/w5OuJLKO
২. https://www.asiantvonline.com/news/27878/5650-20240819
৩. https://dailyinqilab.com/bangladesh/news/678155
৪. https://front.kalerkantho.com/online/national/2024/09/13/1425064

শহীদ একরামুল হক সাজিদ

ক্রমিক : ২৪৩

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১১১

শহীদ পরিচিতি

জন্ম ১৯৯৯ সালের ১ মার্চ। পৈতৃক নিবাস টাঙ্গাইল জেলার বানিয়া জান ইউনিয়নের ধনবাড়ী থানার বিল কুকড়ি গ্রামে। অবসরপ্রাপ্ত বিমানবাহিনী কর্মকর্তা জিয়াউল হক এবং লিপি বেগম দম্পতির এক পুত্র এবং এক কন্যা সন্তানের মধ্যে শহীদ সাজিদ দ্বিতীয়। মেধাবী শিক্ষার্থী শহীদ সাজিদ ঢাকার বিএএফ শাহীন কলেজ থেকে ২০১৬ সালে এসএসসি, ২০১৮ সালে আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। পরে ভর্তি হন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে।

যেমন ছিলেন শহীদ সাজিদ

ছোটকাল থেকেই মেধাবী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী একরামুল হক সাজিদ (২৫) টিউশনি করে চলতেন। বহুদিন থেকে তাঁর ইচ্ছা ছিল, নিজের টাকায় তাঁর সব আত্মীয়স্বজনকে একদিন টাঙ্গাইলের গ্রামের বাড়িতে দাওয়াত করে খাওয়াবেন। সে কথা বলেছিলেন বাবা জিয়াউল হককে। বলেছিলেন স্বজনদের তালিকা করতে। তালিকা করেও

ফেলেছিলেন জিয়াউল হক। তারিখ ঠিক করে গ্রামে আসতে চেয়েছিলেন সাজিদ। আজ বৃহস্পতিবার স্বজনদের প্রায় সবাই এসেছিলেন সাজিদের গ্রামের বাড়িতে। তবে দাওয়াত খেতে নয়, তাঁরা চোখের জলে চিরবিদায় জানালেন সাজিদকে।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শুরু থেকেই আন্দোলনের মাঠে সক্রিয় ছিলেন শহীদ সাজিদ। ৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে ঢাকার মিরপুর ১০ নম্বর গোল চত্বর এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করেন। বিকেল সাড়ে চারটার দিকে পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি উক্ত কর্মসূচিতে ভারী আগ্নেয়াস্ত্র স্নাইপার দিয়ে গুলি বর্ষণ করলে গুলিবিদ্ধ হন সাজিদ। মাথার পেছনে গুলি লেগে ডান চোখ দিয়ে বের হয়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) নেওয়ার পর ওই রাতেই তাঁর অস্ত্রোপচার হয়। তারপর ১০ দিনেও আর জ্ঞান ফেরেনি। ১৪ই আগস্ট বুধবার দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে তিনি মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনের সফর শেষ করেন। ঢাকা সিএমএইচ ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জানাজা শেষে গ্রামের বাড়িতে তাঁর মরদেহ দাফন করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে মন্তব্য

সাজিদের মামা আবদুর রাজ্জাক বলেন, 'গ্রামে এসে আমাদের সবাইকে দাওয়াত করে এনে সাজিদ খাওয়াতে চেয়েছিল। সে গ্রামে এল, আমরাও ওদের বাড়িতে আসলাম। কিন্তু দাওয়াত খেতে নয়, তাকে চিরবিদায় জানাতে।'

হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শামসুন নাহার বলেন, 'সাজিদ আমার সরাসরি ছাত্র ছিল। ক্লাসেও খুব সক্রিয় ছিল। নতুন বাংলাদেশ গঠনে সে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেবে, তা অনুমেয় ছিল। আজ সাজিদ বেঁচে থাকলে পরীক্ষা দিতে আসত। তাই তাকে স্মরণ করেই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এই উদ্যোগ নেওয়া। সাজিদকে আমাদের বিভাগ আজীবন মনে রাখবে।'

সাজিদের সহপাঠীরা জানান, 'সাজিদ দেশের জন্য জীবন দিয়েছে। এটা আমাদের বিভাগের জন্য গৌরবের। আমরা সাজিদের স্মরণে আজ তার আসনে ফুল ও পতাকা রেখেছি। কিন্তু আমরা চাই সাজিদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কিছু করা হোক। আমাদের নতুন একাডেমিক ভবন সাধারণ শিক্ষার্থীরা সাজিদের নামে করেছে। আমরা চাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই নামকরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করুক, যাতে এই নাম কেউ মুছে ফেলতে না পারে।'

এক নজরে শহীদ সাজিদ

নাম	: শহীদ একরামুল হক সাজিদ
পিতা	: জিয়াউল হক
মাতা	: লিপি বেগম
ভাই-বোন	: এক ভাই, এক বোন
অবস্থান	: ভাই-বোনের মধ্যে দ্বিতীয়
স্থায়ী ঠিকানা	: বিল কুকড়ি, বানিয়াজান, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল
শাহাদাতের স্থান	: সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ)
শাহাদাতের তারিখ	: ৪ আগস্ট আহত হয়ে হাসপাতালে, চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু ১৪ আগস্ট ২০২৪
আঘাতের ধরন	: ভারী আগ্নেয়াস্ত্র স্নাইপারের বুলেটের আঘাত
প্রস্তবনা	: মাসিক অথবা এককালীন সহযোগিতা প্রদান করা

নিউজ লিংক

১. https://www.rtvonline.com/others/education/292376/
২. https://thedailycampus.com/public-university/153994/
৩. https://www.bhorerkagoj.com/national/729738
৪. https://www.facebook.com/jagannath.uni.bd/videos/
৫. https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/e28rup56pz

শহীদ মোহাম্মদ ইমন

ক্রমিক : ২৪৪

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১১২

শহীদ পরিচিতি

শহীদ ইমন টাঙ্গাইল জেলার নলিন বাজার ইউনিয়নের গোপালপুর থানার নলিন গ্রামে ২০০৩ সালের ১২ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তিন ভাই এবং এক বোনের মধ্যে শহীদ ইমন সবার বড়। তার বয়স যখন মাত্র ১২ বছর, তখন তার বাবা মো: জুলহাস মিয়া মৃত্যুবরণ করেন। ফলে চার সন্তানকে নিয়ে ইমনের মা অসহায় অবস্থায় পড়েন এবং তার নানার বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইমনের মা অন্যের বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কাজ করে এবং তার নানার সহায়তায় কোনো রকমে জীবনযাপন করেছেন তার চার সন্তানকে নিয়ে। খুব ছোট বয়সে বাবাকে হারিয়ে দারিদ্রের কষাঘাতে পড়া ইমন খুব কষ্ট করে পড়াশোনা চালিয়ে যান। হেমনগর বেসরকারি কলেজে অনার্স প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত অবস্থায় টিউশনি করে নিজের পড়াশোনার খরচ চালানোর পাশাপাশি পরিবারের খরচেও কিছুটা সহায়তা করতেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

বিগত ৪ঠা আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে স্বৈরাচারী হাসিনা সরকার কর্তৃক শিক্ষার্থীদের ওপর অন্যায় বলপ্রয়োগের প্রতিবাদে সারাদেশে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। উক্ত কর্মসূচির অংশ হিসেবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মী ও সাধারণ জনতার সাথে শহীদ ইমনও মির্জাপুর বাস স্ট্যান্ডে অবস্থান গ্রহণ করেন। বিকাল চারটার দিকে উক্ত কর্মসূচিতে পুলিশ নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে।

একটি গুলি শহীদ ইমনের ডান পায়ের উরুতে এসে লাগে। গুলির আঘাতে সাথে সাথেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন শহীদ ইমন। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন ভাই শহীদ ইমনকে সাথে নিয়ে মির্জাপুর সদর হাসপাতালে যাওয়ার পথে পুলিশ বাধা প্রদান করে এবং শহীদ ইমনকে ছিনিয়ে নিয়ে বেদম প্রহার করে। স্বৈরাচারের দোসর পুলিশ বন্দুকের নল দিয়ে গুলি লাগার স্থানে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আঘাত করে। ইমন বারবার পানির জন্য পুলিশের কাছে আর্তনাদ করলেও পুলিশ তাকে এক ফোঁটাও পানি দেয়নি। অনেক প্রচেষ্টার পর স্থানীয় জনগণ পুলিশের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করে মির্জাপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে আসে। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে গড়িমসি করেন এবং একপর্যায়ে ভর্তি না করেই গুরুতর আহত ইমনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন।

পরিবারের সদস্যরা অনেক প্রচেষ্টার পর মুমূর্ষ অবস্থায় শহীদ ইমনকে অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। ৪ আগস্ট থেকে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত দীর্ঘ ১৪ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর ১৮ আগস্ট ভোর পাঁচটায় মহান প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান শহীদ ইমন।

রোল নং 3128158
ফরম (নাবিক)-১

বাংলাদেশ নৌবাহিনী
আবেদন নম্বর 202208230805281675528468
তারিখ : 19-10-2022
আবেদনের ব্রাঞ্চ : Sailor-Cook

১। প্রার্থীর পূর্ণ নামঃ MD.EMON
২। পিতার নামঃ MD.JULHAS .... পেশাঃ
পিতার জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বরঃ
৩। মাতার নামঃ RINA BEGUM .... পেশাঃ
৪। বর্তমান ঠিকানাঃ গ্রাম: NALIN, ওয়ার্ড নং: 9, ইউনিয়ন: HEMNAGAR
পোস্ট অফিস: NALIN BAZAR, থানা: GOPALPUR, জেলা: TANGAIL
পোস্ট কোডঃ 1992 .... ফোন / মোবাইলঃ 01703547531
৫। স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রাম: NALIN, ওয়ার্ড নং: 9, ইউনিয়ন: HEMNAGAR
পোস্ট অফিস: NALIN BAZAR, থানা: GOPALPUR, জেলা: TANGAIL
পোস্ট কোডঃ 1992 .... ফোন / মোবাইলঃ 01703547531
৬। অভিভাবকের নাম (পিতা জীবিত না থাকলে) ঃ
সম্পর্কঃ .... পেশাঃ
ঠিকানাঃ
৭। জন্ম তারিখ (মাধ্যমিক সনদপত্র/ নবম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন কার্ড / টোপাস প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন বা ভোটার আইডি কার্ড অনুযায়ী) ঃ 12-01-2003 .... লিঙ্গ: Male
৮। বিজ্ঞাপনে বর্ণিত তারিখে বয়সঃ 19 বৎসর 11 মাস 20 দিন (নাবিক/এমওডিসি)
৯। ধর্মঃ MUSLIM
১০। বৈবাহিক অবস্থাঃ UNMARRIED
১১। জাতীয়তা (জন্ম সূত্রে) ঃ BANGLADESHI
১২। শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

[illegible]	NALIN ADARSHA HIGH SCHOOL	BUSINESS STUDIES	DHAKA	1611898712	594032	2020		2.67
[illegible]	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
[illegible]		XX	XX	XX			XX	

১৩। খেলাধুলা / সংগীত / অন্য কোন বিষয়ে দক্ষতা (যদি থাকে-সনদপত্র সংযোজন করতে হবে) ঃ

ক্রমিক	প্রতিযোগিতার নাম	অংশগ্রহণকৃত বিষয়ের নাম	সন	[illegible]
১।				
২।				

১

শহীদের সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল

নাম	: মো: ইমন
পিতা	: মৃত মোহাম্মদ জুলহাস
মাতা	: রিনা বেগম
পেশা	: গৃহপরিচারিকা
ভাই-বোন	: তিন ভাই, এক বোন
ভাই-বোনের মধ্যে অবস্থান	: সবার বড়
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: নলিন, ইউনিয়ন: নলিনবাজার, থানা: গোপালপুর, জেলা: টাঙ্গাইল
শহীদ হওয়ার স্থান	: মির্জাপুর বাস স্ট্যান্ডে আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৮/০৮/২০২৪
আঘাতের ধরন	: পুলিশের আঘাতে ডান উরুতে গুলিবিদ্ধ, পরবর্তীতে বন্দুকের নল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আহত করা হয়

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারের সদস্যদের জন্য একটি বাসস্থান তৈরি করে দেওয়া।
২. নিয়মিত শহীদ ভাতা প্রদান করা।
৩. ছোট ভাই-বোনের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করা।

নিউজ লিংক

১. https://www.somoynews.tv/news/2024-09-26/Ds3u8S26
২. https://www.dhakapost.com/country/300058

শহীদ হাফেজ সাদিক

ক্রমিক : ২৪৫

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১১৩

শহীদ পরিচিতি

টাঙ্গাইল জেলার ধলাপাড়া ইউনিয়নের ঘাটাইল থানার ফুলমালির চালা গ্রামে ২০০৩ সালের ৪ঠা মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। কুয়েত প্রবাসী পিতা জনাব লুৎফুর রহমান এবং মা শাহনাজ বেগমের তিন পুত্র সন্তানের মধ্যে শহীদ হাফেজ সাদিক দ্বিতীয়। বড় ভাই শামীম উপার্জনের তাগিদে এক বছর আগে পাড়ি জমান সিঙ্গাপুরে। পিতার স্বপ্ন ছিল শহীদ সাদিককে বড় আলেম বানানোর। সেই উদ্দেশ্যে ছোটবেলা থেকেই মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন শহীদ সাদিককে। হেফজ শেষ করার পরে বড় আলেম বানানোর উদ্দেশ্যে শহীদ সাদিককে ভর্তি করানো হয় আব্দুল্লাহপুরের জামিয়া দ্বীনি ইসলামিয়া মাদ্রাসার কিতাব বিভাগে। কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণের আগেই স্বৈরাচার সরকারের পেটুয়াবাহিনীর বুলেটের আঘাতে ঝরে যায় এই তরুণ প্রাণ।

শহীদ হওয়ার প্রেক্ষাপট

জুলাই মাস জুড়ে চলতে থাকা বিপ্লবের ধারাবাহিকতায় ১৮ জুলাই ২০২৪ তারিখে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সারাদেশব্যাপী "কমপ্লিট শাট ডাউন" কর্মসূচির ঘোষণা দেয়। উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য শহীদ হাফেজ সাদিক অন্যান্য ছাত্রদের সাথে ১৯ জুলাই ২০২৪ তারিখে দুপুর ১২:০০ টায় আব্দুল্লাহপুরে একত্রিত হন। কিছুক্ষণ অবস্থান করার পরে জুমার নামাজ পড়ে বিকেল তিনটার সময় পুনরায় সবাই একত্রিত হন। বিকেল চারটার দিকে পুলিশ ও বিজিবি এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। হঠাৎ একটি গুলি শহীদ সাদিকের মাথায় আঘাত করলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয় জনতা তাকে আধুনিক মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। যে মাথায় সংরক্ষিত ছিল পবিত্র কুরআন, হায়েনার বুলেটের আঘাতে সেই মাথা ক্ষতবিক্ষত হয়।

শহীদের মায়ের মন্তব্য

"আইজক্যা দেড় মাস অইলো আমার বাবা শহীদ অইছে। পুলিশের করা গুলি পেটে লইয়া (নিয়ে) আমার বাবা কবরে শুইয়া রইছে। আমার মুনে কয়, পেটে গুলি থাকায় আমার বাবা কষ্ট পাইতাছে।"

সংক্ষেপে শহীদ প্রোফাইল

নাম	: মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান
পিতা	: লুৎফর রহমান
মাতা	: শাহনাজ বেগম
ভাই-বোন	: তিন ভাই
অবস্থান	: দ্বিতীয়
শহীদ হওয়ার স্থান	: আব্দুল্লাহপুর, উত্তরা, ঢাকা
শাহাদাতের তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪ বিকাল ৪:০০ টা
আঘাতের ধরন	: পুলিশের ছড়া বুলেট মাথায় আঘাত করে
প্রস্তাবনা	: পরিবারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা এবং মাসিক ও এককালীন সহযোগিতা প্রদান করা।

শহীদ মোহাম্মদ ফিরোজ তালুকদার

ক্রমিক : ২৪৬
আইডি : ঢাকা বিভাগ ১১৪

শহীদ পরিচিতি

টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার ঘাটান্দি গ্রামে ১৯৮১ সালের ১ জানুয়ারি অতি নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন শহীদ মোহাম্মদ ফিরোজ তালুকদার। দুই ভাই, এক বোনের মধ্যে শহীদ ফিরোজ সবার বড়। দারিদ্রের কষাঘাতে পড়াশোনা খুব বেশি দূর করতে পারেননি। অষ্টম শ্রেণি পাশ করা শহীদ ফিরোজ তালুকদার জীবন জীবিকার তাগিদে রাজধানী ঢাকায় একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে অফিস সহায়ক পদে চাকরি করতেন। চাকরি থেকে প্রতি মাসে মাত্র ১২ হাজার টাকা বেতন পেতেন, যা দিয়েই বৃদ্ধা মা, স্ত্রী এবং এক কন্যাসন্তানসহ চারজন সদস্যের পরিবারের ভরণপোষণের ব্যয় নির্বাহ করতেন। একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে সহায় হয়ে পড়েছেন শহীদের পরিবারের সদস্যরা। শহীদ ফিরোজের শাহাদাতের মাত্র এক মাস পূর্বেই তার বৃদ্ধ পিতা মৃত্যুবরণ করেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকার দমন নিপীড়ন চালানো শুরু করলে, জুলাই মাসের ১৮ তারিখ ছাত্র আন্দোলন সারাদেশে "কমপ্লিট ডাউন" কর্মসূচির ঘোষণা করে। ছাত্রদের "কমপ্লিট শাটডাউন" কর্মসূচির ফলে সারা দেশ কার্যত অচল হয়ে পড়ে। ছাত্রদের আন্দোলনের সাথে সংহতি জানিয়ে সারা দেশের আপামর জনতা রাস্তায় নেমে আসে। ব্যতিক্রম ছিল না রাজধানী ঢাকার মিরপুর ১০ নাম্বার চত্বরও। ১৯ জুলাই মিরপুর ১০ নাম্বার চত্বর ছাত্র-জনতার সমাবেশস্থলে পরিণত হয়। বিকাল সাড়ে চারটায় নিরস্ত্র, নিরীহ সাধারণ ছাত্র-জনতার এই সমাবেশের ওপর হেলিকপ্টার থেকে গুলি চালায় স্বৈরাচারের দোসর র‍্যাব ও পুলিশ বাহিনী। গুলি এসে আঘাত করে শহীদ ফিরোজ তালুকদারের পেটে। আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ঘটনাস্থলেই শাহাদাতবরণ করেন শহীদ ফিরোজ।

বাংলাদেশ
নির্বাচন কমিশন
Name(English): MD. FIROZ TALUKDER

Aalok Hospital Ltd.
Emergency Department

জন্ম সনদ

RANGPUR CHEMICAL LIMITED
To whom it may concern

সংক্ষিপ্ত শহীদ প্রোফাইল

নাম	: মোহাম্মদ ফিরোজ তালুকদার
জন্ম তারিখ	: ০১-০১-১৯৮১
পিতা	: মৃত মো: সোহরাব আলী
মাতা	: ভানু বেগম
ভাই-বোন	: দুই ভাই, এক বোন
শহীদের অবস্থান	: বড়
স্ত্রী	: রেশমা সুলতানা
কন্যা	: রাইকা তাসলিম, বয়স: ৮ বছর
শাহাদাতের স্থান	: মিরপুর ১০ নাম্বার গোল চত্বর
শাহাদাতের তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪, বিকাল সাড়ে চারটা
আঘাতের ধরন	: পুলিশ-র‍্যাবের ছোড়া বুলেটে পেটে আঘাত করে
প্রস্তাবনা	: ১. শহীদের কন্যার পড়াশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করা
	: ২. শহীদের বৃদ্ধা মায়ের জীবনযাপনের যাবতীয় খরচ নির্বাহের ব্যবস্থা করা
	: ৩. শহীদের স্ত্রীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা

শহীদ আহনাফ আবির আশরাফুল্লাহ

ক্রমিক : ২৪৭

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১১৫

শহীদ পরিচিতি

টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলার বারপাখিয়া গ্রামের হারুন অর রশীদ ও আছিয়া খাতুন দম্পতির চার সন্তানের মধ্যে বড় এবং একমাত্র পুত্র সন্তান শহীদ আহনাফ আবির। ১৯৯৫ সালের ২৩ অক্টোবর কৃষক পিতার ছোট্ট ঘরকে আলোকিত করে জন্মগ্রহণ করেন শহীদ আহনাফ আবির। ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী একমাত্র সন্তানকে ইঞ্জিনিয়ার বানানোর স্বপ্ন দেখতেন শহীদের পিতা। সেই স্বপ্ন পূরণের একেবারে দোড়গোড়ায় পৌঁছেও বাবার সেই স্বপ্ন পূরণ হলো না। মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের মেধাবী এই শিক্ষার্থীর জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেয় হায়েনার থাবা।

মায়ের চিৎকার

আমার ছেলে পড়ালেখা করে অনেক বড় ইঞ্জিনিয়ার হবে। আমাদের অভাব-অনটন দূর করবে। এখন আমি কাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখব। আমার সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। আমি এখন কাকে নিয়ে বাঁচব। আমার ছেলে হত্যার বিচার চাই।'- একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে এভাবেই বিলাপ করেন শহীদের মা।

শহীদের পরিবার সংক্রান্ত তথ্য

তিন বোন সোমা আক্তার, সাইদা আক্তার এবং আসফিয়া জামানের অতি আদর এবং ভালোবাসার একমাত্র বড় ভাই শহীদ আহনাফ আবির আশরাফুল্লাহ। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের আয়ের উৎস বাবার কৃষিকাজ। কৃষিকাজ করেই ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার বানানোর স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্য সামনে রেখে মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করান। বড় দুই মেয়ের বিবাহও দিয়েছেন। ছোট মেয়ে এবং বাবা-মা টাঙ্গাইলে নিজেদের বাড়িতে বসবাস করেন। বাবা-মায়ের স্বপ্ন ছিল ছেলে পড়াশোনা শেষ করে বড় ইঞ্জিনিয়ার হবে এবং তাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করবে। শেষ বয়সে বৃদ্ধ পিতা-মাতা স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাবেন। কিন্তু তাদের সেই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল!

শাহাদাতের ঘটনার প্রেক্ষাপট

জুলাই মাস ধরে চলতে থাকা তীব্র বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন আগস্ট মাসের শুরুর দিকে আরও চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাথে সাধারণ জনগণের সম্পৃক্ততা বাড়ে। একই সাথে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের দোসর পুলিশ-র‍্যাব এবং আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের তাণ্ডব পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে। সরকার এবং সরকারি দলের এই অমানবিক নৃশংসতার প্রতিবাদস্বরূপ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ৫ই আগস্ট ২০২৪ তারিখে মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচি ঘোষণা করে। সাধারণ ছাত্র-জনতার প্রতিবাদ প্রতিরোধের মুখে স্বৈরাচারী খুনি হাসিনা দেশ থেকে পালাতে বাধ্য হন। সারাদেশের মানুষ আনন্দে ফেটে পড়ে এবং দেশের অলিগলি থেকে আনন্দ মিছিল বের হতে থাকে। কিন্তু খুনি হাসিনা পদত্যাগ করলেও সারাদেশে তার দোসররা তখনো সক্রিয় ছিল। এমনি একটি আনন্দ মিছিলে যোগ দেন শহীদ আহনাফ আবির সাভারের বাইপাইল এলাকায়। বিকেল পাঁচটার দিকে উক্ত মিছিলে পুলিশ এবং আওয়ামী লীগের দোসররা হামলা চালায়। পুলিশের এলোপাথাড়ি ছোড়া একটি গুলি এসে আঘাত করে শহীদ আবিরের পেটে। আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে স্থানীয় লোকজন তাকে বাইপাইলের হাবিব হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শহীদ আবিরকে মৃত ঘোষণা করেন।

সংক্ষিপ্ত শহীদ প্রোফাইল

নাম	: শহীদ আহনাফ আবির আশরাফুল্লাহ
জন্ম তারিখ	: ২৩-১০-১৯৯৫, বয়স: ৩০ বছর
পেশা	: শিক্ষার্থী, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং
পিতা	: মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ
পেশা	: কৃষিকাজ
মাতা	: মোছাম্মৎ আছিয়া খাতুন
পেশা	: গৃহিণী
ভাই-বোন	: এক ভাই, তিন বোন
ভাই-বোনের মধ্যে অবস্থান	: সবার বড়
শাহাদাতের স্থান	: বাইপাইল, সাভার
শাহাদাতের তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪, বিকাল পাঁচটা
আঘাতের ধরন	: পেটে পুলিশের বুলেটের আঘাত

প্রস্তাবনা

১. শহীদের বৃদ্ধ পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের জন্য নিয়মিত ভাতা চালু রাখা

২. ছোট বোনের পড়ালেখার খরচ বহন করা

শহীদ সাজ্জাদ হোসেন সজল

ক্রমিক : ২৪৮

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১১৬

শহীদ পরিচিতি

যেদিন তুমি এসেছিলে ভবে,
কেঁদেছিলে তুমি হেসেছিলো সবে।
এমন জীবন তুমি করিও গঠন
মরিয়া হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভূবন।
-কাজী নজরুল ইসলাম

বাবা মায়ের মুখ আলোকিত করে ২০০৫ সালের ১২ এপ্রিল গাইবান্ধা জেলার আশুলিয়া থানার অন্তর্ভুক্ত শ্যামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন একটি নবজাতক। প্রথম সন্তান এবং পুত্র হওয়ায় বাবা খুশিতে আত্মহারা হয়ে নাম রাখেন সাজ্জাদ হোসেন সজল। বাবা খলিলুর রহমান এবং মমতাময়ী মা শাহীনা বেগম গভীর যত্নে লালন পালন করেন তাদের ৩ সন্তানকে। তারা সকলেই পড়াশোনায় বেশ মনোযোগী। বড়ছেলে সজল সিটি ইউনিভার্সিটির টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রথম র্বষের শিক্ষার্থী ছিলেন। সে খুবই নম্র ভদ্র এবং পরোপকারী ছেলে। সমাজের সবার বিপদে আপদে আগে ছুটে যেতেন তিনি। তাছাড়া সজল ছিলেন খুবই ধর্মপ্রাণ এবং নিয়মিত নামাজ পড়তেন।

যেভাবে শহীদ হলেন

জুলাই, ২০২৪ জুড়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সারাদেশ ছিল উত্তাল। আর এই আন্দোলনে শুরু থেকেই সাজ্জাদ হোসেন সজল ছিলেন সরব। তিনি মুখ বুঝে বসে না থেকে আন্দোলনের শুরু

থেকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। তিনি ভাবতেন, সরকার যেন এই কোটা সংস্কারের মাধ্যমে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মেধাবীদের চাকরি পাওয়ার পথ সুগম করেন। তারও ইচ্ছে ছিল পড়াশোনা শেষ করে বড় সরকারী কর্মকর্তা হওয়ার, যাতে তিনি

দেশের মানুষের সেবা করতে পারেন। পরবর্তীতে এই আন্দোলন যখন সরকার পতনের দিকে ধাবিত হলো তখন সজল আরো সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে যুক্ত হলেন দেশের মানুষকে স্বৈরাচারী সরকার থেকে বাঁচাতে। এই আন্দোলনের জের ধরেই ৪ আগস্ট রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ছাত্র জনতার বিক্ষোভ মিছিলে হামলা চালায় আওয়ামী সন্ত্রাসী। এদিন পুলিশের সাথে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা ছাত্রদের গুলি করে। কিন্তু হাজার হাজার ছাত্র ইট-পাটকেল দিয়ে সন্ত্রাসী ও হানাদার পুলিশ বিজিবিকে প্রতিরোধ করে। এরমধ্যে কয়েকটি স্থানে সেনাবাহিনীও গুলি করে। একইসাথে এইদিনে সারাদেশে ১৩০ জন খুন হন। এর মধ্যে ছাত্রলীগ, পুলিশ ও যুবলীগেরও কিছু সদস্য রয়েছে। লাখো ছাত্ররা এদিন সন্ত্রাসীদের অনেককে ভালোভাবে উত্তম-মধ্যম দেয়। পরদিনই ঢাকামুখী লং-মার্চের কর্মসূচি দেয় ছাত্র-জনতা।

অত:পর আসে সেই কালজয়ী ৫ আগস্ট। এইদিন সকল দেশবাসীর কাছে খুশির হলেও সজল পরিবারের কাছে এটি একটি অভিশপ্ত দিন। এদিন সকাল থেকেই ব্যাপক মারমুখী অবস্থান নেয় পুলিশ, বিজিবি ও সেনাবাহিনী। রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় খন্ড খন্ড যুদ্ধ শুরু হয় ছাত্র জনতার সাথে। একইসাথে সকাল সাড়ে দশটার পর সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে স্বৈরাচার হাসিনা পালিয়ে যায় ভারতে। কিন্তু কর্মরত পুলিশরা এই খবর না জানিয়ে তারা সাধারণ জনতার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। অবিচারে অনেক মানুষকে তারা খুন করতে থাকে। এই ৫ আগস্ট সকাল ১১টায় বাসা থেকে বের হয় সজল। তার মা সেদিন হাসপাতালে ডিউটিতে ছিল। জরুরী বিভাগে যখন অনবরত গুলিবিদ্ধ রোগী আসছিল, তখন বারবার সজলকে ফোন করে ঘরে ফিরে যেতে বলছিলেন তিনি । সজল মাকে বলে, আম্মু, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? অন্য ছেলেমেয়েদের তোমার নিজের সন্তান মনে হয় না? আমাদের এখানে তিন-চারজন অলরেডি মারা গেছে। তুমি কেন স্বার্থপরের মতো আমাকে বাসায় ডাকো? এক সন্তান মারা গেলে তোমার পাশে হাজার সন্তান দাঁড়াবে।' ছেলে হারানোর চাপা বেদনা নিয়ে কথাগুলো বলছিলেন নিহত সাজ্জাদ হোসেন সজলের মা শাহিনা বেগম।তিনি বলেন, 'সর্বশেষ বিকেল পৌনে ৩ টার দিকে সজলের সঙ্গে কথা হয়।

তখন সজল জানায়, আম্মু এখানকার (আশুলিয়ার বাইপাইল) পরিস্থিতি খুবই খারাপ। আমি যদি শহীদ হই, তাহলে আমার প্যান্টের পকেটে ইউনিভার্সিটির কার্ড আছে, কার্ড দেখে আমার লাশটি চিনে নিয়ে যেও। আল্লাহ সজলের সেই কথাটাই কবুল করলেন। তারপর প্রায় ১টার দিকে মানুষ জেনে যায়, হাসিনা পালিয়ে গেছে। শেখ হাসিনা পালিয়ে গেছে শোনার পর সজলকে ফোন দিয়েছিলেন মা শাহিনা বেগম। কিন্তু তখন তিনি ফোন কেটে দেয়। এরপর ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। রাতে সজলের মা-বাবা সাভার ও ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে খোঁজাখুঁজি করেও ছেলের সন্ধান পাননি। রাত ৩ টার দিকে কেউ সাজ্জাদ হোসেন সজলের সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করে। এরপর একজন খবর দেয় আশুলিয়া থানার সামনে সাত-আটজন আন্দোলনকারীর লাশ পুড়িয়ে দিয়েছে পুলিশ। পরদিন (৬ আগস্ট) সকালে আশুলিয়া থানার সামনে যান সজলের মা-বাবা। সেনাবাহিনীর সদস্যরা তখন সজলের আইডি কার্ড হাতে নিয়ে পরিবারের সদস্যদের খোঁজ করছেন। পরে আইডি কার্ড দেখে তাঁর লাশ শনাক্ত করা হয়। ছেলের পোড়া অঙ্গার দেহ দেখে মা বিলাপ করতে থাকেন।

সারাদেশের বিশেষভাবে রাজধানীর মানুষ সব রাস্তায় নেমে নেচে গেয়ে উদযাপন করতে থাকে। গলিতে গলিতে মিষ্টি বিতরণ ও ঈদ মোবারক বলে কোলাকুলি করতে থাকে মানুষ। রাস্তায় রাস্তায় মানুষ সিজদা দিয়ে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করতে থাকে। কিন্তু সেই মুক্ত দেশের মুক্তির আনন্দ উপভোগ করতে পারেননি শহীদ সাজ্জাদ হোসেন সজল।

তারই জন্য কবি হয়তো লিখেছিল-

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রান যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

-কাজী নজরুল ইসলাম

কেমন আছে শহীদের পরিবার

শহীদ সাজ্জাদ হোসেন সজলের পরিবারের সাভারের জামগড়ায় ১৮ শতক জমির উপর টিনশেড বাড়ি আছে। অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি ভালো। একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে মা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং বার বার মুর্ছা যাচ্ছে। কেননা প্রথম মা ডাক যে তার কাছে থেকেই শোনা। শোকে কাতর তার ছোট বোন দুটোও। বাড়ির সমস্ত আঙ্গিনা জুড়ে তারা সজলের স্মৃতি দেখতে পায়। পাড়াপড়শিরা তাদের বিপদে পাশে থাকার বন্ধুকে হারিয়ে শোকে কাতর। জীবন শুরু হওয়ার আগেই হারিয়ে গেলো সম্ভাবনাময় একটি নিষ্পাপ প্রাণ। এজন্যই ইংরেজ কবি হয়তো লিখেছিলেন "Many a rose is born to blush unseen"

প্রতিবেশি ও স্বজনদের অনুভুতি

কর্মের কারণে পৃথিবীতে মানুষ অমর হয়। মানুষ চলে গেলে ও থেকে যার তার কর্ম। তেমনি মৃত্যুর পরেও শহীদ সাজ্জাদ হোসেন সজল অমর। এলাকাবাসীর মুখে মুখে আজও তার সম্পর্কে বন্দনা। শহীদ সজল সম্পর্কে তার এক প্রতিবেশী শেখ নেয়াজ বলেন- "খুব মানবিক, ভদ্র ও নম্র ছিলো সে। পরিবারে বড় সন্তান হিসেবে অনেক দায়িত্বশীল ছিল। সবার সাথে মিলেমিশে থাকতে পছন্দ করতো সে।"

তার ফুফাতো ভাই বলেন-"সজল নামাজী ছিলেন এবং সে অত্যন্ত নম্র ভদ্র একটা ছেলে ছিলেন।"
সজল সম্পর্কে জানতে চাইলে তার আরেক প্রতিবেশী ভাই আরও বলেন- "তার ভেতরে প্রবল মনুষত্ব্য ছিলো। সে অন্যের বিপদকে নিজের মনে করে সবার আগে ছুটে যেতো।"

সর্বোপরি মহৎ হৃদয়ের মানুষেরা বুঝি এমনই হয়, মহাকাল তাদেরকে অমর করে রাখে। তেমনি সাজ্জাদ হোসেন সজলের মতো মহৎ মানুষেরা পৃথিবীতে আসে স্বল্প সময়ের জন্য কিন্তু ফেলে রেখে যায় দীর্ঘ পদচিহ্ন। দেশের ক্রান্তিলগ্নে তাঁর এই অবদান জাতি আজীবন মনে রাখবেন।

মহান আল্লাহ তাঁর শাহাদাতকে কবুল করে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন (আমিন)।

‘আম্মু, আমি যদি শহীদ হই আইডি কার্ড দেখে চিনে নিয়ো’

সাভার সংবাদদাতা ▷

‘৫ আগস্ট সকাল ১১টায় বাসা থেকে বের হয় সজল। আমি সেদিন হসপিটালে ডিউটিতে ছিলাম। ইমারজেন্সিতে যখন অনবরত গুলিবিদ্ধ রোগী আসছিল, তখন বারবার সজলকে ফোন করে ঘরে ফিরে যেতে বলি। সজল আমাকে বলে, আম্মু, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? অন্য ছেলেমেয়েদের তোমার নিজের সন্তান মনে হয় না? আমাদের এখানে তিন-চারজন অলরেডি মারা গেছে। তুমি কেন স্বার্থপরের মতো আমাকে বাসায় ডাকো? এক সন্তান মারা গেলে তোমার পাশে হাজার সন্তান দাঁড়াবে।’

ছেলে হারানোর চাপা বেদনা নিয়ে কথাগুলো বলছিলেন নিহত সাজ্জাদ হোসেন সজলের মা শাহিনা বেগম।

তিনি বলেন, ‘সর্বশেষ বিকেল পৌনে ৩টার দিকে সজলের সঙ্গে কথা হয়। তখন সজল জানায়, আম্মু এখানকার (আশুলিয়ার বাইপাইল) পরিস্থিতি খুবই খারাপ। আমি যদি শহীদ হই, তাহলে আমার প্যান্টের পকেটে ইউনিভার্সিটির কার্ড আছে, কার্ড দেখে আমার লাশটি চিনে নিয়ে যেয়ো। আল্লাহ ওর সেই কথাটাই কবুল করল।’

আশুলিয়ার সিটি ইউনিভার্সিটির টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (বিএসসি) প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন সজল। পরিবারের সঙ্গে আশুলিয়ার জামগড়া চৌরাস্তা এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।

সাজ্জাদ হোসেন সজল

সজলের মা শাহিনা বেগম আশুলিয়া নারী ও শিশু হাসপাতালে কর্মরত আছেন।

শেখ হাসিনা পালিয়ে গেছে শোনার পর সজলকে ফোন দিয়েছিলেন মা শাহিনা বেগম। কিন্তু তখন সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এরপর ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। রাতে সজলের মা-বাবা সাভার ও ঢাকার বিভিন্ন মেডিক্যালে খোঁজাখুঁজি করেও ছেলের সন্ধান পাননি। রাত ৩টার দিকে কেউ একজন খবর দেয় আশুলিয়া থানার সামনে সাত-আটজন আন্দোলনকারীর লাশ পুড়িয়ে দিয়েছে পুলিশ।

পরদিন (৬ আগস্ট) সকালে আশুলিয়া থানার সামনে যান সজলের মা-বাবা। সেনাবাহিনীর সদস্যারা তখন সজলের আইডি কার্ড হাতে নিয়ে পরিবারের সদস্যদের খোঁজ করছেন। পরে আইডি কার্ড দেখে তাঁর লাশ শনাক্ত করা হয়। ছেলের পোড়া অঙ্গার দেহ দেখে মা বিলাপ করতে থাকেন।

আশুলিয়া থানার অপর প্রান্তের একটি ভবনের

▶▶ পৃষ্ঠা ৪ ক. ১

এক নজরে শহীদ সাজ্জাদ হোসেন সজল

নাম	: সাজ্জাদ হোসেন সজল
পেশা	: ছাত্র
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ১২/০৪/২০০৫, ১৯ বছর প্রায়
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪, সোমবার
শাহাদাত বরণের স্থান	: আশুলিয়া থানার সামনে
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: শ্যামপুর, থানা/উপজেলা: , জেলা: গাইবান্ধা
পিতা	: খলিলুর রহমান
মাতা	: শাহিনা বেগম
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: সাভারে জামগড়ে ১৮ শতক জমির উপর টিনশেড বাড়ি আছে। মোটামুটি সচ্ছল পরিবার
ভাইবোনের বিবরণ	: ছোট দুই বোন রয়েছে
বড় বোন	: খাদিজা ফেরদাউসী (বয়স-১৩, অষ্টম)
ছোট বোন	: আদিবা আশ দিয়া (বয়স-১)

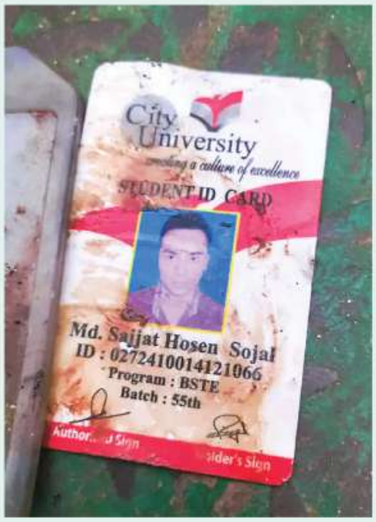

শহীদ পরিবারকে সাহায্যের প্রস্তাবনা

১. বাবার জন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে।

২. ছোট বোনদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দেয়া যেতে পারে।

৩. মানসম্মত বাসস্থানের ব্যাবস্থা করা যেতে পারে।

শহীদ জাহাঙ্গীর আলম

ক্রমিক : ২৪৯

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১১৭

শহীদ পরিচিতি

শহীদ জাহাঙ্গীর আলম ১৯৮০ সালের ১৫ আগস্ট গাজীপুর জেলার বারতোপা শ্রীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জনাব শেখ আব্দুল হান্নান ও মাতা জাহানারা খাতুন। জাহাঙ্গীর আলম পেশায় ব্যবসায়ী ছিলেন। লেপ, তোষক ও বালিশ কারিগর দিয়ে তৈরি করে নিজ দোকানে বিক্রয় করতেন। শাহাদাত বরণের পূর্বে ব্যবসা পরিচালনার জন্য এক লক্ষ টাকা ঋণ করে গিয়েছেন। শহীদের দুইটি কন্যা সন্তান রয়েছে। বড় মেয়ে জিমকিয়া আলমী (৭) 'তাকওয়া বালিকা মাদরাসায়' প্রথম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। ছোট মেয়ে জাকিয়া সুলতানা (৫) এখনও প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শুরু করেনি। শহীদের নিজস্ব বাড়ি নেই। তিনি নানা শশুরের বাড়িতে স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে বসবাস করতেন। ইচ্ছে ছিল দুই মেয়েকে আলেমা হিসেবে তৈরি করবেন। একমাত্র উপার্জনকারী হিসেবে পরিবারের অবলম্বন তিনিই ছিলেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার আলো বাতাসে বেড়ে ওঠা তৃতীয় বিশ্বের অতি সাধারণ নাগরিক আমরা। হাজারও শহীদের রক্তের বিনিময়ে ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করার উদ্দেশ্যেই পাকিস্তানি হানাদার গোষ্ঠীকে এ দেশ হতে বিতাড়িত করেছিলাম।

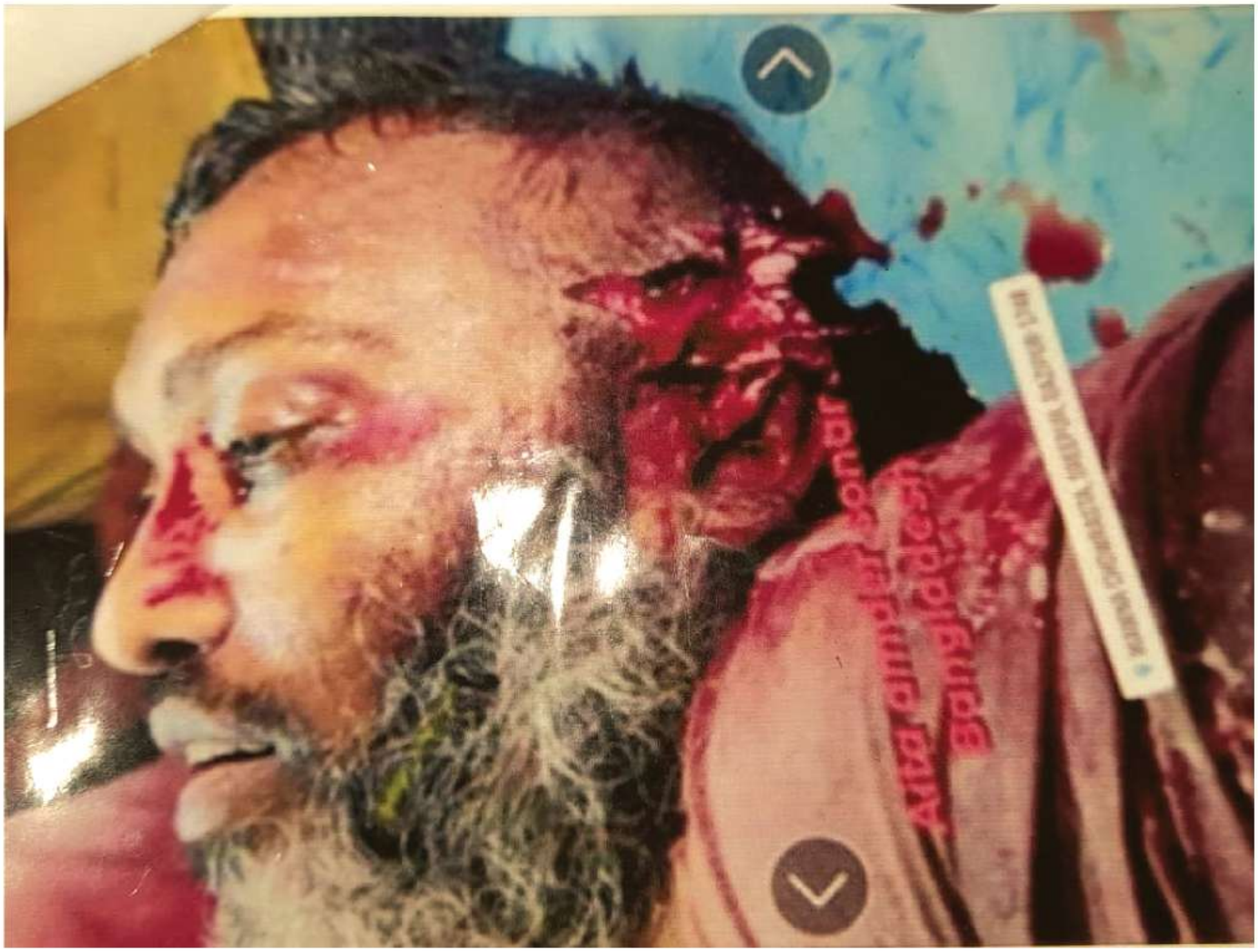

দেশ হানাদার মুক্ত হয়েছে ঠিকই কিন্তু এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটেনি। দুর্নীতি অনিয়ম আর বৈষম্য এদেশের প্রতিটি পরতে পরতে গেঁথে গিয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধারা এদেশের মহান সন্তান। তাদের আত্মত্যাগ জাতি দীর্ঘদিন গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাদের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ভাতা দেয়া হোক, সম্মান প্রদর্শন করা হোক, সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন করা হোক এতে কোন মানুষের কোন অভিযোগ থাকার কথা নয়। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাপ্য সম্মান দিতে জাতি কখনো কার্পণ্য করেনি। তার সন্তানদের মূল্যায়নের প্রশ্ন আসলে সেখানেও জাতি কোন কথা বলেনি। কিন্তু বিপত্তি বেধেছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মুক্তিযোদ্ধার নামে তার বংশধরদের সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে। দৈনিক প্রথম আলোর মতে এদেশে ৫৫ হাজার মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে যাদের জন্ম ৭১ সালের পরে। এর মানে হচ্ছে আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধকে উপলক্ষ করে তাদের দলীয় স্বল্পশিক্ষিত ক্যাডারদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ সরকারী চাকুরীতে পুনর্বাসিত করা। আওয়ামী লীগের এই জাতি বিনাশী অপতৎপরতাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী কাজ। তাইতো এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগঠিত হলো অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থানে সকল শ্রেণীর সকল পেশার মানুষের সমান অংশীদারিত্ব ছিল।

৩ আগস্ট ২০২৪ শনিবার গাজীপুরের শ্রীপুরের বকুলতলা পুলিশ ফাঁড়ির কাছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচী পালন করে সাধারণ ছাত্র-জনতা। সেদিন নিজের দোকান বন্ধ করে আন্দোলনে যোগদান করেন জাহাঙ্গীর আলম। একপর্যায়ে ঘাতক পুলিশ মিছিলের ছাত্র-জনতাকে উদ্দেশ্য করে গুলি চালায়। দুপুর ২:৩০ এর দিকে হঠাৎ একটি গুলি শহীদের শরীরে এসে বিদ্ধ হয়। চারিদিকে গোলাগুলি চলায় পথচারীরা তাঁকে উদ্ধার করতে বিলম্ব

করে ফেলে। একপর্যায়ে নিথর হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন শহীদ জাহাঙ্গীর। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরবর্তীতে বেপারি পাড়া মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় জানাজা শেষে শহীদকে দাফন করা হয়।

প্রতিবেশীর অনুভূতি

আবুল কাশেম বলেন- 'আমার মতে শহীদ জাহাঙ্গীর আলম একজন ভাল মানুষ ছিলেন। সবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন তিনি। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন। এই ভাল মানুষটিকে কেন হত্যা করা হলো? আমি এর বিচার চাই।

শহীদের প্রোফাইল

নাম	: শহীদ জাহাঙ্গীর আলম
পিতা	: জনাব শেখ আব্দুল হান্নান
মাতা	: জাহানারা খাতুন
জন্ম তারিখ	: ১৯৮০ সালের ১৫ আগস্ট
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বারতোপা, উপজেলা: শ্রীপুর, জেলা: গাজীপুর
বর্তমান ঠিকানা	: একই
আহত হওয়ার স্থান	: গাজীপুর, শ্রীপুর, বকুলতলা পুলিশ ফাঁড়ি সংলগ্ন
আহত হওয়ার সময় কাল	: ৩ আগস্ট ২০২৪ শনিবার, দুপুর ২:৩০ টা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ৩ আগস্ট ২০২৪ শনিবার, দুপুর ৩:০০ টা
যাদের আঘাতে শহীদ	: ঘাতক পুলিশ বাহিনী
শহীদের কবরস্থান	: বেপারি পাড়া মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থান, বারতোপা, শ্রীপুর, গাজীপুর
সম্পদের বিবরণ	: কোন জায়গা জমি নেই

পরিবারের বিবরণ

১. মোছা: শাহিনুর আক্তার (৩৫), পেশা: গৃহিণী, সম্পর্ক: স্ত্রী ২. মোছা: জিমকিয়া আলমী (৭), পেশা: ছাত্রী, তাকওয়া বালিকা মাদরাসা, শ্রেণী: প্রথম, সম্পর্ক: মেয়ে ৩. মোছা: জাকিয়া সুলতানা (৫), সম্পর্ক: মেয়ে

প্রস্তবনা

১. শহীদ পরিবারে মাসিক সহযোগিতা করা যেতে পারে
২. শহীদের সন্তানদের লেখাপড়ার দায়িত্ব নেয়া যেতে পারে
৩. শহীদের ঋণ পরিশোধে সহায়তা করা যেতে পারে
৪. শহীদের পরিবারের জন্য স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করা প্রয়োজন
৫. শহীদের স্ত্রীকে কর্মসংস্থান করে দেয়া যেতে পারে

"একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে পাগল প্রায় বাবা"

শহীদ মোঃ মিরাজুল ইসলাম অর্নব

ক্রমিক : ২৫০

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১১৮

পরিচিতি

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম শহীদ মো: মিরাজুল ইসলাম অর্নব। মিরাজুল ইসলাম ২০০২ সালের ২৭ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান শরীয়তপুর। শহীদ মিরাজুলের পিতা জনাব মো: আবু তালেব এবং মাতা মোছা: সাহিদা বেগম। শহীদ মো: মিরাজুল ছিলেন তাঁর পিতার একমাত্র ছেলে সন্তান। দনিয়া কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন তিনি। পারিবারিক অসচ্ছলতার কারনে তিনি আর পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেননি। রাজধানীর ফকিরাপুলের একটি ট্রাভেল এজেন্সিতে চাকরি করে নিজের খরচ চালাতেন।

২০২৪ জুলাই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে স্বৈরাচারের বিপক্ষে অবস্থান নেয়ায় শহীদ করা হয় তাকে।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ মো: মিরাজুলের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই দুর্বল। পারিবারিক কলহের কারণে শহীদ মিরাজকে সবসময় মানসিক অশান্তির মধ্যে থাকতে হতো। তাঁর একটা বোন আছে। তাঁর ১ম মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর চাচা ছোট বোনকে লালন-পালন করে উপযুক্ত বয়সে বিয়ের ব্যবস্থা করেন। শহীদের বাবা ইউরোপ থেকে ফিরে এলাকায় ছোট একটা ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু বিজনেস ভালো চলছিল না। তাই মিরাজ ছোট্ট একটা বাসা ভাড়া নিয়ে তাঁর বাবা-মা দুজনকেই ঢাকায় নিয়ে আসেন। শহীদ হওয়ার এক সপ্তাহ আগে তাঁর বাবা-মায়ের মধ্যে ঝগড়া লাগে। এক পর্যায়ে মিরাজের মামা এসে বাবাকে মারধর করে। বাধ্য হয়ে মিরাজ বাবাকে গ্রামে নিয়ে চাচার কাছে রেখে আসেন। মিরাজের মৃত্যুর পর পরিবারের সমস্যা আরও বেড়ে গেছে। তাঁর মা আলাদা হয়ে গেছেন। তাঁর বাবা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। কোন কাজ করতে পারেননা। ছেলের মৃত্যুর পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। তাঁকে দেখার মত কেউ নেই।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ

২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবে ৩৬ দিনের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৬ বছরের ফ্যাসিস্ট অপশাসনের অবসান ঘটে। নতুন করে স্বাধীনতা লাভ করে আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি। দেশ ছেড়ে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন স্বৈরাচার খুনি শেখ হাসিনা।

আমাদের এই প্রিয় ভূখণ্ড বিদেশীদের দ্বারা শাসিত-শোষিত হয়েছে বহুবার, বহুকাল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর নানান প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর বাংলা ভূখণ্ড বারবার বিদেশীদের মনোযোগ কেড়েছে বারবার। তুর্কি, মোঘল, ইংরেজদের দ্বারা শোষিত হয়েছে আমাদের পূর্ব পুরুষরা। এরপর পাকিস্তানিরা আমাদের শোষণ শুরু করে। ১৯৭১ সালে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের ২৪ বছরের শোষণ বঞ্চনার অবসান ঘটে। বাঙালির স্বাধীনতা অর্জিত হয়।

বারবার বিদেশীদের দ্বারা শোষিত হওয়ার ইতিহাস থাকলেও দেশীয় শক্তির দ্বারা কখনো আমরা শোষিত হইনি। কিন্তু আওয়ামী শাসনামলে এই ঘটে। নতুন ইতিহাসের জন্ম দেয় বাংলার ফেরাউন খ্যাত শেখ হাসিনার সরকার। ২০০৮ সালে এক পাতানো নির্বাচনের মাধ্যমে ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়ের সূচনা করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামীলীগ সরকার। ক্ষমতায় এসেই জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে বাংলাদেশের মানুষের উপর। নির্বাচনী ইশতেহারে জনকল্যাণের কথা থাকলেও ক্ষমতায় এসেই জনগণের বিপক্ষে কাজ করা শুরু করে। গুম, খুন, হত্যা, কালোবাজারি, দুর্নীতি, ঘুষ, বিদেশে অর্থ পাচার, সিন্ডিকেট, ব্যাংক লুট, উন্নয়নের নামে সরকারি কর্মকর্তাদের পকেট ভারি, বিচার বহির্ভূত হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে দেশে পুরো সিস্টেমকেই ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে যায়। এদিকে দ্রব্য মূল্যের উর্দ্ধগতি জনগণের ভোগান্তি চরম আকার ধারণ করে। চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে ফেলে। দলীয় লোকজনদের দাপটে সাধারণ মানুষদের টিকে থাকা কষ্টকর হয়ে পড়ে। যার ফলে জনমনে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

সমাজের সর্বত্র বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে। সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য তৈরি করা হয়। কোটা প্রথার মাধ্যমে মেধাবীদের অবমূল্যায়ন করা হয়। লেখাপড়া শেষ করেও কোথাও উপযুক্ত চাকুরী না পেয়ে অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ঘুষ ইত্যাদির মাধ্যমে অযোগ্য লোকদের প্রশাসনে নিয়োগ দেওয়া হয়। এই অন্যায় ছাত্র জনতা বরদাশত করতে পারে না। ছাত্রজনতা সরকারের দীর্ঘ দিনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে। তারা আন্দোলনে নামে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সরকার বাঁধা প্রদান করে, যৌক্তিক আন্দোলনকে দমিয়ে দেওয়ার ব্যর্থ পরিকল্পনা করে।

স্বৈরাচারী বাহিনীর নানামুখী নির্যাতনের ফলে ১৯ জুলাই সারা দেশে কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা করেন ছাত্র নেতৃবৃন্দ। এই আহ্বানে সকল বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের ছাত্র-জনতা সকল বাঁধা উপেক্ষা করে রাজপথে নেমে আসে। এদিন সারা দেশে পুলিশের সাথে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষে পুরো ঢাকা শহরসহ বিভিন্ন জেলা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। শহীদ মো: মিরাজুল বাড়ি থেকে বের হয়ে মোহাম্মদপুরের বসিলা এলাকায় আন্দোলনকারীদের সাথে যুক্ত হন। এ সময় পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি আওয়ামী সন্ত্রাসীরা একত্রিত হয়ে আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে গুলি করতে থাকে। র‍্যাবের অফিসের সামনে হেলিকপ্টার থেকে আন্দোলনকারীদের টার্গেট করে নির্বিচারে গুলি করতে থাকে। গুলির মুখে আন্দোলনকারীরা বিভিন্ন দিকে ছোটাছুটি শুরু করে। এ সময় হেলিকপ্টার থেকে দুইটা গুলি এসে মিরাজের গায়ে বিদ্ধ হয়। একটা গুলি তাঁর পায়ে লাগে, আর একটি গুলি তাঁর বুকের বাম পাশ দিয়ে ঢুকে ডান পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। গুলি বিদ্ধ হয়ে অসহায় মিরাজ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। রক্তে রঞ্জিত হয় পিচ ঢালা কংক্রিটের রাস্তা। গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে চিৎকার দিতে থাকেন তিনি। আশেপাশের মানুষজন এসে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়িতে তুলেন। এসময় তিনি বার বার তাঁর প্রিয় বাবা আর চাচাকে দেখতে চান। হাসপাতালে নেওয়ার পথেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তখন আনুমানিক সন্ধ্যা ৬ টা। মৃত্যুর খবর পেয়ে গ্রাম থেকে তাঁর বাপ-চাচারা ছুটে আসেন। এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে পরিবারে শোকের ঢেউ বইতে থাকে। একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে পিতা আবু তালেব মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন।

মৃত্যুর পর তাঁর চাচারা তাঁর লাশ গ্রামে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু তাঁর মামাদের পরামর্শে রাজধানীর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের বক্তব্য

শহীদের চাচা জনাব আসাদুজ্জামান বলেন, 'আমার ভাতিজা শহীদ মিরাজুলের জন্য আমার খুব মায়া হয়। ছেলেটা কখনো সুখ করতে পারল না। অল্প বয়সেই পরিবারের দায়িত্ব নিতে হয়। পারিবারিক অশান্তি থাকা সত্বেও সে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়। পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে শাহাদাত বরন করেন। আমি আমার ভাতিজার জন্য দোআ করি, আল্লাহ যেন তাঁকে শহীদ হিসেবে কবুল করেন। আমিন'।

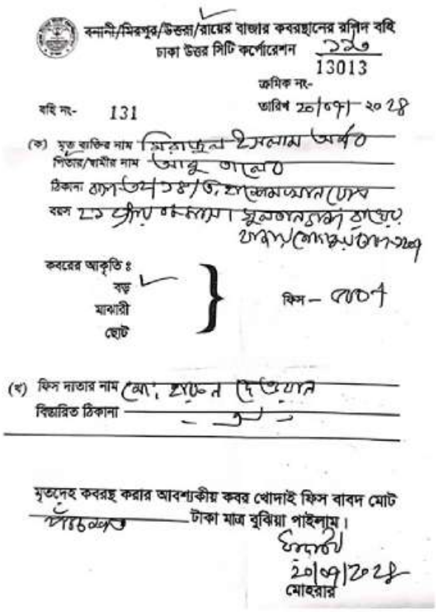

বনানী/মিরপুর/উত্তরা/রায়ের বাজার কবরস্থানের রশিদ বহি
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
13013
ক্রমিক নং-
বহি নং- 131
তারিখ ২০/০৭/২০২৪
(ক) মৃত ব্যক্তির নাম মিরাজুল ইসলাম অর্থ
পিতার/স্বামীর নাম আবু তালেব
ঠিকানা
বয়স
কবরের আকৃতি ঃ
বড়
মাঝারী
ছোট
ফিস –
(খ) ফিস দাতার নাম
বিস্তারিত ঠিকানা
মৃতদেহ কবরস্থ করার আবশ্যকীয় কবর খোদাই ফিস বাবদ মোট
টাকা মাত্র বুঝিয়া পাইলাম।
২০/০৭/২০২৪
মোহরার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মিরাজুল ইসলাম অর্নব
Name: MIRAJUL ISLAM ARNOB
পিতা: আবু তালেব
মাতা: সাহিদা বেগম
Date of Birth: 27 Oct 2002
ID NO: 5122546863

এক নজরে শহীদ মো: মিরাজুল ইসলাম অর্নব

নাম	: শহীদ মো: মিরাজুল ইসলাম অর্নব
পিতা	: জনাব মো: আবু তালেব
মাতা	: মো: সাহিদা বেগম
জন্ম	: ২৭/১০/২০০২
জন্মস্থান	: শরীয়তপুর
পেশা	: ছাত্র, পাশাপাশি চাকরি
আহত হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪, মোহম্মদপুর বশির রোড
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪, সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হসপিটাল
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: নন্দনসার, ডাকঘর: ঘড়িসার-৮০২২, নড়িয়া, শরীয়তপুর
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: নন্দনসার, ডাকঘর: ঘড়িসার-৮০২২, নড়িয়া, শরীয়তপুর

শহীদ আরাফাত মুন্সি

ক্রমিক : ২৫১

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১১৯

শহীদ পরিচিত ও ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

বার্ডস স্কুল এন্ড কলেজের ৮ম শ্রেণির ছাত্র আরাফাত মুন্সি এক তরুণ স্বপ্নবাজ ও চৌকস ছাত্র ছিল। গোপালগঞ্জের ছোট বনগ্রাম গ্রামে বেড়ে ওঠা আরাফাতের স্বপ্ন ছিল সেনাবাহিনীতে চাকুরী করে জনসেবা করা। রিকশা চালক বাবা জনাব স্বপন ও তাই ভাবছিলেন। জননী মায়া বেগম ও ব্যাতিক্রমী ছিলেন না। ভিটামাটি ও ভূমিহীন সম্পদের পরিবারে জন্মগ্রহণকারী আরাফাত মুন্সি দেশে চলমান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকাল ১০:০০ টায় বাইপাল মোড়ে পুলিশ বক্সের সামনে যায়। জড়ো হতে থাকে মুক্তিকামী ছাত্র-জনতা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের প্রথম থেকেই শহীদ আরাফাত মুন্সীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিলো। গত ৫ আগস্ট সোমবার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলন খুনি, ফ্যাসিস্ট, স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচী ঘোষণা করে। উক্ত কর্মসূচী প্রতিহত করার জন্য সরকার কারফিউ জারি করে। বিকেলে স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট হাসিনা পলায়নের পর যখন সারা দেশে আনন্দ মিছিল চলছিলো তখন মিছিলে অংশ নেয় শহীদ আরাফাত। বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে পুলিশ আশুলিয়া থানার সামনে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করতে থাকে। একটি গুলি তার বুকের নিচে লাগলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। স্থানীয় লোকজন তাকে গণস্বাস্থ্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

"চলে যাব-তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ।
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।"

মধুমতির কোল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে আজকের গোপালগঞ্জ শহর। প্রাচীনকালে এ এলাকাটি বঙ্গ অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল। সুলতানী ও

মোঘল যুগে এ অঞ্চল হিন্দু রাজারা শাসন করতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) সময় গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলা ছিল যশোর জেলার অন্তর্গত আর বাকী অংশ ছিল ঢাকা-জামালপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত। ১৮০৭ সালে মুকসুদপুর থানা যশোর থেকে ফরিদপুর জেলার সাথে যুক্ত হয়। ফরিদপুর জেলার একটি পরগনার নাম ছিল জামালপুর। গোপালগঞ্জ সদর ও কোটালীপাড়া জামালপুর পরগনাভুক্ত ছিল। ১৮১২ সালে চান্দনা (মধুমতি) নদী যশোর ও ঢাকা-জামালপুর জেলার বিভক্ত রেখা হিসেবে নির্ধারিত হয়।

গোপালগঞ্জ-মাদারীপুর এলাকা ছিল বিশাল জলাভূমি। এখানে নৌ-ডাকাতির প্রকোপ ছিল বেশী। এজন্য বাকেরগঞ্জ থেকে বিভাজিত হয়ে ১৮৫৪ সালে মাদারীপুর মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৭২ সালে মাদারীপুর মহকুমায় গোপালগঞ্জ নামক একটি থানা গঠিত হয়। ১৮৭৩ সালে মাদারীপুর মহকুমাকে বাকেরগঞ্জ জেলা থেকে ফরিদপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৯০৯ সালে মাদারীপুর মহকুমাকে ভেঙ্গে গোপালগঞ্জ মহকুমা গঠন করা হয়। গোপালগঞ্জ এবং কোটালীপাড়া থানার সঙ্গে ফরিদপুর মহকুমার মুকসুদপুর থানাকে নবগঠিত গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত করা হয়

গোপালগঞ্জের প্রথম মহকুমা প্রশাসক ছিলেন জনাব সুরেশ চন্দ্র সেন। ১৯১০ সালে মহকুমা প্রশাসকের বেঞ্চ কোর্ট ফৌজদারি কোর্টে উন্নীত হয়। ১৯২১ সালে গোপালগঞ্জ শহরের মানে উন্নীত হয়। আদমশুমারি অনুযায়ী তখন গোপালগঞ্জ শহরের লোকসংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৪ শত ৭৮ জন। ১৯২৫ সালে গোপালগঞ্জে সিভিল কোর্ট চালু হয়।

১৯৩৬ সালে মুকসুদপুর থানা বিভক্ত হয়ে কাশিয়ানী থানা গঠিত হয়। ১৯৭৪ সালে গোপালগঞ্জ সদর থানাকে ভেঙ্গে টুঙ্গিপাড়া নামক একটি থানা গঠন করা হয়। ১৯৮৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি গোপালগঞ্জ মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করা হয়। গোপালগঞ্জ জেলার প্রথম জেলা প্রশাসক ছিলেন জনাব এ.এফ.এম. এহিয়া চৌধুরী। বর্তমান জেলা প্রশাসক জনাব কাজী মাহবুবুল আলম ২০২২ সালের ০৪ ডিসেম্বর থেকে অদ্যাবধি দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এখানেই জন্ম রিকশা চালক স্বপনের সন্তান শহীদ আরাফাত মুন্সি। অভাবের ঘরে জন্ম নেওয়া মেধাবী ছাত্র শহীদ আরাফাত মুন্সির স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে সেনাবাহিনীর উচ্চপর্যায়ের একজন কর্মকর্তা হয়ে দেশের সেবা করা।

নাটকীয় হাসপাতাল যাত্রা

আহত আরাফাত মুন্সিকে বহনকারী এম্বুলেন্স ঢাকা শাহবাগ মোড় দিয়ে যাবার সময় সেখানে টহলরত পুলিশ আর বিজিবি এম্বুল্যান্সের গতিরোধ করে। আটকে দেয় তাদের গাড়ি। খুনি পুলিশ আর নিষ্ঠুর বিজিবি গুলিবিদ্ধ আহত আরাফাত মুন্সিকে হাসপাতালে ভর্তি হতে দিবে না। আহত আরাফাত মুন্সিকে সাহয্যকারী জনতা বিভিন্নভাবে তাদেরকে বুঝাতে থাকেন। কিন্তু তারা কোনোভাবেই এই রোগীকে হাসপাতালে নিতে দিবে না। তাহলে নাকি তাদের

চাকরি থাকবে না। স্বৈরাচারের পাচাটা এই বাহিনী দুটোকে নানাভাবে বুঝাতে বুঝাতে অনেক সময় চলে যায়। স্বৈরাচার পুলিশ আর বিজিবি এরকম সরকারি আক্রমণে আহত রোগীকে কোনো হাসপাতালে কিছুতেই ভর্তি হতে দিবে না। ওইদিকে আহত

আরাফাত মুন্সির অবস্থা খুবই খারাপ। প্রতিনিয়ত রক্তক্ষরণ হচ্ছে তার শরীর থেকে। এমন সময় আহত আরাফাত মুন্সিকে বাঁচানোর জন্য নতুন কৌশল জনতার মস্তিষ্ককে বাসা বাঁধল। তাদের মনে পড়ে গেলো বাংলাদেশের পুলিশের চিরায়ত চরিত্রের কথা। সাথে সাথে তারা পুলিশের একজন অফিসারকে একপাশে ডেকে নিয়ে তার হাতে বেশ কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে উর্ধ্বতন কর্মকতাকে ম্যানেজ করতে অনুরোধ করে। হারামখোর সেই পুলিশের চেষ্টায় অবশেষে কাজ হলো। তারপর আবার ঢাকা গণস্বাস্থ্য মেডিকেলের দিকে ছুটে চলে আহত আরাফাত মুন্সিকে বহন করা এম্বুলেন্সটি। বিকেল পৌনে ৫.০০ টার দিকে তাকে নিয়ে এম্বুলেন্স পৌঁছালো ঢাকা গণস্বাস্থ্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইমারজেন্সি বিভাগে।

হাসপাতালে ভর্তিতে বাধা

হাসপাতালে পৌঁছে আহত আরাফাত মুন্সিকে ভর্তি করতে গেলে সেখানেও আসে বাধা। স্বৈরাচার সরকারের বাহিনী দ্বারা আহতদেরকে ভর্তি নিতে তারা প্রচন্ড রকম নারাজ। মনে হয় যেন পুরো দেশটাকে তারা ইজারা নিয়েছে। এমন মুহূর্তে কি করবে তা বুঝায় আসে না আরাফাতের কারও।

এমন খেয়াল তামাশায় সন্ধা ৬.০০ টায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

০৮ নং মহারাজপুর ইউনিয়ন পরিষদ

মৃত্যু সনদ

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শহীদ পরিবারে আর্থিক অনুদান দিয়েছে বিএনপি

খায় শহিদ দুই ছাত্র সাবিদ আরাফাত

শিশু আরাফাতের খুনের বিচার দ্রুত দেখতে চাই

শহিদ আরাফাত হোসেন

গণস্বাস্থ্য সমাজ ভিত্তিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

মৃত্যুর সনদপত্র

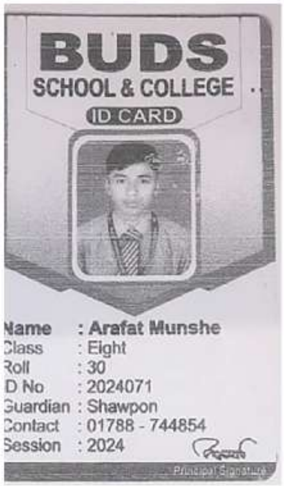
BUDS
SCHOOL & COLLEGE
ID CARD

Name : Arafat Munshe
Class : Eight
Roll : 30
ID No : 2024071
Guardian : Shawpon
Contact : 01788 - 744854
Session : 2024

Principal Signature

একনজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: শহীদ আরাফাত মুন্সি
জন্ম	: ১ জানুয়ারি ২০১১
পেশা	: ছাত্র
স্কুলের নাম	: বার্ডস স্কুল এন্ড কলেজ
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম : ছোট বনগ্রাম,, ইউনিয়ন : মহারাজ পুর, থানা : মুকসুদপুর, জেলা : গোপালগঞ্জ
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা : বটতলা, এলাকা : পলাশবাড়ী, থানা : আশুলিয়া, জেলা : ঢাকা
পিতা	: স্বপন
পেশা ও বয়সা	: রিকসা চালক ও ৩৫
মাতা	: মায়া বেগম
পেশা ও বয়স	: গৃহিণী ও ৩৪
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ২

প্রস্তাবনা

১। শহীদ আরাফাত মুন্সির পিতা ও মাতার জন্য স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা

২। শহীদ পরিবারের জন্য আজীবন মাসিক ১৫০০০ টাকা হারে অনুদান চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা

‘আমরা জানি না কীভাবে কী করবো! কীভাবে বাবার রেখে যাওয়া ঋণ পরিশোধ করব!’

শহীদ মো: গনি মিয়া

ক্রমিক : ২৫২

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১২০

শহীদ পরিচিতি

তেজস্বী মহাবীর শহীদ মো: গনি মিয়া। নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেশ মাতার স্বাধীনতা অর্জনে বিশেষ ভুমিকা রেখেছেন। হে বীর ভ্রাতা আপনাকে হাজারো সালাম। শেরপুর জেলার শ্রীবরদী ঝিনিয়া গ্রামের বাসিন্দা মৃত ফজল হক ও হাজারা বেগমের প্রিয় সন্তান তিনি। ১৯৮৫ সালের ১৮ জুন পিতা মাতার কোল আলোকিত করে জন্ম নেয় ২৪ এর মুক্তিকামী এই মুক্তিযোদ্ধা। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর মোছা: সবুজা বেগমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। মৃত্যুকালে আত্মীয় স্বজন, দুই ছেলে ও এক মেয়ে রেখে ধরাধাম থেকে বিদায় নিয়েছেন পরম শ্রদ্ধেয় শহীদ গনি মিয়া।

পেশাগত পরিচয়

পেশা হচ্ছে কোন ব্যক্তির নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ পরবর্তী জীবন-জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা। পেশাগত পরিচয়ের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তির ভূমিকা, দায়িত্ব, মূল্যবোধ এবং নৈতিক মানগুলির সারিবদ্ধতা এবং তাদের নির্দিষ্ট পেশা দ্বারা গৃহীত সামঞ্জস্যপূর্ণ

অনুশীলন। ঠিক তেমনি বাল্যকাল থেকে গনি মিয়া পারিবারিক ভাবে দায়িত্বশীল হয় উঠেছিলেন। আর্থিক সংকুলান না থাকায় ছোট থেকেই পরিবারের দায়িত্ব এসে বর্তায় তাঁর উপর। কখনও শ্রমিক, কখনওবা রিক্সা চালক। দিনরাত পরিশ্রম করে এভাবেই সংসারের হাল ধরেছিলেন তিনি। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যাক্তি হিসেবে তিনি ছিলেন অনুপম। অভাব অনটনের পরিবার আরেকটু ভালো থাকবে সেই আশায় ছয় মাস আগে বাড়ি ছেড়ে ঢাকায় গিয়েছিলেন গনি মিয়া। শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলার স্থানীয় একটি চালকলে কাজ করতেন ৩৮ বছর বয়সী এই যুবক। ভেবেছিলেন ঢাকায় গিয়ে রিক্সা চালিয়ে পরিবারের অভাব দূর করবেন। সেই সুদিন আর আসলো না গনি মিয়া ও তাঁর পরিবারের।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

শহীদ ঢাকার তেজগাঁও এলাকার নাখালপাড়ায় একটি মেসে উঠেছিলেন। গত ১৯ জুলাই ২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ছাত্র-জনতাদের সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তীব্র সংঘর্ষ চলে। সাধারণ জনতার উপর নরপশুরা গুলি বর্ষণ করে। আওয়ামী স্বৈরাচারী হাসিনা তার বিতর্কিত সন্ত্রাসী সংগঠন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়। সেদিন সন্ধ্যায় মহাখালীতে গ্যারেজে রিকশা রেখে ঘরে ফেরার পথে আওয়ামী সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনীর একটি গুলি তাঁর বুকে এসে বিদ্ধ হয়। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয় সে রক্তাক্ত শরীর নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। পথচারীরা তাঁকে দ্রুত নিকটবর্তী একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে সেখানে কোনো চিকিৎসক উপস্থিত না থাকায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কয়েক ঘণ্টা পর শাহাদত বরণ করেন শহীদ গনি মিয়া। শহীদের লাশ বাড়িতে নেওয়ার মতো আর্থিক সামর্থ্যও ছিল না শহীদ পরিবারের। অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া মেটাতে মানুষের কাছে হাত পাততে হয়েছে। পরবর্তীতে শ্রীবর্দী উপজেলার খড়িয়া কাজিরচর ইউনিয়নে নিজ গ্রামে জানাজা শেষে শহীদ গণি মিয়ার দাফন সম্পন্ন হয়।

প্রিয়জনদের অনুভূতি

শহীদের বড় ভাই হাফিজ উদ্দিন বলেন, আমার ভাইয়ের তিন সন্তান রয়েছে। গণি পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিল। তাঁকে হারিয়ে পরিবারটি এখন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। আমি আমার ভাই হত্যার বিচার চাই।

প্রতিবেশী এক চাচা বলেন, গনি যখন ঢাকায় যায় তখন পরিবারের ওপর দুই লাখ টাকা ঋণের বোঝা ছিল। সেই ঋণ পরিশোধ করতেই গনি ঢাকায় গিয়েছিলেন।

শহীদের বড় ছেলে ১৬ বছর বয়সী শহীদুল ইসলাম বলেন, "আমার বাবা স্বপ্ন দেখতেন, পরিবারের অভাব দূর হয়ে ভালো দিন আসবে। কিন্তু এখন আমাদের কী হবে জানি না, হয়তো ছোট ভাইয়ের মতো আমাকেও স্কুল ছাড়তে হবে। বর্তমানে আমরা জানি না কীভাবে কী করব, কীভাবে বাবার রেখে যাওয়া ঋণ পরিশোধ করব।"

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ গণি মিয়ার দুই ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। বড় ছেলে শহীদুল ইসলাম (১৬) স্থানীয় কলেজের একাদশ শ্রেণীতে অধ্যায়ন করছে। ছোট ছেলে সুমন ইসলাম (১৪) অভাবের কারণে দুই বছর আগে পড়ালেখা বাদ দিয়েছে। মাসে ছয় হাজার টাকা বেতনে একটি ওয়ার্কশপে কাজ করেন তিনি। একমাত্র মেয়ে গোলাপি। যার বয়স মাত্র তিন বছর। শহীদ প্রতি সপ্তাহে এক থেকে দেড় হাজার টাকা বাড়িতে পাঠাতেন, তা দিয়েই চলতো তাঁর অবহেলিত টানাপোড়েনের সংসার। মৃত্যুকালে তিনি কোন জায়গা জমি রেখে যেতে পারেন নি।

নিউজ লিংক

https://ournewsbd.net/%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%af%e0%a6%bc-%e0%a6%97%e0%a7%81%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%a4-%e0%a6%b6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%80%e0%a6%ac/

Medical Certificate of Cause of Death

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
জন্ম সনদ
নিবন্ধনের তারিখ: ০৭-১২-২০১১
নাম: শহিদুল ইসলাম
জন্ম তারিখ: ২৪-০৯-২০০৯
জন্ম স্থান: গ্রামঃ পশ্চিম ঝিনিয়া, ডাকঘরঃ ঝিনিয়া, শ্রীবরদী, শেরপুর।
পিতার নাম: মোঃ গণি মিয়া
মাতার নাম: মোছাঃ সবুজা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রামঃ পশ্চিম ঝিনিয়া, ডাকঘরঃ ঝিনিয়া, শ্রীবরদী, শেরপুর।

একনজরে শহীদের তথ্যাবলি

নাম	: শহীদ মো: গণি মিয়া
পিতা	: মৃত ফজল হক
মাতা	: হাজারা বেগম
জন্ম তারিখ	: ১৯৮৫ সালের ১৮ জুন
স্থায়ী ঠিকানা	: শেরপুর জেলার শ্রীবর্দী উপজেলার খড়িয়া কাজিরচর গ্রাম
আহত হওয়ার সময় কাল	: ১৯ জুলাই ২০২৪, মহাখালী
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ১৯ জুলাই ২০২৪
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশের গুলি
শহীদের কবরস্থান	: শ্রীবর্দী উপজেলার খড়িয়া কাজিরচর ইউনিয়ন নিজ গ্রামের কবরস্থান

সন্তানের বিবরণ

১. মো: শহীদুল ইসলাম (১৬) শেরপুর স্থানীয় কলেজের একাদশ শ্রেণীতে অধ্যায়ন করছেন
২. মো: সুমন ইসলাম (১৪) একটি ওয়ার্কশপে কাজ করেন। ৩. মোছা: গোলাপি আক্তার (৩)

প্রস্তাবনা

১. শহীদের এতিম সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে
২. শহীদ পরিবারে মাসিক বা এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে
৩. স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে
৪. শহীদ স্ত্রীকে কর্মসংস্থান করে দেয়া যেতে পারে

"দুধ ডেলিভারি দিতে গিয়ে বলি হলেন স্বৈরাচারের বুলেটের"

শহীদ মো: মোবারক

ক্রমিক : ২৫৩

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১২১

পরিচিতি

শহীদ মো: মোবারক ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সরাইল উপজেলায় জন্মগ্রহণ করে। তাঁর পিতা জনাব রমজান আলী এবং মাতা মোছা: ফরিদা বেগম।

শহীদ মোবারক ছিলো একজন কিশোর। ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়াশোনা করতো। কিশোর মোবারক ছিলো মেধাবী এবং পরিশ্রমী। পড়াশোনার পাশাপাশি তাঁর বাবার সাথে গরুর খামারে কাজ করতো।

জালিমের ঘাতকের বুলেটের আঘাতে অকালেই প্রাণ দিতে হয় এই মেধাবী তরুণকে। ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই মাত্র ১৩ বছর বয়সে পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে শাহাদাত বরণ করতে হয় তাকে।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ মোবারক হোসেনের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৭ জন। তার পরিবার রাজধানীর কলাবাগানে বসবাস করতো। পিতা জনাব রমজান আলী গরুর খামারে গরু লালন-পালনের কাজ করেন। তাঁর আয় দিয়েই পরিবার চলে। মোবারকের ভাই-বোন সবাই পড়াশোনা করে। বড় ভাই রতন ৮ম শ্রেণিতে, বোন রত্না ৭ম

শ্রেণিতে, ছোট বোন স্বপ্না ৫ম শ্রেণিতে এবং ফাতিহা ৪র্থ শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে। রমজান আলীর একার পক্ষে এত বড় পরিবারকে চালানো খুবই কষ্টকর। এজন্য পিতার সাথে শহীদ মোবারক এবং বড় ভাই রতন সহযোগিতা করতো। মোবারকের শাহাদাতে পরিবারে শোকের বন্যা বইছে।

বিস্তারিত ঘটনা

দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের পর ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। নির্বাচন দিলেও সেটি ছিল একটি পাতানো নির্বাচন। এই প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে আওয়ামীলীগ। দলের প্রধান হিসেবে সরকার হোন শেখ হাসিনা। ক্ষমতায় এসেই শুরু করে নানান অরাজকতা। বিডিআর বিদ্রোহের মাধ্যমে পিলখানা ট্রাজেডি ঘটানো হলো। যেখানে নিহত হয় ৫৭ জন চৌকস সেনা অফিসার সহ অসংখ্য সেনা ও বিডিআর সদস্য।

২০১৩ সালে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামি ১৩ দফার দাবিতে একত্রিত হয়। তাদের উপর নির্বিচারে গুলি করে পাখির মত হত্যা করে অসংখ্য হেফাজত কর্মীকে। ঘটনা ধামাচাপা দিতে রাতের আধারে লাশ গুম করে ফেলে স্বৈরাচারী সরকারের বিভিন্ন সহযোগী বাহিনী।

নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনেও সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর আওয়ামী সরকারের সহচর ছাত্রলীগের ক্যাডাররা সন্ত্রাসী কায়দায় হামলা চালায়।

স্বৈরাচার শেখ হাসিনার কাছে মানুষ খুন করা ছিল ছেলে খেলা। বিরোধী দলকে দমন করতে গুম-খুন, হত্যা, গ্রেফতার,দমন -নিপীড়ন চালানো হতে থাকে নিয়মিতভাবে। বিরোধী দলের অসংখ্য নেতা কর্মীকে নির্বিচারে হত্যা করে। মানবতাবিরোধী অপরাধ ও মিথ্যে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ এনে আল্লামা মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাইদীকে দিনের পর দিন কারাগারে আটকে রাখে। ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে জামায়াতে ইসলামীর অসংখ্য নিরপরাধ নেতৃবৃন্দকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে। আয়না ঘরে বন্দী করে রেখে অমানবিক নির্যাতন চালায় অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে।

শুধু তাই নয় ব্যাংক লুট, অর্থ পাচার, দুর্নীতি, ঘুষ, চাঁদাবজি, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ইত্যাদির মাধ্যমে দেশে এক অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করে। সরকারের অতিরিক্ত ব্যয়ের অর্থের যোগান দিতে জনগণের উপর মাত্রাতিরিক্ত ট্যাক্স আরোপ করে। দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। নিম্ন আয়ের মানুষ পরিবারের ব্যয় বহন করতে না পেরে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে।

কেউ অপকর্মের প্রতিবাদ করতে গেলে স্বাধীনতা বিরোধী বলে গলা চেপে ধরে। জনগণের বাকস্বাধীনতা হরণের মাধ্যমে সমালোচনার সকল পথ বন্ধ করে দেয়।

ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে। পরপর দুইটি প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার সকল আয়োজন সম্পন্ন করে। প্রতিটি সেক্টরে বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে। সরকারি চাকরিতে কোটা প্রথার মাধ্যমে মেধাবীদের অবমূল্যায়ন করা হয়। দলীয় অযোগ্য স্বল্পশিক্ষিত কর্মীদের অবৈধভাবে সরকারের বিভিন্ন কর্মে নিয়োগ প্রদান করে।

ছাত্রজনতা এসব বৈষম্য মেনে নিতে পারেনি। ২০১৮ সালে ছাত্র-জনতা কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু করে। সেখানে শেখ হাসিনার নির্দেশে ছাত্রলীগ হামলা চালায়। আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করতে সরকার নির্বাহী আদেশে কোটা প্রথা বাতিল করার কথা বললেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। তাইতো ২০২৪ এ এসে আবারো আন্দোলন শুরু করে ছাত্র জনতা। জনগণের মনে দীর্ঘ দিনের ক্ষোভ এই আন্দোলনে এসে ফেটে পড়ে। ছাত্রদের সাথে সাধারণ মানুষও যুক্ত হতে থাকে বৈষম্যের বিরুদ্ধে। অবিরাম আন্দোলন

চলতে থাকে। ১৩ জুলাই ছাত্র-জনতা মিছিল নিয়ে শাহবাগে আসে। সেখানে পুলিশ বাঁধা প্রদান করে। ছাত্র-জনতা পুলিশের বেরিকেড ভেঙে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। লাগাতার আন্দোলন চলতে থাকে। ১৪ তারিখ রাতে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্র-জনতা কে রাজাকারের বাচ্চা বলে গালি দেয়। মুহুর্তেই ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রজনতা 'তুমি কে আমি কে? রাজাকার রাজাকার' বলে স্লোগান দিতে থাকে। পরদিন ১৫ তারিখ

ছাত্র-জনতা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে অবস্থান করে। অপরদিকে ছাত্রলীগ লাঠিসোঁটা, রামদা, চাপাতি, হকিস্টিক স্ট্যাম্প, লোহার রড ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর হামলার সকল প্রস্তুতি নেয়। হঠাৎ করেই তারা ছাত্রজনতার উপর ঝাপিয়ে পড়ে। ৭১'র ২৫ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যেভাবে ঢাকার ঘুমন্ত মানুষের উপর হামলা চালিয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে ছাত্রলীগ ও ছাত্রজনতার উপর হামলা চালায়। বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে অবস্থান নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের পিটিয়ে আহত করে। তাদের হাত থেকে নিরীহ বোনরাও রক্ষা পায় না। অনেকের মাথা ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসে। অনেকের হাত-পা ভেঙে দেয়। হল গুলোতে প্রবেশ করে নির্যাতন চালায়। তারা ছাত্রীদের গায়ে হাত তুলতেও দ্বিধাবোধ করে না। শত শত ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার্থী আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি হয়। ছাত্রলীগ হাসপাতালে গিয়েও ভর্তিরত আহত শিক্ষার্থীদের উপর হামলা ও নির্যাতন চালায়। ছাত্রলীগের ভয়ে পালিয়েও রক্ষা মেলে না। ১৬ তারিখ হামলার প্রতিবাদে সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল হয়। এই দিনে শহীদ আবু সাইদ বুক পেতে দেয় ঘাতকের বুলেটের সামনে। পুলিশের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় আবু সাইদের শরীর। আবু সাইদের মৃত্যু পুরো দেশকে কাঁদিয়ে দেয়। ১৮ তারিখ ছাত্র-জনতা কম্প্লিট শাট ডাউন ঘোষণা করে। সেদিন রণক্ষেত্রে পরিণত হয় ঢাকা শহর। ছাত্র-জনতার সাথে পুলিশ, আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। ছাত্র-জনতাকে লক্ষ করে কাদাঁনে গ্যাস , রাবার বুলেট, গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। গ্রেনেডের শব্দে কেঁপে ওঠে ঢাকা শহর। শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়। তাদেরকে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নিহত হয় আরও অনেকে।

সারাদেশে রাতভর সাড়াশি অভিযান পরিচালনা করে পুলিশ। চিরুনি অভিযান চালিয়ে ঢাকার বিভিন্ন ছাত্রাবাস থেকে নিরপরাধ ছাত্রদেরকে ধরে এনে অমানবিক নির্যাতন চালায় পুলিশ। এসব দৃশ্য দেখে সাধারণ মানুষের বিবেক কেঁদে উঠে। কেউ ঘরে বসে থাকতে পারে না। সবাই যার যার জায়গা থেকে আন্দোলনে যুক্ত হয়। কেউ পানি দিয়ে, খাবার দিয়ে কেউ আবার আশ্রয় দিয়ে ছাত্রদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে।

১৯ জুলাই সকাল ১০ টায় শহীদ মোবারক হোসেন বাসা থেকে বের হয়ে আন্দোলনে যোগ দেয়। সেদিন সকাল থেকেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকে। স্বৈরাচারের পুলিশ বাহিনী সাজোয়াজান ও আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আন্দোলন প্রতিহত করতে মরিয়া হয়ে উঠে। সকালের পর থেকে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে রাজধানীর ধানমণ্ডি ও মোহাম্মদপুর এলাকা। সকাল থেকে পুলিশ ও আন্দোলনকারীদের সাথে সংঘর্ষ শুরু হয় একটানা বিকেল তিনটা পর্যন্ত চলে এই সংঘর্ষ।

আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে রাবার বুলেট, টিয়ারসেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে পুলিশ। ছাত্র-জনতা ইট পাটকেল ছুড়ে পুলিশকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশ বাহিনী অতর্কিত গুলি চালালে সেখানে ছাত্র জনতা টিকে থাকতে পারে না। কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়ায় উপস্থিতদের চোখে জ্বালাপোড়া শুরু হয়। একের পর এক সাধারণ শিক্ষার্থী গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় পড়ে যায়। অনেকে সেন্সলেস হয়ে যায়। আহত হয় শতাধিক। মুহুর্তের মধ্যেই রাজধানীর গ্রীণ রোড এলাকা মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়।

অদম্য সাহসী কিশোর মোবারক প্রতিদিনের মত সেদিনও খামারের দুধ নিয়ে ডেলিভারি দিতে যাচ্ছিলেন। গ্রীণ রোড এলাকা দিয়ে যখন যাচ্ছিলেন তখন তিনি সংঘর্ষের মুখে পড়েন। পুলিশের ছোড়া গুলি থেকে একটি গুলি এসে শহীদ মোবারকের মাথায় বিদ্ধ হয়। গুলির আঘাতে তাঁর মাথার মগজ বেরিয়ে পড়ে। আহত মোবারককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে ভর্তি থাকা অবস্থায় ২০ জুলাই ২০২৪ তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

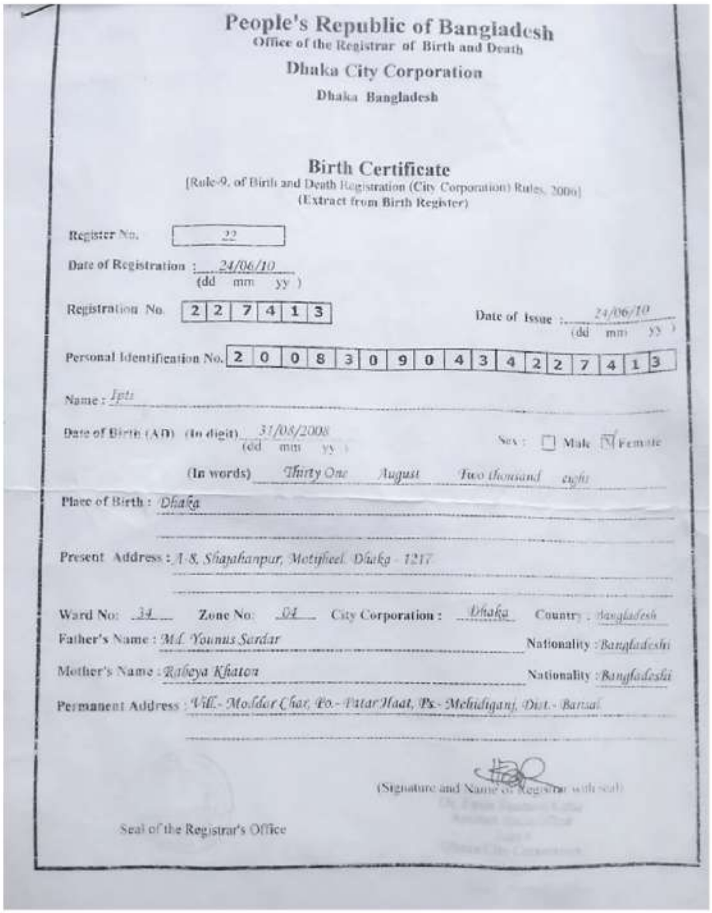

People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar of Birth and Death
Dhaka City Corporation
Dhaka Bangladesh

Birth Certificate
[Rule-9, of Birth and Death Registration (City Corporation) Rules, 2006]
(Extract from Birth Register)

Register No. 22
Date of Registration : 24/06/10 (dd mm yy)
Registration No. 2 2 7 4 1 3
Date of Issue : 24/06/10 (dd mm yy)
Personal Identification No. 2 0 0 8 3 0 9 0 4 3 4 2 2 7 4 1 3
Name : Ipti
Date of Birth (AD) (In digit) 31/08/2008 (dd mm yy)
Sex : ☐ Male ☑ Female
(In words) Thirty One August Two thousand eight
Place of Birth : Dhaka
Present Address : A-8, Shajahanpur, Motijheel, Dhaka - 1217
Ward No: 34 Zone No: 04 City Corporation : Dhaka Country : Bangladesh
Father's Name : Md. Younus Sardar Nationality : Bangladeshi
Mother's Name : Rabeya Khatun Nationality : Bangladeshi
Permanent Address : Vill.- Moldar Char, Po.- Patar Haat, Ps.- Mehidiganj, Dist.- Barisal

(Signature and Name of Registrar with seal)

Seal of the Registrar's Office

একনজরে

নাম	: শহীদ মোবারক
জন্ম তারিখ	: ৩১-০৮-২০০৮
পিতা	: জনাব রমজান আলী
মাতা	: মোছা: ফরিদা বেগম
পেশা	: ছাত্র
স্থায়ী ঠিকানা	: সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
বর্তমান ঠিকানা	: কলাবাগান, ঢাকা
আহত হওয়ার তারিখ	: ১৯/০৭/২৪
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ২০/০৭/২৪

মা তুমি চিন্তা করো না,
আমি মরে গেলে তোমাকে বীরের মা বলে ডাকবে মানুষ,
তুমি শহীদের মায়ের সম্মান পাবে।

শহীদ মো: রাসেল গাজী

ক্রমিক : ২৫৪

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১২২

শহীদের জীবনী

শহীদ মো: রাসেল গাজী ২০ মার্চ ১৯৯৭ সালে ঢাকা জেলার আশুলিয়া থানার গাজীরহাট মধ্যপাড়া মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা বেলায়েত গাজী ও মাতা সেলিনা বেগম। তিন ভাই বোনের মধ্যে শহীদ রাসেল ছিলেন সবার ছোট। রাসেলকে সবাই ভালোবাসতো। রাসেল এবং তার বড় ভাই এখনো বিয়ে করেনি। নিজস্ব কোন জমিজমা না থাকায় শহীদ রাসেলের পরিবার তার বোনের বাসায় বসবাস করেন। রাসেল যখন খুব ছোট তখন বরিশালে তাদের ভিটেমাটিসহ সব নদীতে বিলীন হয়ে যায় । তারপর তার পরিবার ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় এসেও তাদের সংগ্রাম করে পরিবার চালাতে হয়। অতি কষ্টে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করা সম্ভব হয় শহীদ রাসেলের। আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে শহীদ রাসেলের পিতা মারা যান। তারপর থেকে আরো কঠিন হয়ে যায় পথ চলা তার পরিবারের। মৃত্যুকালীন অবস্থায় তিনি তার এক বোনজামাইয়ের স্কুলে চাকরি করতেন। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে তিনি খুব পছন্দ করতেন। স্বৈরাচার পতনের আন্দোলনে সকল সময় তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। শহীদ রাসেল এবং তার বড় ভাই নিয়মিত একই সঙ্গে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেন।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

৫ আগস্ট ২০২৪, সোমবার। তিনি বড় ভাইয়ের আগেই আন্দোলনে চলে যান। লোভী শেখ হাসিনা ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য সাধারণ জনতার উপরে ইচ্ছে অনুযায়ী গুলিবর্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রশাসনকে এবং তার দলীয় ক্যাডারদের। পুলিশ বাহিনী এবং তার দলীয় ক্যাডাররা সেই নির্দেশ অনুযায়ী গুলি চালালে শত শত মানুষ নিহত হয়। হাজারো শহীদদের ভিড়ে শহীদ রাসেল এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে জায়গা করে নেন। শহীদ মো: রাসেল গাজী পুলিশের গুলিতে পরপারে পাড়ি জমান শহীদের মর্যাদা নিয়ে।

“মা তুমি চিন্তা করো না, আমি মরে গেলে তোমাকে বীরের মা বলে ডাকবে মানুষ, তুমি শহীদের মায়ের সম্মান পাবে। তোমাকে সবাই শ্রদ্ধা করবে। আমি সবার কাছে আমার ভুল ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। আমাকে সবাই মাফ করে দিবেন।” ৫ আগস্ট সকালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যোগ দিতে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় এ কথা বলে বেরিয়ে যান শহীদ মো: রাসেল গাজী। এটাই মায়ের সঙ্গে তার শেষ কথা। শুরু থেকেই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন শহীদ রাসেল গাজী ও তার বড় ভাই ফয়সাল গাজী। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ও ইসলাম এবং ইসলামী আন্দোলনের জন্য তারা জীবন দিতে প্রস্তুত। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার গণহত্যা, বিভিন্ন দুর্নীতি ভোট জালিয়াতি ও অর্থপাচারের মত বড় বড় অপরাধ রাসেল গাজী এবং তার ভাইকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তাই তারা নিজেদের পরিবারের চাইতেও আন্দোলনকে বেশি গুরুত্ব দিতেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রথম থেকেই শহীদ রাসেল গাজীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিলো। বিগত ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচী ঘোষণা করে। উক্ত কর্মসূচী প্রতিহত করার জন্য সরকার কারফিউ জারি করে। শহীদ রাসেল্ সহ অন্যান্য ছাত্র-জনতা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সকাল ১০ টায় বাইপাইল মোড় পুলিশ বক্সের সামনে সমবেত হয়। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ উক্ত মিছিলে পুলিশ এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে। একটি গুলি এসে রাসেলের পাজরে লেগে পিছন থেকে বের হয়ে যায়। সাথে সাথে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয় লোকজন তাকে গণস্বাস্থ্য মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান। সেখান থেকে এনাম মেডিকেল কলেজে স্থানান্তর করার সময় ৫:৩০ মিনিটে এম্বুল্যান্সেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শহীদ রাসেলের মত হাজারো জীবনের বিনিময়ে আজ আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি স্বৈরাচার শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারকে পতন করতে পেরেছি। আজ শহীদ রাসেলের রক্তের উপর সবুজ ঘাস জন্মেছে। সেই ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে লক্ষ কোটি মানুষ আজ একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার করছে। শহীদ রাসেলের মত মানুষগুলো যদি জীবন না হারাতো তাহলে আজ আমরা পরাধীনতার ভিতরেই আবদ্ধ থাকতাম।

বড় ভাই ফয়সালের বক্তব্য

মৃত্যু সকলের জন্য অবধারিত কেউ স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করে আবার কেউ অস্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে। আর কিছু মৃত্যু হয় স্মরণীয় মৃত্যু। আর আমার ভাই রাসেল সবসময় সেই স্মরণীয় মৃত্যুই কামনা করত। তার মৃত্যুতে আমি মোটেও দুঃখিত না। বরং শহীদের ভাই হতে পেরে আমি গর্বিত। ৫ আগস্ট ২০২৪ বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় রাসেল সবার কাছে মাফ চেয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ পাক যেন তাকে জান্নাত নসিব করেন।

শহীদ রাসেলের মায়ের বক্তব্য

আমার রাসেলের কোন দোষ ছিল না, তারপরেও কেন তাকে মরতে হলো এর বিচার চাই। আমার ছেলে কোন অন্যায় করত না কিন্তু সে সত্য ন্যায়ের পথে চলার চেষ্টা করত। আমার পরিবারে অর্থ উপার্জনের একমাত্র ব্যক্তি ছিল আমার রাসেল। এখন আমি কিভাবে আমার পরিবার পরিচালনা করব। আমার বড় ছেলে ফয়সাল বেকার অবস্থায় আছে। যারা আমাকে এত কষ্টের মধ্যে ফেলে দিল তারা কি আমার জবাব দিতে পারবে? আমার কষ্ট কি লাঘব করতে পারবে? আমার সন্তানকে যারা হত্যা করেছে তাদের আমি উপযুক্ত শাস্তি চাই।

শহীদ রাসেলের স্বপ্ন

শহীদ রাসেল ভাবতো, আমরা কবে স্বাধীনতা অর্জন করব? দেশের উপর আমাদের যে অধিকার সে অধিকার আমরা কবে ফিরে পাব। আমাদের কোন সম্পদ নেই কিন্তু এ দেশের তো সম্পদ আছে! আমরা কেন মানুষের বাড়িতে ভাড়ায় থাকবো আমাদের তো ইচ্ছা হয় এদেশের সরকার আমাদের একটি সুন্দর বাড়ি করে দিবে। সেই বাড়িতে আমার পরিবার কে নিয়ে সুখের সাথে বসবাস করবো। শহীদ রাসেল এ ধরনের স্বপ্ন আঁকতেন সব সময়।

কিন্তু তার স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল কোটি কোটি ডলার বিদেশে পাচার করা হলেও শহীদ রাসেলের মত ভিটেমাটিহীন পরিবারের জন্য একটি বাড়ি করে দেওয়ার সামর্থ্য স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ সরকারের হয়নি। অবশেষে তাকে শহীদ করা হলো।

পারিবারিক অবস্থা

তিন ভাইবোন খুব কষ্টে বড় হয়েছেন। এই পৃথিবীতে তাদের কোন স্থায়ী সম্পত্তি নেই। আজ থেকে প্রায় ১০ বছর আগে পিতা মারা যান। এখন মা এবং বড় ভাই সৈয়দ রাসেল, বড় বোনের বাসায় থাকেন। বড় ভাইয়ের কোন উপার্জন নেই। তাই অনেক কষ্ট করেই তাদের জীবন অতিবাহিত হচ্ছে।

ZTETA

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Dhamsona Union Parishad
Savar, Dhaka
(Rule 9, 10)

জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate

Date of Registration	Birth Registration Number	Date of Issuance
18/08/2024	19972617239168831	18/08/2024

Date of Birth : 20/03/1997 Sex : Male
In Word : Twentieth of March Nineteen Ninety Seven

নাম	: মোঃ রাসেল গাজী	Name	: Md Rasel Gazi
মাতা	: সেলিনা বেগম	Mother	: Selina Begum
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: মোঃ বেলায়েত গাজী	Father	: Md Belayet Gazi
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
জন্মস্থান	: ঢাকা, বাংলাদেশ	Place of Birth	: Dhaka, Bangladesh
স্থায়ী ঠিকানা	: গাজিরচট মধ্যপাড়া, উত্তর গাজিরচট- ১৩৪৯, ওয়ার্ড - ৭, ধামসোনা, সাভার, ঢাকা	Permanent Address	: Gazirchat Maddha Para, Uttar Gazirchat-1349, Ward - 7, Dhamsona, Savar, Dhaka

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
Motiul Alam
Administrative Officer

Seal & Signature
Registrar
Md. Abdul Kader Dewan
Acting Chairman
Panel Chairman-1
Dhamsona Union Parishad
Ashulia, Savar, Dhaka.

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code.

এক নজরে শহীদ মোঃ রাসেল গাজী

নাম	: মোঃ রাসেল গাজী
জন্ম তারিখ	: ২০-৩-১৯৯৭
জন্ম স্থান	: গাজীরচট মধ্যপাড়া, আশুলিয়া, ঢাকা
পেশা	: প্রাইভেট স্কুলের পিয়ন
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম গাজীর চট মধ্য পাড়া, ইউনিয়ন: আলিয়া মাদ্রাসা, থানা: আশুলিয়া, জেলা: ঢাকা
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম গাজীর চট মধ্য পাড়া, ইউনিয়ন: আলিয়া মাদ্রাসা, থানা: আশুলিয়া, জেলা: ঢাকা
পিতা	: মৃত : বেলায়েত গাজী
মাতা	: সেলিনা বেগম (গৃহিনী)
ভাই	: ফইসাল গাজী (৩৩) (চাকুরী)
বোন	: শারমিন আফরোজ (৩৬)বিবাহিতা
ঘটনার স্থান	: বাইপাইল মোড়, পুলিশ বক্স
আঘাতকারীর নাম	: পুলিশ
আহত হবার সময়	: ০৫-৮-২০২৪ (সকাল ১০টা)
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ০৫-৮-২০২৪, বিকল ৫:৩০, এনাম মেডিকেল কলেজ, ঢাকা
জানাজা	: ০৫-৮-২০২৪ রাত ১০:০০
কবরের অবস্থান	: দরগার পার কবরস্থান আশুলিয়া সাভার ঢাকা

প্রস্তাবনা

১. নিয়মিত মাসিক সহযোগিতা
২. বড় ভাই ফয়সালের চাকরি

'দুনিয়া তো শান্ত হয়েছে, আমার মনিরে কেউ ফিরায় দিতি পারবা'

শহীদ মো: মিঠু বিশ্বাস মারুফ

ক্রমিক : ২৫৫

আইডি : ঢাকা বিভাগ-১২৩

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মিঠু বিশ্বাস মারুফ মাগুরা সদর উপজেলার হাজিপুর ইউনিয়নের আলাইপুর গ্রামের মো: শাহাজান ইসলাম ও মালা আক্তার দম্পতির কনিষ্ঠ ছেলে। ২০০৫ সালের ২৫ অক্টোবর মাগুরা জেলায় তাঁর জন্ম হয়। শহীদ পিতা রাজধানীর সাভার এলাকায় একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে চাকুরি করেন। মিঠু সাভার টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজের ২০২২-২০২৩ সেশনের ডিজিটাল টেকনোলজি ইন বিজনেস গ্রুপে অধ্যয়ন করতেন। তাঁর ক্লাস রোল ছিল ৫২। শহীদের বড় ভাই কওমি মাদরাসা থেকে দাওরা পাশ করেছেন। স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় তিনি শিক্ষকতা করতেন। কিছুদিন আগে মারাত্মক এক্সিডেন্ট করায় এই মুহূর্তে পরিবারের সাথেই দিনাতিপাত করছেন শহীদ সহোদর।

আওয়ামী শাসনামল

সন্ত্রাসী শাসনামলে দ্রব্যমূল্যের যে উগ্রগতি ছিল তাতে মাছ মাংস তো দূরের কথা ঠিকমতো মানুষ সবজিও কিনতে পারত না। অথচ আওয়ামী দুর্নীতিবাজরা, মন্ত্রী থেকে শুরু করে সামান্য কর্মী পর্যন্ত

হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছে। কারও বাড়ির চাকর পর্যন্ত ৪০০ কোটি টাকার মালিক বনে গিয়েছে। এমন ভাব যেন হেলিকপ্টার ছাড়া যাতায়াত করতে পারে না। মন্ত্রী এমপি থেকে শুরু

করে পাতিনেতা, আওয়ামী সমর্থক চোর ছেচ্চর লুটেরা বাটপাররা এদেশের সিংহভাগ সম্পত্তির দখল নেয়। দেশটা তাদের বাপের সম্পত্তি মনে করে সবকিছু বাটোয়ারা করে। কানাডা, আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং ভারতীয় ধনীদের সাথে টেক্কা দিয়ে জায়গা জমি সম্পদ বাড়াতে ব্যস্ত হয়েছিল তারা। এসব দুর্নীতি দেখে জনগণ একপর্যায়ে রাস্তায় নেমে আসে। বাধ্য হয়ে সরকারের টুটি চেপে ধরে। শতশত ছাত্র-জনতার তাজা প্রানের বিনিময়ে দেশ উদ্ধার করতে সক্ষম হয় স্বাধীন দেশের নাগরিকগন।

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রথম থেকেই শহীদ মিঠুর সক্রিয় অংশগ্রহন ছিলো। বিগত ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কর্তৃক খুনি, ফ্যাসিস্ট, স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। উক্ত কর্মসূচী প্রতিহত করার জন্য সরকার কারফিউ ঘোষণা করে। শহীদ মিঠু সহ অন্যান্য ছাত্রজনতা উক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য সাভার অধঃচন্দ্র স্কুলের সামনে সমবেত হয়। দুপুরের পরপর খবর আসে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। মুহূর্তে সাভার এলাকায় বিজয় মিছিল শুরু হয়। আনন্দঘন পরিবেশ তৈরি হয়। মরণকামড় দিতে তখনও হাসিনার পালিত নরখাদক পুলিশ বাহিনী গণহারে গুলি চালাতে থাকে। একটু পর আসরের আজান হলে স্থানীয় মসজিদে নামাজ আদায় করতে যায় মিঠু। নামাজ শেষে ফেরার পথে ঘাতক পুলিশের একটি গুলি শহীদের বুকে এসে বিদ্ধ হয়। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। তারপরও থামেনি ঘাতক দল। অস্ত্র ঠেকিয়ে আবারও তাঁর বুকে গুলি চালানো হয়। জখম নিথর দেহে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তিনি। পরবর্তীতে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে সাভার এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকেরা জনায় মিঠু বিশ্বাস মারুফ আর নেই। তিনি এই পৃথিবী ছেড়ে মহান আল্লাহর দরবারে পাড়ি জমিয়েছেন।

পরিবারের অনুভূতি

কান্না জড়িত কণ্ঠে শহীদ জননী মালা আক্তার বলেন- 'আমার মনি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল কেন? আমি কেমনে বেঁচে থাকব? পুলিশ আমার মনির বুকটা গুলি করে ঝাজরা করে দিছে। আমার মনিরে কেউ ফিরায় দিতে পারবা?'

এক নজরে শহীদের তথ্যাবলি

নাম	: মো: মিঠু বিশ্বাস মারুফ
জন্ম তারিখ	: ২৫-১০-২০০৫
পেশা	: ছাত্র
প্রতিষ্ঠান	: সাভার টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজ
সেশন	: ২০২২-২০২৩
গ্রুপ	: ডিজিটাল টেকনোলজি ইন বিজনেস
রোল	: ৫২
পিতা	: মো: শাহাজান ইসলাম, পেশা: চাকরি, বয়স: ৫০
মাতা	: মোছা: মালা আক্তার, পেশা: গৃহিণী, বয়স: ৪৬
আহতের সময়কাল	: ০৫-০৮-২৪, বিকাল ৫.১৫, সাভার অধঃচর্ন্দ্র স্কুলের সামনে
মৃত্যুর সময়কাল	: ০৫-০৮-২৪, সাভার এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে
কবর	: আলাইপুর, ওয়ার্ড-০৫, সদর, মাগুরা
পারিবারিক অবস্থা	: গ্রামের বাড়ীতে অসম্পূর্ণ বসবাসে অনুপযোগী একটি বাড়ি আছে। বসতি জমি নেই
প্রস্তাবনা	: ১. শহীদ পরিবারে মাসিক বা এককালীন সহযোগিতা করা যেতে পারে
	: ২. শহীদের বড় ভাইকে চিকিৎসা বাবদ সহযোগিতা করা প্রয়োজন
	: ৩. বাসস্থান নির্মাণ করতে আর্থিক সহযোগিতা করা যেতে পারে

“বাবা আমার লাশটা নিয়া যাইও, আমি মইরা যামু”

শহীদ নাফিসা হোসেন মারওয়া

ক্রমিক : ২৫৬

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১২৪

জন্ম ও পরিচিতি

শহীদ নাফিসা হোসেন মারওয়া ২০০৭ সালের ৪ মে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের টঙ্গী পূর্ব থানার এরশাদ নগর এলাকায় জন্মগ্রহন করেন। তার পিতা আবুল হোসেন ও মাতা কুলসুম বেগম। পরিবারে দুই বোনের মধ্যে সে ছিল বড়। তার ছোট বোন রাইসা ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী।

ব্যক্তিগত জীবন

সতেরো বছরের শহীদ নাফিসা হোসেন মারওয়া। চলতি বছর টঙ্গীর শাহাজ উদ্দিন সরকার স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছিল। তার ব্যবহার খুব ভাল ছিলো। সে খুব মেধাবী ছিল। সারাক্ষণ বাসায় পড়াশুনা করতো। সে কোনদিন কারও সাথে খারাপ ব্যবহার করেনি। সে সবসময় পর্দার মধ্যে থাকতো।

পারিবারিক অবস্থা

নাফিসার বাবা আবুল হোসেন একজন ছোট চায়ের দোকানদার। কিন্তু প্রিয় মেয়েকে হারিয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকার কারণে চায়ের দোকান ঠিকভাবে চালাতে পারছে না। তাই একমাত্র আয়ের

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
জেলা: গাজীপুর, বাংলাদেশ।
জন্ম নিবন্ধন সনদ

নাম: নাফিসা হোসেন মারওয়া
জন্ম তারিখ: [redacted]
লিঙ্গ: নারী
জন্মস্থান: গাজীপুর
পিতার নাম: আবুল হোসেন
পিতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী
মাতার নাম: কুলসুম বেগম
মাতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

উৎসটিও এখন বন্ধ হয়ে আছে। পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা ফেরাতে নাফিসার মা কুলসুম বিদেশে পাড়ি জমান কয়েক বছর আগে। তার মা কুয়েত প্রবাসী হলেও; এখন নিয়মিত টাকা পাঠাতে পারছেন না। নাফিসা ও তার ছোট বোন রাইসাকে নিয়ে বাবা আবুল হোসেন টঙ্গীর এরশাদ নগর বস্তি এলাকার আট নাম্বার ব্লকে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকেন।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে জনগণ নানান অন্যায়, শোষণ, নিপীড়ন ও জুলুমের নির্মম ভুক্তভোগী। এদেশের মুক্তিকামী জনতা সময়ের দাবিতে সাড়া দিয়ে এহেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে বারংবার রুখে দাঁড়িয়েছে। সেই সাথে হুংকার দিয়ে সংগ্রামী জনতার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে ছাত্রবৃন্দ। উপরোক্ত গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সাক্ষী, দেশের ক্রান্তিকালে বরাবরই ছাত্রদের মাধ্যমে আন্দোলন সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটে।

দীর্ঘ ১৫ বছরে আওয়ামী দুঃশাসন, ভোটচুরি, দুর্নীতিন, খুন, অন্যায়, অত্যাচার জনমনে ফেলেছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কোটা প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবার ষড়যন্ত্র শুরু করে আওয়ামী সরকার। ২০১৮ সালে ছাত্রছাত্রীদের প্রবল আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সকল দাবী মেনে নিলেও তার অন্তরে ছিল হিংসার অগ্নিগিরি। তাই ২০২৪ তালে একটি বিরোধী দলহীন নির্বাচনে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর আবার কোটা ফিরিয়ে আনতে চাইল হাসিনা সরকার। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল গত ১ জুলাই থেকে। অহিংস এই আন্দোলন ১৫ জুলাই থেকে সহিংস হয় । আন্দলোনে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর সশস্ত্র ঘাতক ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও পুলিশ, জঅই সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে। রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাতের পর থেকেই আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নিরীহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় নিরস্ত্র নিপীড়িত জনতা।

ঘটনাপ্রবাহ

৫ জুন - ৯ জুলাই

৫ জুন হাইকোর্ট ২০১৮ সালে সরকারের কোটা বাতিলের সিদ্ধান্তকে অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেয়। ৬ জুন আদালতের রায়ের প্রতিবাদে ও কোটা বাতিলের দাবিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রত্যাশীরা বিক্ষোভ করে। ৯ জুন হাইকোর্টের রায় স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষ আবেদন করে। ১০ জুন আন্দোলনকারীরা দাবি মেনে সরকারকে ৩০ জুন পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয় ও ঈদুল আযহার কারণে আন্দোলনে বিরতি ঘোষণা করে। ৩০ জুন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে মানববন্ধন করে। ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করে ও তিনদিনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। এদিন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে এবং চট্টগ্রাম

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিনারের সামনে অবস্থান নেয়। ২ থেকে ৬ জুলাই দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ, মানববন্ধন, মহাসড়ক অবরোধ ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করে। ৭ জুলাই শিক্ষার্থীরা 'বাংলা ব্লকেড'-এর ডাক দেয় যার আওতায় শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ সমাবেশ, মিছিল, মহাসড়ক অবরোধ ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করে। ৮ ও ৯ জুলাই একই রকম কর্মসূচি পালন করা হয়।

বাংলা ব্লকেড ও শিক্ষার্থীদের উপর হামলা

১০ - ১৫ জুলাই

১০ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে জড়ো হয়ে শাহবাগে গিয়ে স্থানটি অবরোধ করে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা শিক্ষার্থীদের সামনে ব্যারিকেড দিয়ে অবস্থান করে। দুপুরে জানা যায় কোটাব্যবস্থা বাতিল করে হাইকোর্টের দেয়া রায়ে চার সপ্তাহ স্থিতাবস্থা দেওয়া হয়েছে।

১১ জুলাই ৩টা থেকে শাহবাগ অবরোধের কথা থাকলেও বৃষ্টির ফলে শিক্ষার্থীরা শাহবাগে যাওয়ার পথে পুলিশের বাধাকে অতিক্রম করে ৪:৩০ টায় শুরু করে। ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা পুলিশি বাধার ফলে পিছিয়ে যায় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে শাহবাগে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যোগ দেয়। চট্টগ্রামে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে মিছিল নিয়ে ২নং গেইট ও টাইগারপাস এলাকায় অবস্থান নেয়।তখন অনেক শিক্ষার্থী পুলিশের হামলার শিকার হয়। ঐ দিন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশ হামলা করে। রাত ৯টায় শিক্ষার্থীরা আন্দোলন শেষ করে তাদের উপর পুলিশি হামলার প্রতিবাদে ১২ জুলাইয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের ঘোষণা দেয়।

১২ জুলাই ৫টায় শিক্ষার্থীরা প্রশাসনের সতর্কবাণী উপেক্ষা করে শাহবাগে জড়ো হয়ে অবরোধ করে। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করতে থাকলে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের একদল কর্মী আক্রমণ করে। বিকেল ৫টার দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেশন বাজারসংলগ্ন ঢাকা-রাজশাহী রেললাইন অবরোধে সারা দেশের সঙ্গে রাজশাহীর রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

১৩ জুলাই রাজশাহীতে রেলপথ অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করে। ঢাকায় ঢাবির শিক্ষার্থীরা সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলন করেন, তারা অভিযোগ করেন "মামলা দিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে বাধার চেষ্টা করা হচ্ছে।"

১৪ জুলাই আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ঢাকায় গণপদযাত্রা করে রাষ্ট্রপতি মু. সাহাবুদ্দিন বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে। কোটা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া বক্তব্যের প্রতিবাদে মধ্যরাতে শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস এলাকায় বিক্ষোভ করে। সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ৪জি নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দিতে অপারেটরদের নির্দেশনা দেয়। সে দিন রাত সাড়ে ১১টার দিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কাটা পাহাড় সড়কে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের বিক্ষোভে হামলা চালায় ঘাতক ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা । এতে এক নারী শিক্ষার্থীসহ দুজন আহত হয়েছেন। এর আগে ক্যাম্পাসের জিরো পয়েন্ট বিক্ষোভ শুরু করেন কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা।

১৫ জুলাই কোটা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হল, সূর্যসেন হল ও ক্যাম্পাসের বেশ কয়েকটি জায়গায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ছাত্রলীগের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। এতে শতাধিক ছাত্রের আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। ১৫ জুলাই বিকেলে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচির কারণে ক্যাম্পাসে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের কুখ্যাত নেতাকর্মীদের হাতে রড, লাঠি, হকি স্টিকসহ বিভিন্ন অস্ত্র দেখা যায়। বিকেল সাড়ে পাঁচটার পরও শহীদুল্লাহ হলের সামনে থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনের এলাকায় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ও সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনকারীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা, মারধর ও সংঘর্ষের ঘটনায় আহত অন্তত ২৯৭ জন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে ১৫ জুলাই সোমবার রাত ১০টার পর থেকে শিক্ষার্থীদের মুঠোফোন তল্লাশি করে মারধর করা হয়।

দুপুর ২:৩০ টায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ক রাফিকে কে শাটল থেকে অপহরণ করে প্রক্টর অফিসে নিয়ে আটকিয়ে রাখে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। তখন আন্দোলনকরীদের একটি অংশ রাফিকে উদ্ধার করতে মিছিল নিয়ে প্রক্টর অফিসে যাওয়ার সময় শহীদ মিনারের সামনে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আন্দোনলকারী শিক্ষার্থীদের উপর হামলা করে।এতে কয়েকজন শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হয়।

১৬ জুলাই

১৬ জুলাই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীরা খুনি ছাত্রলীগের হামলার ভয়ে উপাচার্যের বাসভবনের ভেতরে আশ্রয় নেন। রাত সোয়া ২টার দিকে কলঙ্কিত ছাত্রলীগের কুখ্যাত নেতাকর্মীরা সেখানে ঢুকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের মারধর করে। এর আগে রাত ১২টার পর আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা হয়। এছাড়াও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনকারী সাধারণ শিক্ষার্থী ও ক্যাম্পাসের ত্রাস ছাত্রলীগের কর্মীদের সাথে বেশ সংঘর্ষ হয়। রাজধানীর মেরুল বাড্ডায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে ব্র্যাক বিশবিদ্যালয় জধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এবং স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা ভাটারা এলাকার প্রগতি স্মরণী ও কুড়িল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। সকাল ১১টায় টাঙ্গাইল পৌরসভার সামনে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের মিছিল শহিদ মিনারের কাছে পৌঁছালে লাঠি ও লোহার রড নিয়ে তাদের ওপর হামলা করে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। দুপুর ১টায় মিরপুর ১০-এ রাস্তা বন্ধ করে

বিক্ষোভরত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজিসহ মিরপুরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীদের লাঠিসোঁটা নিয়ে যুবলীগ, শ্রমিক লীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের একটি বিরাট দলসহ নেতা-কর্মীরা এসে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের ওপর হামলা করে। দুপুর আড়াইটা থেকে তিনটার দিকে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সাথে পুলিশের সহিংসতার ঘটনা ঘটে। হাসপাতালটির পরিচালক ডা. মোঃ ইউনুস আলী জানান, "এক শিক্ষার্থীকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। এ ছাড়া আহত অবস্থায় আরও ১৫ জন হাসপাতালে এসেছেন।" বিকেল ৪টার দিকে চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছেন, যার মধ্যে একজন চট্টগ্রাম কলেজের শিক্ষার্থী ও আরেকজন পথচারী। বিকেলে রাজধানীর ঢাকা কলেজের সামনে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সংঘর্ষের মধ্যে এক যুবক নিহত হন। পুলিশের নিউমার্কেট অঞ্চলের জ্যেষ্ঠ সহকারী কমিশনার মো. রিফাতুল ইসলাম বলেন, "বিকেলে ঢাকা কলেজের সামনের রাস্তায় একদল লোককে এক ব্যক্তিকে পেটাতে দেখেছেন তারা। পরে শুনেছেন, তিনি ঢাকা মেডিকেলে মারা গেছেন।" সংঘাত ছড়িয়ে পড়ায় এইদিন সন্ধ্যায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়া ও রাজশাহী শহরে বিজিবি মোতায়েন করা হয়। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে ইন্টারনেট ব্যবহার করে ফেসবুক ব্যবহার করতে সমস্যা হওয়ার খবর পাওয়া যায়।

১৭ জুলাই

১৭ জুলাই ইউজিসি সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের ঘোষণা দেয় এবং নিরাপত্তার স্বার্থে শিক্ষার্থীদের হল ছাড়তে বলা হয়। এদিন গ্রামীণফোন কোম্পানিসহ সকল মোবাইল কোম্পানীকে সরকার সকল ধরনের ইন্টারনেট সেবা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়।

সর্বাত্মক অবরোধ

১৮-১৯ জুলাই

১৮ জুলাই সকালে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায় যে, কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারীদের ঘোষিত কমপ্লিট শাটডাউনকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ঢাকাসহ সারাদেশে ২২৯ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। সকাল ১১টার দিকে মিরপুর ১০-এ বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজিসহ মিরপুরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উপর আক্রমণ করে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মী এবং পুলিশ। আন্দোলনকারীদের ওপর সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করা হয়। এতে পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। সকাল ১১টার দিকে সকাল থেকে আন্দোলনরত ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা রামপুরা ব্রিজ থেকে মেরুল বাড্ডা এলাকায় সড়ক অবরোধ করায় তাদের ছত্রভঙ্গ করেতে কাঁদানে গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড ছোঁড়ে পুলিশ। একই সাথে তাদেরকে আক্রমণ করে ছাত্রলীগ এবং আওয়ামীলীগ কর্মীরা। দুপুর ১২টার দিকে সকাল থেকে আন্দোলনরত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস ও স্থানীয় অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উপর আক্রমণ করে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মী এবং পুলিশ। আন্দোলনকারীদের ওপর সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ার শেল নিক্ষেপ করা হয়। এতে পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। দুপুর ২টার দিকে পুলিশের গুলিতে নর্দান ইউনিভার্সিটির ২ শিক্ষার্থী নিহত ও শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়। আহত শিক্ষার্থীদের হাসপাতালে নেয়া হয়। দুপুর ৩টার দিকে পুলিশের ধাওয়ায় মধ্যে পড়ে মাদারীপুর সরকারি কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়। এছাড়াও রামপুরায় পুলিশের সাথে বেসরকারি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের ঘটনায় এক গাড়ি চালক পুলিশের গুলিতে নিহত হন। এদিন সরকারের নির্দেশে ৪জি মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ করে ইন্টারনেটের গতি কমিয়ে দেওয়া হয়। রাত ৯টার দিকে সরকার সারাদেশে সব ধরনের ইন্টারনেট সেবা বিচ্ছিন্ন করে দেয় সরকার।

১৯ জুলাই শিক্ষার্থীদের আন্দোলন রোধ করতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ঢাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য সব ধরনের সভা-সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে ঢাকার সাথে সারাদেশের ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। মধ্যরাতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামকে আটক করা হয়। এছাড়া গণঅধিকার পরিষেদের সভাপতি নুরুল হক নুরকেও আটক করা হয়। যেসময়ে নাহিদ ইসলামকে আটক করা তার কাছাকাছি সময়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তিনজন প্রতিনিধির সাথে সরকারের তিনজন প্রতিনিধির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় যেখানে তারা সরকারের কাছে 'আট দফা দাবি' জানান। বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় সংবাদপত্র অনুযায়ী ১৯ জুলাই শুক্রবার সারাদেশে কমপক্ষে ৫৬-৬৬ জনের মৃত্যু হয়।

সংলাপ ও সুপ্রিম কোর্টের রায়

২০ - ২২ জুলাই

২০ জুলাই তৃতীয় দিনের মতো সারা বাংলাদেশ ইন্টারনেটবিহীন ছিল। সেনাবাহিনীকে দেশের বিভিন্ন অংশে কারফিউর অংশ হিসেবে টহল দিতে দেখা যায়। ১৯ জুলাই শুক্রবার মধ্যরাতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তিন প্রতিনিধির সাথে সরকারের তিনজন মন্ত্রীর যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সেই বৈঠক ও বৈঠকে উত্থাপিত দাবি নিয়ে নেতৃত্বের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। কারফিউর মধ্যেই যাত্রাবাড়ী, রামপুরা-বনশ্রী, বাড্ডা, মিরপুর, আজিমপুর, মানিকনগরসহ ঢাকার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভকারীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। পুলিশ টিয়ারশেল, সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এইসব সংঘর্ষে দুইজন পুলিশসহ অন্তত ১০ জন নিহত হন, অন্তত ৯১ জন আহত হন। কোটা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নাহিদ ইসলামকে মধ্যরাতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তুলে নিয়ে যায়।

২১ জুলাই চতুর্থ দিনের মতো সারা বাংলাদেশ ইন্টারনেট বিহীন ছিল ও সারাদেশে কারফিউ বলবৎ ছিল। ভোরে ঢাকার পূর্বাচল এলাকায় আন্দোলের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামকে পাওয়া যায় ও পরে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। ১৬ জুলাই রাষ্ট্রপক্ষের করা লিভ টু আপিলের প্রেক্ষিতে সকাল ১০টার দিকে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে কোটা নিয়ে আপিল বিভাগের শুনানি শুরু হয়। সব পক্ষের শুনানি শেষে দুপুর ১টার দিকে রায় ঘোষণা করা হয়। রায়ে হাইকোর্টের দেওয়া রায় বাতিল করা হয় ও সরকারি চাকরিতে মেধার ভিত্তিতে ৯৩ শতাংশ নিয়োগ দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। এদিন ঢাকায় বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে i⊠্যাব, পুলিশ ও বিজিবি ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায়। যাত্রাবাড়ীতে সারাদিন ধরে আন্দোলনকারীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় সহিংসতায় পাঁচজন নিহত হয়। সেতু ভবন ভাঙ্গচুর, রামপুরার বিটিভির ভবনে আগুন দেয়া ও বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ভিন্ন ভিন্ন মামলায় পুলিশ বিএনপি নেতা আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, নিপুণ রায় ও গণঅধিকার পরিষদের নেতা নুরুল হক নুরকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একটি পক্ষ '৯ দফা' দাবি জানিয়ে শাটডাউন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়।

২২ জুলাই পঞ্চম দিনের মতো সারা বাংলাদেশ ইন্টারনেট বিহীন ছিল ও তৃতীয় দিনের মতো সারাদেশে কারফিউ বলবৎ ছিল। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম চার দফা দাবি জানিয়ে ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়ে 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচি স্থগিত করেন।

আন্দোলন স্থগিত ও গণগ্রেফতার

২৩ - ২৮ জুলাই

২৩ জুলাই ষষ্ঠ দিনের মতো সারা বাংলাদেশ ইন্টারনেট বিহীন ছিল। তবে রাতের দিকে ঢাকা ও চট্টগ্রামে সীমিত আকারে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট চালু করা হয়। এছাড়া চতুর্থ দিনের মতো সারাদেশে কারফিউ বলবৎ ছিল। ২১ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়ের পর ২৩ জুলাই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কোটা সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে।

২৪ জুলাই সীমিত পর্যায়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট চালু হলেও মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ থাকে। পঞ্চম দিনের মতো সারাদেশে কারফিউ বলবৎ ছিল, তবে তা শিথিল পর্যায়ের। চিকিৎসাধীন অবস্থায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের মৃত্যু হয় ও নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৯৭ হয়। শিক্ষার্থীদের মতে নিহতের সংখ্যা আরও অনেকগুণ বেশি যা ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় জানা যায় নি। ২৪ জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন মামলায় পুলিশ ১,৭৫৮ জনকে গ্রেফতার করে। বিক্ষোভের সময় সেনা মোতায়েন পর জাতিসংঘের লোগো সংবলিত যান ব্যবহৃত হলে জাতিসংঘ এই নিয়ে উদ্বেগ জানায়। ১৯ জুলাই থেকে নিখোঁজ থাকার পর ২৪ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ, আবু বাকের মজুমদার ও রিফাত রশীদের খোঁজ পাওয়া যায়। ২৪ জুলাই রাত পর্যন্ত আরও ৪ জনসহ মোট ২০১ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়।

২৫ জুলাই বিকেল পর্যন্ত ব্রডব্যান্ডে ধীরগতির ইন্টারনেট পাওয়া যায়। সরকার ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বন্ধ রাখে, এদিন আন্দোলনকারীদের প্ল্যাটফর্ম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আটটি বার্তা দেওয়া হয়।

২৬ জুলাই নাহিদ ইসলামসহ কোটা সংস্কার আন্দোলনের তিন সমন্বয়ককে রাজধানীর গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল থেকে তুলে নিয়ে যায় সাদাপোশাকের এক দল ব্যক্তি। তারা নিজেদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়েছেন বলে সেখানে উপস্থিত এক সমন্বয়কের স্বজন ও হাসপাতালের চিকিৎসকেরা জানান।

২৭ জুলাই তিন সমন্বয়ককে ঢাকার গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। নিরাপত্তা নিয়ে কোনো শঙ্কা থাকলে তাদের পরিবারের কাছে না দিয়ে ডিবি হেফাজতে নেওয়া হলো কেন, সেই প্রশ্ন তুলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি দল। তিন শিক্ষার্থীর খোঁজখবর নিতে ডিবি প্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশীদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যান এই শিক্ষকেরা। যদিও শিক্ষকদের সাথে দেখা করতে ডিবিপ্রধান অস্বীকৃতি জানান। আন্দোলন ঘিরে বিক্ষোভ, সংঘাত, ভাঙচুর, সংঘর্ষ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় সারা দেশে সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা ভাগ করে 'ব্লক রেইড' দিয়ে অভিযান চালানো হয়।

২৮ জুলাই ভোরে কোটা সংস্কার আন্দোলনের আরেক সমন্বয়ক নুসরাত ডিবি হেফাজতে নেয়া হয়। বেলা ৩টা থেকে চালু করা হয় মোবাইল ইন্টারনেট। তবে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, টিকটকসহ বিভিন্ন সেবা বন্ধ রাখা হয়। ডিবি হেফাজতে থাকা সমন্বয়কদের কয়েকজনের পরিবার মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে গেলেও তাদেরকে পরিবারের সাথে দেখা করতে দেয় নি। রাত ১০টার দিকে পুলিশি হেফাজতে থাকা ৬ সমন্বয়ক আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। কিন্তু পুলিশে আটক হওয়া অবস্থায় পুলিশের অফিসে বসেই বাকি সমন্বয়কারীদের সাথে যোগাযোগ না করে এমন ঘোষণা দেয়ায় এই ঘোষণাকে সরকার ও পুলিশের চাপে দেয়া হয়েছে বলে আখ্যায়িত করে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয় বাকিরা। রাত ১১টার দিকে সমন্বয়কদের জিম্মি ও নির্যাতন করে বিবৃতি দেয়ানোর প্রতিবাদে পরদিন ২৯ জুলাই আবারও রাজপথে আসার ঘোষণা দেয় দেশের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকার বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা।

পুনঃসূচনা

২৯ জুলাই - ৩ আগস্ট

২৯ জুলাই জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি ঘটনার তদন্ত দাবি করে বিবৃতি দেয় বিক্ষুব্ধ ৭৪ বিশিষ্ট নাগরিক। প্রথম আলোর রিপোর্ট বিশ্লেষণে দেখা যায়, নিহতদের বেশিরভাগই কম বয়সী ও শিক্ষার্থী। বিক্ষোভ দমনে প্রাণঘাতী অস্ত্র (বুলেট বা গুলি) ব্যবহার করা হয়েছে বলে মনে করেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন। রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবরেটরি, বাড্ডা, ইসিবিসহ বেশ কয়েকটি এলাকায় আবারও বিক্ষোভ করার চেষ্টা করে কিছু শিক্ষার্থী। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, চট্টগ্রামসহ অনেক স্থানে বিক্ষোভ মিছিল করেছে শিক্ষার্থীরা। চট্টগ্রামে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ কর্মসূচি সাউন্ড গ্রেনেড ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুঁড়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয় কোটা সংস্কার আন্দোলনকে বলপূর্বক নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে আন্দোলনের সমন্বয়কদের অবৈধভাবে তুলে নিয়ে গোয়েন্দা শাখার কার্যালয়ে আটকে রেখে ভিডিও বার্তার মাধ্যমে কর্মসূচি প্রত্যাহারের ঘোষণা পড়তে বাধ্য করানোর ঘটনা নিরেট মিথ্যাচার, প্রতারণামূলক ও সংবিধান পরিপন্থী উল্লেখ করে

৩১ জুলাই হত্যা, গণগ্রেপ্তার, হামলা, মামলা ও গুমের প্রতিবাদে ৩১ জুলাই বুধবার সারাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন 'মার্চ ফর জাস্টিস' (ন্যায়বিচারের জন্য পদযাত্রা) কর্মসূচি পালন করে। চট্টগ্রামে সকাল ১০টার দিক থেকে শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়ে এক বিক্ষোভ মিছিল করে। এরপর পুলিশের বাধা ভেঙে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা আদালত চত্বরেও প্রবেশ করে। বিকেল ৩টায় ১৩ দিন বন্ধ থাকার পর ফেইসবুক ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম খুলে দেওয়া হয়।

১ আগস্ট গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) হেফাজতে থাকা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছয় সমন্বয়ককে বেলা দেড়টার একটু পরেই ছেড়ে দেওয়া হয়। সারাদেশে ছাত্র-জনতার ওপর হত্যা, গণগ্রেপ্তার, হামলা-মামলা, গুম-খুন ও শিক্ষকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে এবং ৯ দফা দাবি আদায়ে বৃহস্পতিবার 'রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোজ' (আমাদের বীরদের স্মরণ) কর্মসূচি পালন করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। দৃশ্যমাধ্যম শিল্পীসমাজ কোটা সংস্কার আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ৯ দফা দাবির সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে বিক্ষোভ ও সমাবেশ করে।

২ আগস্ট গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) হেফাজত থেকে ছাড়া পাওয়া বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ছয় সমন্বয়ক গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বলেন যে আন্দোলন প্রত্যাহার করে ডিবি অফিস থেকে প্রচারিত ছয় সমন্বয়ককের ভিডিও বিবৃতি তারা স্বেচ্ছায় দেননি। বিবৃতিদাতা মো. নাহিদ ইসলাম, সারজিস আলম, হাসনাত আব্দুল্লাহ, আসিফ মাহমুদ, নুসরাত তাবাসসুম ও আবু বাকের মজুমদারের ভাষ্য অনুযায়ী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশেই তাদের আটকে রাখা হয়েছিল। এদিন দুপুর ১২ টার পর থেকে মোবাইল নেটওয়ার্কে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক আবার বন্ধ করা হয়। পরবর্তীতে ৫ ঘণ্টা পর ফেসবুক-মেসেঞ্জার আবার চালু করা হয়। এদিন সকালে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আবহানী মাঠ সংলগ্ন সড়কে হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করে অবিলম্বে সরকারের পদত্যাগসহ তিন দফা দাবিতে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে গণহত্যা ও নিপীড়নবিরোধী শিল্পীসমাজ। এছাড়া কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জড়ো হয়ে কোটা আন্দোলনে হতাহতের ঘটনায় বিচার দাবি করে প্রতিবাদী সমাবেশ করে চিকিৎসক, মেডিকেল ও ডেন্টাল শিক্ষার্থীরা। ঢাকার বায়তুল মোকাররম, সাইন্স ল্যাব, উত্তরা, আফতাবনগরে গণমিছিল ও বিক্ষোভ হয়। এছাড়া চট্টগ্রাম, সিলেট, বগুড়া, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, নোয়াখালী সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় গণমিছিল হয়। সিলেটে 'গণমিছিলে' পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ও শটগানের গুলি ছুড়লে অন্তত ২০ জন আহন হন। ঢাকার উত্তরায় বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশ ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে সাউন্ড গ্রেনেড ও কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে পুলিশ। সিলেটে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঘোষিত প্রার্থনা ও ছাত্র-জনতার গণমিছিল এর অংশ হিসেবে জুমার নামাজের পর হবিগঞ্জে শহরের বোর্ড মসজিদের সামনে অবস্থান নেন শিক্ষার্থীরা। পূর্ব টাউন হল এলাকায় অবস্থান নেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। পরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশছাত্রলীগের সংঘর্ষ হয়। পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে দেশের অন্তত ২৫টি জেলায় শিক্ষার্থীরা গণমিছিল করে। নরসিংদীতে শিক্ষার্থীদের গণমিছিলে ওপর ছাত্রলীগ-যুবলীগের হামলায় অন্তত ১২ জন আহত হয়। খুলনায় বিক্ষোভকারীদের মিছিলে পুলিশ টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে এবং লাঠিচার্জ করে। শিক্ষক ও নাগরিক সমাজের ডাকা দ্রোহযাত্রায় কয়েক হাজার মানুষ যোগ দেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ছাত্র-জনতার আন্দোলনে হামলা ও হত্যার প্রতিবাদসহ পূর্বঘোষিত নয় দফা দাবিতে শনিবার (৩ আগস্ট) সারাদেশে বিক্ষোভ মিছিল ও রবিবার (৪ আগস্ট) থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। রাতে গণভবনে জরুরি বৈঠকে আওয়ামী লীগ ও ১৪ দলের নেতাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি দলকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের সঙ্গে আলোচনা করার নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী। ৩ আগস্ট রংপুর সদরে আন্দোলনকারীরা "ছি ছি হাসিনা, লজ্জায় বাঁচি না" বলে স্লোগান দিচ্ছেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্দোলনকারীদের আলোচনার প্রস্তাব দেন, তবে দুপুরে কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম জানান সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসার কোনো পরিকল্পনা তাদের নেই। রাজধানীর আফতাবনগরের ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করে শিক্ষার্থীরা। রাজশাহীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাজারখানেক শিক্ষার্থী শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মিছিল বের করে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) সামনে জড়ো হয়ে স্লোগান দেয়। এদিন শিক্ষার্থীরা এক দফা, এক দাবি নিয়ে মাঠে নামে। তারা প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে। কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে রাজধানীর ধানমন্ডির রবীন্দ্রসরোবরে

সংগীতশিল্পীদের প্রতিবাদী সমাবেশ হয়। বিকেল চারটার পর বিক্ষুব্ধ জনতা বিরাট মিছিল নিয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের দিকে যাত্রা শুরু করে। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ একত্র হয়। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে শহীদ মিনারে সমবেত ছাত্র-জনতার উদ্দেশে বক্তব্য দেন কোটা সংস্কার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া সংগঠনটির সমন্বয়ক মো. নাহিদ ইসলাম। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার মন্ত্রিসভার পদত্যাগের একদফা দাবি ঘোষণা করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক আরিফ সোহেলকে জামিন দেয় আদালত। চট্টগ্রাম নগরে শিক্ষামন্ত্রীর বাসায় হামলা হয়। এর আগে বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে চট্টগ্রাম নগরের লালখান বাজারে চট্টগ্রাম১০ আসনের সংসদ সদস্য মো. মহিউদ্দিন বাচ্চুর কার্যালয়েও হামলা হয়। গাজীপুরের শ্রীপুরে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে একজন নিহত হন। রাত সোয়া ৮টার দিকে শেখ হাসিনা পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষক ও কলেজের অধ্যক্ষদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। রংপুরে কোটা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদের মৃত্যুর ঘটনায় দুই পুলিশ সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। সিলেটে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচি চলাকালে পুলিশের সঙ্গে ছাত্র-জনতার সংঘর্ষ চলে। বিকেল ৫টার পর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সাড়া দিয়ে মহাখালী ও মিরপুর ডিওএইচএসের ভেতরে বিক্ষোভ হয়। ডিওএইচএসে মূলত সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যরা বসবাস করেন। কর্মসূচিতে বিপুলসংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত সদস্য ছাড়াও তাদের পরিবারের সদস্যরাও অংশ নেন।

৪ আগস্ট মহাখালী ডিওএইচএসের রিটায়ার্ড আর্মড ফোর্সেস অফিসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনে (রাওয়া ক্লাব) সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ৪৮ জন সাবেক সেনা কর্মকর্তা। এদের মধ্যে ছিলেন সাবেক সেনাপ্রধান এম নুর উদ্দিন খান, মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, কায়সার ফজলুল কবির, জামিল ডি আহসান, রেজাকুল হায়দার, মুজাহিদ উদ্দিন, আবুল কালাম হুমায়ুন কবির প্রমুখ। ইকবাল করিম ভূঁইয়া বলেন, আক্রমণকারীরা গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিরোধের মধ্যে পিছপা হতে বাধ্য হলে, পরবর্তী পর্যায়ে ব্যবহার করা হলো বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীকে। তাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, কখনো সম্মুখভাগে, কখনো পেছনে ও পাশে দাঁড় করিয়ে অন্য বাহিনীগুলো এই গণ-আন্দোলনের ওপর তাদের জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। কোনোভাবেই এমন পরিস্থিতির দায় দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীর নেওয়া উচিত নয়। বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী অতীতে কখনো দেশবাসী বা সাধারণ জনগণের মুখোমুখি দাঁড়ায়নি, তাদের বুকে বন্দুক তাক করেনি। শেষে সাবেক সেনাপ্রধান বলেন, 'একটি রাজনৈতিক সংকটকে সামরিকীকরণের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, আমরা সশস্ত্রবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা এর তীব্র বিরোধিতা করছি।'

৫ আগস্ট

২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ আগস্ট স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন। ৫ আগস্ট বেলা আড়াইটায় বঙ্গভবন থেকে একটি সামরিক হেলিকপ্টার শেখ হাসিনাকে নিয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশে যাত্রা করে। এ হেলিকপ্টার তাকে ও তার ছোট বোন অন্যতম মাস্টার মাইন্ড শেখ রেহেনাকে নিয়ে প্রথেম আগরতলা যায়। পরে সেখান থেকে তাদের দিল্লী নিয়ে যাওয়া হয়।

আন্দোলনে যোগদান

বীর শহীদ নাফিসা হোসেন মারওয়া গোটা ছাত্রী জনতার পতাকাবাহী এক দুঃসাহসিক অভিযাত্রী । ছাত্র জনতার ডাকে শুরু হওয়া কোটা সংস্কার আন্দোলনে, সে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। নাফিসা রাজধানীর উত্তরায় আন্দোলনে যোগ দেয়। বাবা বিষয়টি জানতে পেরে তাকে নিষেধ করেন। কিন্তু বিপ্লবী কন্যা নাফিসা তার বাবার বারংবার দেয়া বাঁধা উপেক্ষা করে; গত ১ আগস্ট চলে যায় ঢাকা জেলার সাভারের বক্তারপুর এলাকার মামার বাড়িতে। সেখান থেকে ফের যোগ দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে।

শাহাদাত বরণ

সাভারে স্কুল সহপাঠীদের নেতৃত্ব দিয়ে আন্দোলনের সম্মুখ সারিতে অংশ নেয়। ৫ আগস্ট সোমবার আন্দোলনরত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা সাভার থানা স্ট্যান্ডের সামনে জমায়েত হলে পুলিশ এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ করে। তখন হঠাত একটি গুলি এসে তার বুকের বা পাশে বিদ্ধ হয়। তার সহযোদ্ধাগণ তাকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে নিকটস্থ এনাম মেডিকেলে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে পর্যবেক্ষণ করে মৃত বলে ঘোষণা করে। পরে খবর পেয়ে তার বাবা হাসপাতাল থেকে লাশ নিয়ে আসেন টঙ্গীর এরশাদনগর এলাকায়। এর আগে গত ৫ আগস্ট দুপুর ২টার দিকে ঘাতকের ছোঁড়া গুলি বুকে বিদ্ধ হয়ে শহীদ হয় নাফিসা।

জানাজা ও দাফন

পরবর্তীতে জানাযা শেষে রাতেই শহীদের দাফন সম্পন্ন করা হয় এলাকার স্থানীয় গোরস্থানে। চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয় স্বপন পিপাসু এক দুঃসাহসিক, দুর্বার বীর যোদ্ধা শহীদ নাফিসা হোসেন মারওয়া।

পারিবারিক অনুভূতি

নাফিসার মৃত্যুর পর বাবা আবুল হোসেন শোকাচ্ছন্ন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বসে থাকেন কবরের পাশে। মেয়ের প্রিয় জবা ফুল এনে জড়ো করছেন কবরের পাশেই। কখনো কখনো চিৎকার করে কেঁদে উঠেন।

বাবা আবুল হোসেনের বলেন, আমার ২টা মেয়ে। নাফিসা বড়। আমি গরিব। কষ্ট করে মেয়েদের লেখাপড়া চালাইতাম। ওদের মা বিদেশে গেছে। আমার কোনো জমি নাই। দুইটা মেয়েই আমার সম্বল ছিল। আন্দোলন তো থামল। আমার মেয়ে তো আইলো না। গুলি লাগার পর আমার মা (নাফিসা) ফোনে আমারে বলছে- বাবা আমার লাশটা নিয়া যাইও, আমি মইরা যামু।

ENAM MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL

DEATH REPORT

Date of Issue: 05/08/2024

Name: Nafisa Hosen Marwa
Sex: F Age: 19y
Nationality: Bangladeshi
Admitted Under: Patient was not admitted
Father/Spouse/Guardian: Abul Hosen
Address: 327/1, Block-08, Ershad Nagar - 1712, Zone-02, Tongi, Gazipur City Corp. Gazipur
Mobile: 01618-454545

Cause of Death:
Patient was brought dead in EMCH at 03:32 PM on 05/08/2024

Date of Death: 05/08/2024 Time of Death: 03:32 PM
Certifying Doctor/Register: Dr. Shuvo Signature:

DEAD BODY HANDOVER INFORMATION

Dead Body Taken by: MD Hazrat Signature: Hazrat
Date & Time: Relation With Patient:
Name of Witness: Signature:
Date:

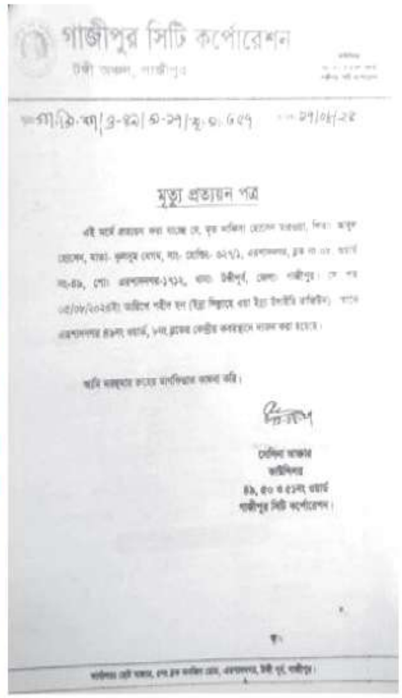

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

মৃত্যু প্রত্যয়ন পত্র

এক নজরে শহীদ পরিচিত

নাম	: নাফিসা হোসেন মারওয়া
জন্ম	: ৪ মে ২০০৭
পেশা	: ছাত্রী
স্কুলের নাম	: শাহাজ উদ্দীন সরকার মডেল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়য়ের এস এস সি পরীক্ষার্থী
স্থায়ী ঠিকানা ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: এরশাদ নগর, ইউনিয়ন: সিটি কর্পোরেশন, থানা: টঙ্গী পূর্ব, জেলা: গাজীপুর
পিতা	: আবুল হোসেন
বয়স ও পেশা	: ৪৮ বছর, চায়ের দোকানদার
মাতা	: কুলসুম বেগম
বয়স ও পেশা	: ৪০ বছর, প্রবাসী (কুয়েত)
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৩ জন
ঘটনার স্থান	: সাভার থানা স্ট্যান্ড
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী সরকারের ঘাতক পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৫ আগস্ট ২০২৪ বিকাল ৩টা ৩০ মিনিট
মৃত্যুর সময় ও তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪ বিকাল ৩টা ৩২ মিনিট
শহীদের কবর (জিপিএস লোকেশন)	: 23°55'23.6"N 90°24'11.6"E
প্রস্তাবনা	: বাবার ব্যবসার সম্প্রসারণে সহযোগিতা করা
	: ছোট বোনের লেখাপড়ায় সহযোগিতা করা যেতে পারে
	: প্রবাসী মায়ের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা

একজন মুসলিম,
একজন সন্তান,
একজন পিতা,
একজন শহীদ

শহীদ মেহেদী হাসান

ক্রমিক : ২৫৭
আইডি : ঢাকা বিভাগ ১২৫

জন্ম-পরিচয়

মো: মেহেদী হাসান এর জীবন যোগ্য ও অসাধারণ এক সন্তানের এক অতি সাধারণ গল্প। এমন এক সন্তান যার কথা মনে হতেই বাবার বুক প্রশান্তিতে ভরে যায়। চোখে সন্তান হারানোর বেদনা, মুখে সন্তানের শহীদি মৃত্যু পাওয়ার আনন্দের হাসি। শত কষ্টের মাঝেও যে হাসি অমলিন। এই কৃতি সন্তান ২০০১ সালের ১০ জানুয়ারি নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা থানার রংছাতি ইউনিয়নের সন্ন্যাসীপাড়া গ্রামে বাচ্চু সরকার ও জাহানারা বেগম দম্পত্তির এক অতি দরিদ্র কিন্তু প্রশান্তিময় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নদীর পাড়ে ছিলো তাদের শান্তির নীড়। কিন্তু বাংলাদেশের আরো অনেক নদীর মতো মহাদেও নদীর বাঁধ মানে না। পাতলাবন মহাদেও নদী, রংছাতি, কলমাকান্দা। মহাদেও নদীটি ভারতের মেঘালয় রাজ্য হতে প্রবাহিত। অত্যন্ত খরস্রোতা এই নদী। সে তার নিজের ইচ্ছা মত যেদিক দিয়ে খুশি সেদিক দিয়েই প্রবাহিত হয়। বর্ষার স্রোতে পাড়ে ভাঙন ধরে। সেই ভাঙনে বাচ্চু সরকার ও জাহানারা দম্পতির বাড়ি ভেঙে নদীতে বিলীন হয়ে যায়। ততদিনে তাদের ঘর আলো করে আরো দুই ছেলে মিজানুর রহমান ও রাকিবের জন্ম হয়। পেটের তাগিদে তারা সপরিবারে ঢাকায় পাড়ি জমান। সেখানে বাচ্চু সরকার একটা ছোট চায়ের দোকান দেন। বাচ্চু সরকার ছিলেন প্রচণ্ড আল্লাহ ভীরু। তাই ছোট থেকে তার তিন ছেলেকে রাসূল (সা:) এর আদর্শে বড় করতে থাকেন। মানুষের মতো মানুষ করে গড়তে থাকেন তিন সন্তানকে। সবার বড় ছিলেন মেহেদী হাসান। তাকে হাফেজি পড়ান। পরবর্তীতে তাকে মাদ্রাসা থেকে দাখিল পাসকৃত ঝর্ণার সাথে বিবাহ দেন। সেই ঘরে তাদের কোল আলো করে এক ছেলের জন্ম হয়। যার নাম রাখেন তারা আবু হুজাইফা। আবু হুজাইফার বয়স বর্তমানে ২.৫ বছর। মেহেদী হাসান তার বাবার যোগ্য সন্তান। বাবার কাছে থেকে যে জ্ঞান বুদ্ধি পেয়েছেন, জীবনের যে শিক্ষা পেয়েছেন তা অতুলনীয়। বাবার সাথে বেড়ে ওঠার ফলে সেখান থেকেই নৈতিক ভিত্তি গড়ে ওঠে। মানুষের আনন্দে আনন্দিত হওয়া, অন্যের দুঃখে ব্যথিত হওয়া এসব মানবিক দিক গুলো তার ভেতর গড়ে ওঠে। তার আদর্শ বাবার কাছে তাই আজ সেও এক আদর্শ। সে সুধু তার ভাই বা ছেলের কাছে এখন আদর্শ নয়, সে গোটা জাতির কাছে এক শ্রদ্ধার পাত্র।

অর্থনৈতিক অবস্থা

মেহেদী হাসান হিফজ পড়াশোনা করেন। কিন্তু দারিদ্রের কষাঘাতে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বেশিদূর পড়াশোনা করতে পারেননি। বাবার চায়ের ছোট্ট দোকানের পাশাপাশি সংসার চালানোর জন্যে তাকে রাজমিস্ত্রী কাজ শুরু করতে হয়। তাদের মূল বাস্তুভিটা ময়মনসিংহের কলমাকান্দা থানার সন্ন্যাসীপাড়া গ্রামে মহাদেও নদীর স্রোতের তোড়ে বিলীন হয়ে যায়। সেখানে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। করোনাকালীন সময়ে আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য তার মেজো ভাই মিজানুর রহমানকে সপ্তম শ্রেণীতে পড়াকালীন সময়ে পড়ালেখা ছেড়ে বাবার সাথে দোকানের হাল ধরতে হয়। ছোট ভাই রাকিব বর্তমানে প্রাইমারিতে পড়াশোনা করেন। তার বয়স ১৪ বছর। মেহেদী হাসান বিবাহিত ছিলেন এবং তার ২.৫ বছর বয়সী একটা ছেলে সন্তান আছে। স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রী ঝর্ণা খুব কষ্টে দিনাতিপাত করছেন। বাচ্চু সরকারের একার পক্ষে এত বড় সংসার চালানো অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠেছে। না তারা সন্তানের শোক ঠিকমতো পালন করতে পারছে, না তারা সংসার চালাতে পারছে।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

ছাত্রজনতার অভ্যুত্থান বা জুলাই গণঅভ্যুত্থান বলতে বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলন ২০২৪ ও অসহযোগ আন্দোলন ২০২৪-এর সমন্বিত আন্দোলনকে বোঝানো হয়। ২০২৪ সালের ৫ জুন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ২০১৮ সালের ৪ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকারের জারি করা পরিপত্রকে অবৈধ ঘোষণার পর কোটা সংস্কার আন্দোলন নতুন করে শুরু হয়, এই আন্দোলনে তৎকালীন শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন সরকার দমন নিপীড়ন শুরু করলে এটি অসহযোগ আন্দোলনে রূপ নেয়। কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা বিক্ষোভের পর ১৫ জুলাই বিক্ষোভকারী ও ছাত্রলীগের সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষের পর উত্তেজনা বেড়ে যায়। এর পরের দিনগুলোতে, পুলিশ , র‍্যাব , বিজিবিসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, পাশাপাশি ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ছাত্র, যুব ও স্বেচ্ছাসেবক শাখার সদস্যরা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সহিংস সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এই সংঘর্ষের ফলে বিক্ষোভকারী এবং শিশু সহ অসংখ্য মৃত্যু হয়েছে।

এমনি এক আন্দোলনকারী ছিলেন মেহেদী হাসান। দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে তার বিবেক তাকে ঘরে বসে থাকতে দেয়নি। হাজারো পিছুটান থাকা সত্ত্বেও তিনি তার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের সাথে ছাত্র জনতার পক্ষে রাস্তায় নামেন। ১৮ জুলাই ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করার পর দেশে তীব্র 'ক্র্যাক ডাউন' শুরু হয়। পুলিশ, র‍্যাব, যুবলীগ, ছাত্রলীগ এবং হাসিনা সরকারের দোসর বাহিনী সাধারণ নিরস্ত্র ছাত্র জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ২০ জুলাই, শনিবার দেশজুড়ে কারফিউ, সেনা মোতায়েনের মধ্যেও যাত্রাবাড়ী, উত্তরা, বাড্ডা ও মিরপুর এলাকায় চলে সংঘর্ষ, ধাওয়া ও গোলাগুলি। সোমবার ২০ জুলাই সকালে কারফিউ চলাকালীন সময়ে কাজে যোগ দিতে বাসা থেকে বের হয় মেহেদী হাসান। কাজ শেষে ফেরার পথে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হয় ও এলোপাথারি গুলিবর্ষণের মাঝে পড়ে যায়। সেখানে তার গালে একটা গুলি লাগে। তার বন্ধু আরও কয়েকজনকে ডেকে ধরাধরি করে হাসপাতালে নেওয়ার উদ্দেশ্যে রিকশা খুঁজতে খুঁজতে আমিন টাওয়ারের সামনে আসে। সেখানে তারা আবার পুলিশ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের যৌথ গোলাগুলির সম্মুখীন হয়। তাই তাকে সেখানে রেখেই বাকিরা নিরাপদ দূরত্বে জীবন নিয়ে পালান। সেখানে মেহেদীকে আবার নড়াচড়া করতে দেখে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী বাহিনী আবার দুই রাউন্ড গুলি করে যার একটা তার মাথায় আর আরেকটা তার ঘাড়ে লাগে। তারপর পরিবেশ কিছুটা শান্ত হলে তার বন্ধু দ্রুত এনাম মেডিকেলে নিয়ে যায় তাকে। সেখানে কর্তব্যরত ডাক্তার ইসিজি করে রাত ৭:৪৫ টায় তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তাকে দ্রুত কবর দেওয়ার জন্য আওয়ামী লীগের লোকজন চাপ দেয় ও তাদেরকে জামায়াত শিবিরের ট্যাগ লাগিয়ে নিজ এলাকা নেত্রকোনা নিতে ও কবর দিতে দেয় না। ফলে তাকে তার বাবা বাড্ডা কবরস্থানে দাফন করেন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়দের অনুভূতি

শহীদের পিতা: আমার ছেলে আজ পর্যন্ত আমার মুখের উপর একটা কথাও বলেনি। এমন সন্তান আল্লাহ আমাকে দিয়েছিলেন যা মানুষ চেয়ে পায় না। আমার তেমন কিছুই নেই। কিন্তু আমার ছেলের মুখের দিকে তাকালে, কথা বললে যে শান্তি পেতাম তার তুলনা নেই। ছেলে আমার স্বল্পভাষী, কখনো কোনো বাজে ছেলেদের সাথে মিশতো না। তার কোন খারাপ রিপোর্ট কেউ দিতে পারবে না। কোনো বাজে নেশা ছিল না। আমার তিন ছেলের মধ্যে খুব মিল। আমাকে বলত "আব্বু আমাদের জন্য তো অনেক করেছেন। আপনার ছেলে এখন বড় হয়েছে। আমিই এখন থেকে সংসারের দেখাশোনা করবো। আপনাকে আরামে রাখবো।" আমি বেঁচে থাকতে আমার এরকম জোয়ান ছেলে মারা গেলো। অন্তর তো শান্ত হয়না বাবা। এটুকুই শান্তনা যে আমার ছেলেটা আল্লাহর ইচ্ছায় তার রাস্তায় মারা গেছে। আমি নাতিটার সামনে দাঁড়াতে পারি না। বাবাকে চায়। শেষবার ওর বাবাকে খাটিয়াতে দেখেছিল। তাই মনে করে বাবা খাটিয়াতে থাকে। আমাকে নিয়ে যেতে বলে। কয়েকদিন আগে আমাদের কলোনীর একজন মারা গেছে। তাকে খাটিয়াতে দেখে বাবা মনে করেছে। সবাইকে কেঁদে কেঁদে বলেছে ওর বাবার কাছে দিয়ে আসতে। আমি এগুলো কিভাবে মেনে নেব। এতটুকু ছেলে কয়েকদিনে দুনিয়া বুঝে গেছে। সব বোঝে এখন।

শহীদের ভাই: আমার ভাই আমাদের জান ছিল। আমাদের যে কত ভালবাসতো বোঝাতে পারবো না। আব্বার পরেই আমরা ওনাকে দেখতাম। আমাদের যাতে একটু কম কষ্ট হয় এটা চেষ্টা করতেন। কখনো তার সঙ্গে মনমালিন্য হত না। এখন তার অবর্তমানে সবকিছু খালি খালি লাগে।

শহীদের স্ত্রী: উনি কখনও আমার সঙ্গে উচ্চবাচ্য করতেন না। তার মতো মানুষ খুব কমই হয়। ইচ্ছা করলেও তার খারাপ বের করা কঠিন। আমার সুখের সংসারটা আজ শেষ হয়ে গেছে। আমার এই ছেলেই এখন আমার সম্বল।

ENAM MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL

DEATH REPORT

Name: Mahadi Hasan
Sex: Male
Nationality: Bangladeshi
Religion: Islam
Date / Time of Admission: not Admitted
Address: P.S. Savar, Dist. Dhaka
Cause of Death: Patient was brought dead at EMCH Emergency Department

DEAD BODY HANDOVER INFORMATION

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card
মেহেদী হাসান
MAHEDI HASAN
মোঃ বাচ্চু সরকার
জাহানারা
Date of Birth 10 Jan 2001
NID No. 195 868 5248

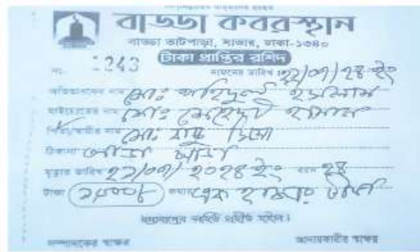
বাড্ডা কবরস্থান
টাকা প্রাপ্তির রশিদ
1243

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: মো: মেহেদী হাসান
জন্ম	: ১০/০১/২০০১
পেশা	: রাজমিস্ত্রী
মাসিক আয়	: ১০,০০০
স্হায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: সন্নাসীপাড়া, ইউনিয়ন: রংছাতি, থানা:কলমাকান্দা, জেলা: নেত্রকোনা
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা/ মহল্লা: ডি/৩১,সিতার নোয়াদ্দা, এলাকা: সাভার, থানা: সাভার, জেলা: ঢাকা
পিতার নাম	: মো: বাচ্চু সরকার
পেশা	: দোকানদার
মাতার নাম	: জাহানারা বেগম
পেশা	: গৃহীনি
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৬ জন বাবা (বাচ্চু সরকার), মা (জাহানারা বেগম), মেজ ভাই (মিজানুর রহমান, ১৮), ছোট ভাই (রাকিব, ১৪), স্ত্রী (ঝর্ণা), ছেলে (আবু হুজাইফা, ২.৫)
ঘটনার স্থান	: সাভার
আক্রমনকারী	: পুলিশ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ
আহত হওয়ার সময়কাল	: তারিখ : ২০/০৭/২৪ ইং, সময় : বিকেল :৬:০০ ঘটিকা
মৃত্যুর তারিখ ও সময় স্থান	: ২০/০৭/২৪ ইং, সময়: রাত: ৭:৪৫ ঘটিকা, এনাম মেডিকেল হাসপাতাল
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: বাড্ডা কররস্থান

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান
২. নিয়মিত মাসিক ভাতা প্রদান
৩. বাসস্থান করে দেয়া
৪. শহীদের ভাইয়ের পড়াশুনার খরচ ভচালিয়ে যাওয়া
৫. পরিবারের চিকিৎসার যাবতীয় খরচ বহন করা

সংগ্রাম যার নীতি,
আমৃত্যু কষ্ট যার সঙ্গী,
শহীদি মৃত্যু যার সত্যতা

শহীদ নাজমুল মিয়া

ক্রমিক : ২৫৮

আইডি : ঢাকা বিভাগ ১২৬

জন্ম-পরিচয়

নাজমুল মিয়া ১ ফেব্রুয়ারি ২০০০ সালে গাইবান্ধা জেলার কামাড়পারা থানার সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের নুরপুর গ্রামের মৃত হামিদুল ইসলাম ও গোলেভান বেগম দম্পত্তির অতি দরিদ্র ও সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হামিদুল ইসলাম ছিলেন একজন দিনমজুর। তিন ভাইবোনের মধ্যে নাজমুল ছিলেন সবার বড়। বড় বোন হিরামনি আর ছোট বোন আয়েশা ছিল তার চোখের মনি। নাজমুল ছিলো এক সপ্নদ্রষ্টা স্বাধীনচেতা ছেলে। নিজের দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত জীবন সে পরিবর্তন করতে চেয়েছিল। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। বসতভিটা ছাড়া আর কোনো জমিজমা না থাকায় বাবা মারা যাওয়ার পর যখন সংসারের ভার তার উপর এসে পড়ে তখন সেই ছোট্ট নাজমুল যেন অকুল পাথার দেখে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর নাজমুলকে বাধ্য হয়ে পরিবারকে সাহায্য করার জন্য পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়। তার নিজের ভবিষ্যতের স্বপ্ন ত্যাগ করে ঢাকার একটি গার্মেন্টসে (ক্যাপ ফেক্টরি) চাকরি নেন, যেখানে অমানবিক পরিশ্রমের বিনিময়ে সামান্য বেতনে কাজ করতেন। তার একমাত্র ইচ্ছা ছিল, পরিবারের দুঃখ-কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব করা, মা-বোনের মুখে হাসি ফোটানো। ঢাকার সাভারের আশুলিয়া থানার জামগড়া এলাকার শিমুলতলা মহল্লায় একটা ছোট বাসা ভাড়া নিয়ে থাকত। নিজের প্রয়োজনের তুলনায় পরিবারের জন্যই বেশি অর্থ পাঠাতেন। এই কঠিন জীবনের মধ্যেও শিক্ষার প্রতি তার ভালোবাসা অটুট ছিল। একজন কর্মী হিসেবে তার জীবন ছিল বাস্তবতার কষাঘাতে ভরা, কিন্তু তবু তিনি সামনে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন লালন করতেন। দারিদ্র্যের কষ্ট, কঠোর পরিশ্রম, আর পরিবারের প্রতি গভীর ভালোবাসা তাকে একটি বাস্তবিক জীবন সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক করে তুলেছিল। বোনদের বিয়ে দিয়েছিল। কথা ছিল মায়ের পছন্দের মেয়েকে বিয়ে করে নিজের সুখের নীড় গড়বেন। কিন্তু দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে তিনি ছাত্র-জনতার পক্ষে রাস্তায় না নেমে পারেননি। বাবার সঙ্গ সে বেশিদিন না পেলেও বাবা ছিলেন তার আদর্শ। বাবার কাছে থেকেই শিখেছিলেন অন্যায়ের কাছে কখন মাথা নত না করা। এই শিক্ষাই সে জীবনের শেষ পর্যন্ত কাজে লাগিয়েছেন।

অবস্থা

গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাপুর উপজেলার নুরপুর গ্রামের ২৪ বছর বয়সী নাজমুল, হতদরিদ্র পরিবারের তিন ভাইবোনের মধ্যে সবার বড় ছিলেন। তার বাবা হামিদুল ইসলাম, একজন দিনমজুর ছিলেন। বাবা মারা যাওয়ার পর সে ছিল সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যাক্তি। তার উপার্জনের অর্থ দিয়েই সংসার চলত। বসতভিটার ৩ শতক জমি ছাড়া তাদের আর কোনো জমিজমা নেই। বাড়িতে যে টাকা পয়সা ছিল তার সবটাই তার চিকিৎসার পেছনে ব্যায় হয়েছে। বর্তমানে তার মা ও বয়স্ক দাদী খুবই মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

ছাত্রজনতার অভ্যুত্থান বা জুলাই গণঅভ্যুত্থান বলতে বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলন ২০২৪ ও অসহযোগ আন্দোলন ২০২৪-এর সমন্বিত আন্দোলনকে বোঝানো হয়। ২০২৪ সালের ৫ জুন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ২০১৮ সালের ৪ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকারের জারি করা পরিপত্রকে অবৈধ ঘোষণার পর কোটা সংস্কার আন্দোলন নতুন করে শুরু হয়, এই আন্দোলনে তৎকালীন শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন সরকার দমন নিপীড়ন শুরু করলে এটি অসহযোগ আন্দোলনে রূপ নেয়। কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা বিক্ষোভের পর ১৫ জুলাই বিক্ষোভকারী ও ছাত্রলীগের সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষের পর উত্তেজনা বেড়ে যায়। এর পরের দিনগুলোতে, পুলিশ , র‍্যাব , বিজিবিসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, পাশাপাশি ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ছাত্র, যুব ও স্বেচ্ছাসেবক শাখার সদস্যরা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সহিংস সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এই সংঘর্ষের ফলে বিক্ষোভকারী এবং শিশু সহ অসংখ্য মৃত্যু হয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের নথিসমূহ নির্দেশ করে যে বিক্ষোভ চলাকালীন ১৭০০ জনকে ভর্তি করা হয়েছিল, ৯৮ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। যাইহোক, চিকিৎসক এবং হাসপাতালের কর্মকর্তারা পরামর্শ দিয়েছেন যে হাসপাতালে ১০০ জনেরও বেশি লোক মারা গেছে, যার অনেক আনুষ্ঠানিকভাবে রেকর্ড করা হয়নি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও চাকরি প্রত্যাশীদের কোটা সংস্কারের জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, সরকারের দমন-নিপীড়নের মুখে তা প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে পরিণত হয়। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে তিন সপ্তাহের মধ্যে বিক্ষোভ দমনে সরকারের সহিংস ভূমিকার কারণে কয়েকশ নিরস্ত্র নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছেন হাজারো ছাত্র-জনতা। এক মাসের মধ্যেই শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। অবসান ঘটে আওয়ামী লীগের ১৫ বছরের শোষণ ও নিপীড়ন। অভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় ৪ আগস্ট ও সারা দেশে ছাত্র-জনতা রাস্তায় নামে ও তাদের ওপর খুনী সরকারের বাহিনী অস্ত্র নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে। সেদিন ২ টায় নাজমুলের কারখানা ছুটি হয়। বিকেল ৪ টার দিকে নাজমুল তার তিন বন্ধুর সঙ্গে মিলে আশুলিয়ার বাইপাইলে একটি বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন। আন্দোলনের উত্তাল স্রোতে মিশে ছিল ন্যায়বিচারের দাবি, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সেই স্রোত রক্তে রঞ্জিত হলো গুলির শব্দে। নাজমুল এবং তার এক বন্ধু গুলিবিদ্ধ হন। তাদেরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদেরকে বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স অন্তত ৫ জায়গায় আটক করে তল্লাশি করা হয়। পরে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৪ আগস্ট মারা যায় তার বন্ধু। নাজমুল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৪ম তলায় ২১ নম্বর বেডে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাকে ঐ ৫ তারিখ সকাল সাতটার দিকে অপারেশন থিয়েটারে নেওয়া হয় ও তার বুকের নিচে লাগা গুলি বের করে সন্ধ্যা ৭ টার দিকে বের করা হয়। প্রথমে আইসিইউ ও পরে আইসিইউ থেকে পরের দিন বিকাল ৫টায় বেডে নেওয়া হয়। তার স্বজনের ভাষ্যমতে, নার্সদের বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও নাজমুলকে ঠিক মতো সেলাইন ও ওষুধ দেওয়া হয়নি। এমনকি ড্রেসিংও পরিবর্তন করা হয়নি ঠিকমতো। ডাক্তাররা তার সুস্থতা জন্য আশাবাদী হলেও ৯ আগস্ট সন্ধ্যায় সে মারা যায়। তখন তার স্বজনেরা লাশ নিতে গেলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ টাকা না দিলে ছাড়তে রাজি হয়না। এ বিষয়ে ছাত্রদের অবগত করলে তারা এসে লাশ ছাড়িয়ে দেয়। পরবর্তীতে তাকে নিজ গ্রামে বাবার কবরের পাশে দাফন করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়দের অনুভূতি

শহীদের বয়োবৃদ্ধ দাদী কান্না জড়িত কণ্ঠে জানান, তার উপার্জনের অর্থে চলতো সংসার। বাড়িতে যে টাকা পয়সা ছিল তার সবটাই ব্যয় হয়েছে নাজমুলের চিকিৎসার পিছনে। বড় আশা ছিল আমার ছেলে মৃত্যুর পর নাতিটা সংসারের হাল ধরবে, তাকেও আল্লাহ কেড়ে নিলো, হামরা এখন কেমনে বাচমো। হামি অসুস্থ গত কয়েকদিন থেকে বাড়িতে খাবার নাই, হামার ওষুধ নাই।

শহীদের ছোট বোন আয়েশা আবেগ তাড়িত হয়ে বলেন, ভাই মারা যাওয়ার পর আমরা নিঃস্ব হয়ে গেলাম। কীভাবে চলবে সংসার?

শহীদের বড় বোন জামাই বলেন, নাজমুল ভাই খুবই স্পষ্টভাষী, ভদ্র ও সঠিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। বাড়ির বটগাছের মতো ছিলেন তিনি। তাকে আমি কখনো অন্যায় কাজে দেখিনি।

প্রতিবেশীর বক্তব্য, গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে গরিব পরিবার তারাই। নাজমুলের বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে নাজমুলই সংসার চালাতো। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে নাজমুল মারা যাওয়ার পর তাদের পাশে কেউ দাঁড়ায়নি। দেশের মানুষের জন্য তার আত্মত্যাগের প্রতিদান ফেলনা তার পরিবার। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয় ও আন্তর্বতীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টা মণ্ডলীর নিকট আমাদের আকুল আবেদন আপনারা এই অসহায় পরিবারটির দিকে একটু তাকান। নাজমুল আমাদের গ্রামের অহংকার। আমাদের জোর দাবি তাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে শহীদি মর্যাদা দেয়া হোক। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া হোক তার পরিবারের প্রতি।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: নাজমুল মিয়া
জন্ম	: ০১/০২/২০০০
পেশা	: গার্মেন্টস কর্মী
মাসিক আয়	: ১০,০০০
স্হায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: নুরপুর, ইউনিয়ন : কামাড়পারা, থানা: সাদুল্লাপুর, জেলা: গাইবান্ধা
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা/ মহল্লা: শিমুলতলা, এলাকা : জামগড়া, থানা: আশুলিয়া, জেলা: ঢাকা
পিতার নাম	: হামিদুল ইসলাম
পেশা	: মৃত
মাতার নাম	: গোলেভান বেগম
পেশা	: গৃহীনি
বয়স	: ৪০
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৩ জন, মা (গোলেভান বেগম, ৪০), দাদি (রাহেলা বেগম, ৭০)
ঘটনার স্থান	: আশুলিয়ার বাইপাইল
আক্রমনকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল	: তারিখ: ০৪/০৮/২৪ ইং, সময়: বিকেল: ৪:০০ ঘটিকা
মৃত্যুর তারিখ ও সময় স্থান	: ০৯/০৮/২৪ ইং, সময়: রাত: ৭:০০ ঘটিকা, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: নিজ গ্রামের গোরস্থান

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান
২. নিয়মিত মাসিক ভাতা প্রদান
৩. বাসস্থান করে দেয়া
৪. পরিবারের চিকিৎসার যাবতীয় খরচ বহন করা

শহীদ মো: শাখিল আনোয়ার

ক্রমিক : ২৫৯

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০১

শহীদ পরিচিতি

জুলাই-আগস্ট ২০২৪ স্বৈরাচার পতনের গণঅভ্যুত্থানে নিহত হওয়া শহীদদের অন্যতম মোঃ শাখিল আনোয়ার। তিনি শহীদ হন ৫ই আগস্ট বিজয়ের দিনে।

মো: শাখিল আনোয়ারের জন্ম ৫ই আগস্ট ১৯৮৬ সালে নওগাঁ জেলার আত্রাই থানার অন্তর্গত বিষা ইউনিয়নের শ্রীধরগুর নই গ্রামে। আল্লাহ তাআলার পরিকল্পনায় তার জন্মদিন ৫ই আগস্টে তিনি শহীদ হন। শহীদ হওয়ার ১ বছর আগ থেকে শাখিল আনোয়ার বেকার ছিলেন।

শাখিল আনোয়ারের পিতার নাম মো: আবেদ আলী (৬১)। পেশায় তিনি কৃষক। মাতা মোছা: শাহারা বেগম (৫৩)। তিনি গৃহিণী। শাখিল আনোয়ার বিবাহিত ছিলেন। তার স্ত্রী মোছা: সালমা আক্তার (৩৬) একজন গার্মেন্টস কর্মী।

শাখিল আনোয়ার পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে ছিলেন দ্বিতীয়। তার বড় ভাই আব্দুল মতিন একজন কৃষক। তার পরের দুজন আবু তালহা রাজমিস্ত্রী এবং আশিকুর রহমান ভ্যানচালক। তার সর্বকনিষ্ঠ ভাই মো: সাখাওয়াত হোসেন মাত্র ১৫ বছর বয়সে ইহজগৎ ত্যাগ করেন। এসএসসি সম্পন্ন করে অভাবের সংসারে আর্থিকভাবে সহায়তা করার জন্য সাখাওয়াত হোসেন ঢাকায় কাজ করতেন। প্রতিবারের মতো ২০০৯ সালে গ্রামের বাড়িতে ঈদ পালন শেষে ঢাকায় ফেরার পথে ট্রেনের ছাদে মাথায় আঘাত পেয়ে মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

শহীদ হওয়ার ঘটনা

৫ই আগস্ট ২০২৪। স্বৈরাচার সরকারবিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়। সাভারের ইপিজেডে আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন শাকিল আনোয়ার। ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে ঘামে ভেজা কাপড় পরিবর্তন করতে বাসায় আসেন দুপুর বেলা। এর মধ্যেই স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের পতন ঘটে। তার পালানোর খবরে আনন্দ মিছিলে অংশগ্রহণ করার জন্য আবারো বেরিয়ে পড়েন শাখিল আনোয়ার। সময় ৩:৩০। আনন্দ মিছিলটি ইপিজেডের সামনে আসলে ছাত্র-জনতার সেই মিছিলের ওপর পুলিশ বর্বরোচিত গণহত্যা চালায়। এলোপাথাড়ি গুলি বর্ষণ করে। মাথায় গুলিবিদ্ধ হন শাখিল। এরপর তাকে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে রোগীর অবস্থা আশঙ্কজনক হওয়ায় কর্তব্যরত ডাক্তাররা তাকে দ্রুত অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপদেশ দেন। সেখান থেকে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হাসপাতালে নেওয়ার পথে বিকাল ৫ টা ৩০ মিনিটে মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন শাখিল আনোয়ার।

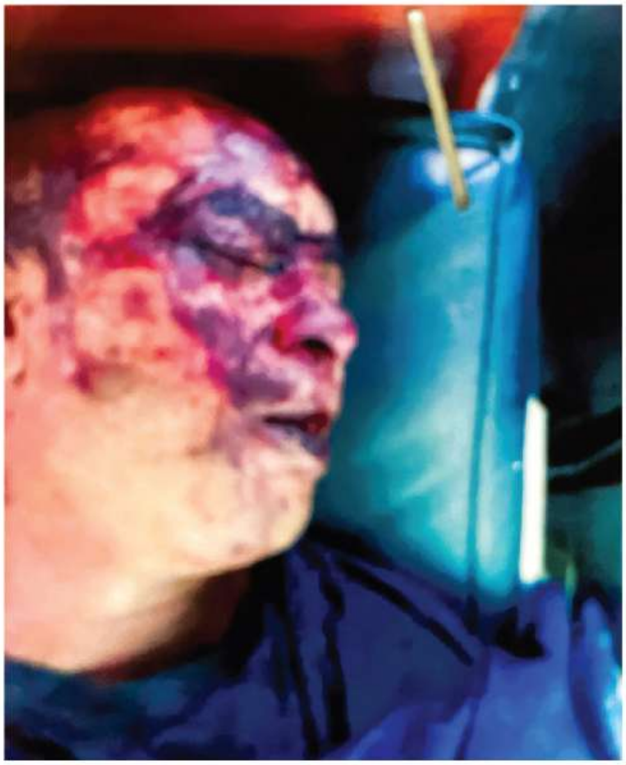

শহীদ সম্পর্কে সামগ্রিক বর্ণনা

নওগাঁ জেলার আত্রাই নদীর কোলঘেঁষা আত্রাই উপজেলার শ্রীধরগুর নই গ্রামে পিতা-মাতার ঘর আলোকিত করে জন্ম হয় শাখিল আনোয়ারের। দারুণ আদর আর সীমাহীন মমতায় বেড়ে ওঠেন তিনি। বাড়ির পাশের শ্রীধরগুর নই দাখিল মাদ্রাসায় নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন তিনি। কিন্তু কৃষক পিতার আর্থিক অসংগতির কারণে পরবর্তী সময়ে পড়াশোনা আর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়ে পড়াশুনায় ক্ষান্ত দিয়ে অর্থ উপার্জনের পথকে বেছে নিতে হয় তার। বাবা আর বড় ভাইয়ের সাথে শুরু করেন কৃষিকাজ।

সময় গড়িয়ে ২০১৭ সালে অনেক স্বপ্ন নিয়ে মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমান তিনি। কিন্তু সে স্বপ্ন স্থায়ী হতে না হতেই এক বছরের মাথায় দেশে ফিরে আসতে হয় তাকে।

২০২০ সালের নভেম্বর মাসে মোছা: সালমা আক্তারের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন শাখিল আনোয়ার। বিয়ের সপ্তাহখানেক পরে চাকরির উদ্দেশ্যে সস্ত্রীক ঢাকার সাভারে চলে আসেন তিনি। তার স্ত্রী একটি গার্মেন্টসে এবং তিনি ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো নামক কোম্পানিতে চাকরি নেন। ২০২৩ সালে এসে চাকরি হারিয়ে বেকার হয়ে যান শাখিল আনোয়ার। ফলে স্ত্রীর স্বল্প আয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয় তাকে। তাই সংসারের প্রাথমিক খরচ মেটাতে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নেন তিনি। ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টায় আবার বিদেশ চলে যাওয়ার মনস্থির করেন। ভিসা ও পাসপোর্ট করার জন্য আবারো ঋণ গ্রহণ করেন।

দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত শাখিল আনোয়ার আর্থিক দৈন্যতা কাটাতে বারবার ঋণের দ্বারস্থ হতে থাকেন। তারপরেও দরিদ্র্যতা ও ঋণের ভার যেন পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে।

জুলাই ২০২৪, দেশব্যাপী শুরু হয় স্বৈরাচারবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন। স্বৈরাচারী সরকারের পতন নিশ্চিত করতে মুক্তিকামী ছাত্র-জনতা নেমে আসে রাজপথে। বসে থাকেনি শাখিল আনোয়ারও। সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন গণমানুষের আন্দোলনে।

৫ই আগস্ট, ২০২৪; সেদিনও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন তিনি। বেলা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে ক্রমশ আন্দোলনের তীব্রতাও বাড়তে থাকে। ক্লান্ত শরীরে দুপুরবেলা বাসায় এসে স্বৈরাচারী সরকারের পতনের সংবাদ শুনতে পান। বিজয়ের আনন্দে রাজপথে নামার তর সইছিল না তার। জামা কাপড় বদলে আবারও চলে যান আনন্দ মিছিলে অংশগ্রহণ করার জন্য। যাবার সময় স্ত্রীকে একসাথে দুপুরের ভাত খাবেন বলে বেরিয়ে পড়েন শাখিল আনোয়ার। কিন্তু কেইবা জানত, এই যাত্রা আর ফিরে না আসার যাত্রা! ছাত্র জনতার বিজয় মিছিলে শতাব্দীর নিকৃষ্ট স্বৈরশাসক গণখুনি হাসিনার সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী গুলি বর্ষণ করে। শহীদ হয় শাখিল আনোয়ার।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে। স্বামীর অপেক্ষায় থাকা সালমা আক্তার স্বামীকে ফোন দিলে ফোনের ওপাশ থেকে অপরিচিত এক ব্যক্তি জানান– গণসাস্থ্য কেন্দ্রের বাইরে মোবাইলটি কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছে, মোবাইলটি যেন তিনি নিয়ে যান।

পাশের বাসার এক লোককে সাথে নিয়ে তখনই বেরিয়ে পড়েন সালমা আক্তার। রাস্তাঘাটের পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় তারা আর সামনে এগোতে না পেরে বাসায় চলে যান।

পরের দিন ৬ই আগস্ট আবারও স্বামীর খোঁজে বেরিয়ে পড়েন তিনি। হাসপাতাল থেকে হাসপাতাল, এমার্জেন্সি রুম থেকে মর্গ; সর্বত্রই হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকেন স্বামী শাখিল আনোয়ারকে। অবশেষে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হাসপাতালের মর্গে খুঁজে পান প্রাণপ্রিয় স্বামীর মরদেহ। শোকে পাগলপ্রায় হয়ে যান সালমা আক্তার। মৃত স্বামীকে নিয়ে ছোটেন নওগাঁয় তাদের নিজ বাড়িতে। সেদিন সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে জানাজা শেষে নিজ গ্রামের বাড়িতে কবরস্থ করা হয় শহীদ শাখিল আনোয়ারকে।

তার লাশ গ্রামের বাড়িতে নেওয়ার পর তৈরি হয় এক হৃদয়বিদারক অবস্থা। শহীদ পরিবারে নেমে আসে দুঃখের কালোছায়া। থামে না শোকের মাতম। সন্তান হারিয়ে পাগলপ্রায় বৃদ্ধ বাবা-মার দুচোখে অশ্রুর ফোয়ারা নামে।

বেঁচে থাকার একমাত্র সম্বল স্বামীকে হারিয়ে স্ত্রী সালমা আক্তারের অবস্থা হয় করুণ। স্বামীর এ বিদায় তিনি এক মুহূর্তের জন্যও মেনে নিতে পারছেন না।

শহীদ মো: শাখিল আনোয়ার পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেও থেকে যাবেন আমাদের সবার হৃদয়ে।

শহীদের পরিবারের দৈন্যদশা

শহীদ শাখিল আনোয়ারের পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। স্ত্রী মোছা: সালমা আক্তার একটি গার্মেন্টসে খুবই স্বল্প বেতনে চাকরি করতেন। তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস। মারা যাওয়ার ১ বছর আগ থেকে শখিল আনোয়ার বেকার ছিলেন। তার পূর্বে তিনি ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো নামক একটি কোম্পানিতে চাকরি করতেন। চাকরি হারানোর পর থেকে তিনি বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। পাসপোর্ট ও ভিসা করার জন্য ঋণও নিয়েছিলেন।

এছাড়াও শহীদ পরিবারের আরো একাধিক ঋণের বোঝা রয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হলো প্রাত্যহিক সংসারের খরচ বাবদ গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ, এখন পর্যন্ত পরিশোধ হয়েছে মাত্র ৬ হাজার টাকা। এরপর অটোরিক্সা ক্রয়ের জন্য শাখিল আনোয়ার তার শাশুড়ি থেকে নেন আরো ৫০ হাজার টাকা ঋণ। যার মধ্যে ২০ হাজার টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ভিসা সংক্রান্ত আরো টাকার প্রয়োজন হলে সে অটোরিকশা বিক্রি করে দেন। এছাড়াও মুদির দোকানে ২৫ হাজার টাকা, হাসপাতাল থেকে শহীদের লাশ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসা বাবদ ২৩ হাজার টাকা এবং ৩ মাসের বাসা ভাড়া বাবদ ও বকেয়া বিদ্যুৎ বিলসহ সব মিলিয়ে প্রায় ২ লক্ষ টাকা ঋণের বোঝা রয়েছে।

স্বামীর মৃত্যুর পর শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়া সালমা আক্তার গারমেন্টসে চাকরি হারিয়ে বর্তমানে নওগাঁয় তার শ্বশুরবাড়িতে বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে অবস্থান করছেন। শাখিল আনোয়ারের পিতা বর্গাচাষী আবেদ আলীর যৎসামান্য উপার্জন এই পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস। মাথা গোঁজার ঠাঁই হিসেবে পৈতৃক সূত্রে পাওয়া একখণ্ড জমির উপর আধাপাকা বাড়িটি বর্তমানে শহীদের স্ত্রীর একমাত্র অবলম্বন।

এক নজরে শহীদ শাখিল আনোয়ার

পূর্ণনাম	: মো. শাখিল আনোয়ার
জন্ম তারিখ	: ০৫.০৮.১৯৮৬
জন্মস্থান	: নওগাঁ জেলার শ্রীধরগুর নই গ্রাম
পেশা	: বেকার
পিতা	: মোঃ আবেদ আলী
মাতা	: মোছা. শাহারা বেগম
স্ত্রী	: মোসা. সালমা আক্তার
বর্তমান ঠিকানা	: সাভার, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম- শ্রীধরগুর নই, ইউনিয়ন- বিষা, থানা-আত্রাই, জেলা-নওগাঁ
শহীদ হওয়ার স্থান	: ইপিজেড, সাভার
ঘাতক	: পুলিশ
আঘাতের ধরন	: গুলি
গুলিবিদ্ধের তাং ও সময়	: ৫ই আগস্ট, ২০২৪ বিকাল ৩:৩০
শহীদ হওয়ার তাং ও সময়	: ৫ই আগস্ট, ২০২৪ বিকাল ৫:৩০
সমাধিস্থল	: গ্রামের বাড়ি

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. শহীদের স্ত্রী সালমা আক্তারের জন্য একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা প্রয়োজন

২. ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা প্রয়োজন

৩. নিয়মিত মাসিক সহযোগিতা প্রয়োজন

শহীদ বিপ্লব মণ্ডল

ক্রমিক : ২৬০
আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০২

শহীদ পরিচিতি

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে অনুষ্ঠিত স্বৈরাচার বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের চূড়ান্ত বিজয়ের দিন ৩৬শে জুলাই, তথা ৫ই আগস্ট শহীদ হওয়া ছাত্রজনতার মধ্যে শহীদ বিপ্লব মণ্ডল অন্যতম। বিপ্লব মণ্ডলের জন্ম নওগাঁ জেলার নওগাঁ সদরের চণ্ডিপুর ইউনিয়নের শিমুলিয়া গ্রামে ১৯৯১ সালের ৮ই জুলাই এক দরিদ্র্য পরিবারে। বাবা-মার ৪ সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন ২য়।

বিপ্লব মণ্ডলের পিতার নাম মো: লুৎফর মণ্ডল (৬৫)। পেশায় তিনি দিনমজুর। তার মাসিক আয় ৮০০০ টাকা। মায়ের নাম মোছা. বিলকিস বেগম (৬০)। বড় বোন লতা আক্তার মেমি (৩৫) চাকরিজীবী। ছোটবোন বৃষ্টি খাতুন (২৬) গৃহিণী। ছোটভাই মো. ফিরোজ হোসেন (২৯) প্রেসে কাজ করেন।

শহীদ বিপ্লব মণ্ডল থাকতেন ঢাকার সাভারের বাইপাইলে। পেশায় ছিলেন নাপিত। কাজ করতেন একটি সেলুনের দোকানে। তিনি বিবাহিত ছিলেন। তার স্ত্রী মোছা. আরিফা আক্তার (২৭) ছিলেন গার্মেন্টসকর্মী। তার আমেনা খাতুন নামে ৯ বছরের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে।

যেভাবে শহীদ হলেন বিপ্লব

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ক্রমান্বয়ে রূপ নেয় ছাত্রজনতার স্বৈরাচার পতনের গণআন্দোলনে। ৫ই আগস্ট ২০২৪ এই আন্দোলন চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে অগ্রসর হয়। সকাল থেকে বেলা গড়ানোর সাথে সাথে বাড়তে থাকে ছাত্রজনতার উত্তাল ঢেউ। বাইপাইলে ছাত্র-জনতার মিছিলে যোগ দেন বিপ্লব মণ্ডল। বুকে তার স্বৈরাচার তাড়ানোর অসীম সাহস। বেলা ঠিক ১২:৩০টা। উত্তাল আন্দোলনে গণখুনি হাসিনার পোষা পুলিশ বাহিনী বেপরোয়াভাবে গুলি ছোড়ে। একটা গুলি এসে বিপ্লব মণ্ডলের গলা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়।

খবর পেয়ে তার স্ত্রী আরিফা আক্তার ঘটনাস্থলে ছুটে যান। কিন্তু সেখানে বিপ্লব মণ্ডলকে না পেয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে খুঁজে বেড়ান। সারাদিন খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে শোকাহত হৃদয়ে ফিরে যান বাসায়। পরদিন ৬ই আগস্ট শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হাসপাতালে যান তিনি। সেখানে বেশ কয়েকটি মৃতদেহ থেকে তার স্বামী শহীদ মো: বিপ্লব মণ্ডলের লাশ শনাক্ত করেন। জানা যায়, ঘটনাস্থলেই শাহাদতবরণ করেন তিনি।

শহীদ বিপ্লব সম্পর্কে আরো কিছু কথা

বিপ্লবের জন্ম এক দরিদ্র পরিবারে। তারা ৪ ভাইবোনের কেউই অভাবের তাড়নায় বেশিদূর লেখাপড়া করতে পারেননি। পরিবারের বড় ছেলে হওয়ায় বিপ্লবকে অল্প বয়সেই সংসারের হাল ধরতে হয়।

২০১৩ সালে বিপ্লব মণ্ডল আরিফা আক্তারের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের ১ বছর পর তাদের ঘর আলোকিত করে আসে এক কন্যা সন্তান। তার নাম রাখেন আমেনা খাতুন।

বসতভিটে ছাড়া আর কোনো চাষযোগ্য জমি নেই তাদের। পরিবারের সবাই বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি ছিলেন পেশায় একজন নাপিত। নওগাঁ জেলার মাদার মোল্লা বাজারে অন্যের সেলুনে কাজ করতেন তিনি। ছোট ভাই করেন প্রেসের কাজ। বাবা করেন দিনমজুরি। মা এবং ছোট ভাইয়ের স্ত্রী বাড়িতে চরকির মাধ্যমে সুতা বুননের কাজ করেন। বিপ্লব স্ত্রী-সন্তান নিয়ে থাকতেন একটি মাটির ঘরে। তার বাবা আর ছোট ভাই মিলে যৌথভাবে তৈরি করেন ২টি আধাপাকা ঘর।

বিপ্লব মণ্ডল তাদের সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বাড়তি আয়ের আশায় স্ত্রীসন্তানসহ ঢাকায় চলে যান। স্ত্রী আরিফা বেগম বাইপাইলের একটি গার্মেন্টসে কাজ নেন।

শহীদ বিপ্লব মন্ডলের মৃত্যুতে তার পরিবারের সবাই খুব বেশি ভেঙে পড়েছেন। তার স্ত্রী আরিফা আক্তার স্বামীর বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করলে কান্নায় ভেঙে পড়েন। নিজেকে সামলাতে পারেন না। একমাত্র কন্যাকে নিয়ে কোথায় যাবেন, কী করবেন, তার ভবিষ্যৎ কী, এসব চিন্তায় তিনি অস্থির থাকেন। স্বামীর শোকে তিনি ঘুমাতে পারেন না। কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকেন, স্বামীর ভালোবাসার কথা, ঝগড়া হলে বেশিক্ষণ রাগ করে না থাকতে পারার কথা, কন্যার প্রতি স্বামীর আদর স্নেহ ভালোবাসার কথা।

শহীদ বিপ্লব মন্ডলের একমাত্র সন্তান ৯ বছর বয়সি আমেনা খাতুন। ছোট্ট মনে বয়ে বেড়াচ্ছে পিতা হারানোর মতো পাহাড়সম যন্ত্রণা। বাবার কথা জিজ্ঞেস করতেই ডুকরে কেঁদে ওঠে সে। ছোট্ট এই মেয়েটির জন্য আজও বোধহয় তৈরি হয়নি সান্ত্বনার কোনো বাণী।

এক নজরে শহীদ বিপ্লব মণ্ডলের প্রোফাইল

পূর্ণনাম	: মো: বিপ্লব মণ্ডল
জন্ম তারিখ	: ০৮.০৭.১৯৯১
জন্মস্থান	: নওগাঁ জেলার শিমুলিয়া গ্রাম
পেশা	: নাপিত
পিতা	: মো: লুৎফর মণ্ডল
মাতা	: মোছা: বিলকিস বেগম
স্ত্রী	: মোছা: আরিফা আক্তার
বর্তমান ঠিকানা	: বাইপাইল, সাভার
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম-শিমুলিয়া, ইউনিয়ন-চণ্ডিপুর থানা-নওগাঁ সদর, জেলা-নওগাঁ
শহীদ হওয়ার স্থান	: বাইপাইল, সাভার
ঘাতক	: পুলিশ
আঘাতের ধরন	: গলায় গুলিবিদ্ধ
গুলিবিদ্ধ ও শহীদ হওয়ার তাং ও সময়	: ৫ আগস্ট ২০২৪, বেলা ১২:৩০টা
সমাধিস্থল	: গ্রামের কবরস্থান

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. শহীদের স্ত্রী আরিফা আক্তারের জন্য একটি কর্মসংস্থান অথবা নিয়মিত মাসিক সহযোগিতা প্রয়োজন

২. সন্তানের পড়াশোনার ভার বহন প্রয়োজন

৩. শহীদের পরিবারকে একটি ঘর নির্মাণ করে দেওয়া প্রয়োজন

"মা আমার যেসব ভাইবোন আন্দোলন করছে, তারাও তো কোনো-না-কোনো মায়ের সন্তান। তাদেরও তো মা আছে, তাদেরও তো পরিবার আছে। তারা যদি আন্দোলনে থাকতে পারে, আমি কেন পারব না? দোয়া করো মা, যেন আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও স্বৈরাচারের হাত থেকে দেশকে এবং দেশের মানুষকে রক্ষা করতে পারি"

শহীদ মাহফুজ আলম শ্রাবণ

ক্রমিক : ২৬১

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৩

শহীদ পরিচিতি

নওগাঁর এক ঘনবসতিপূর্ণ গ্রাম দোগাছি। নওগাঁ জেলার নওগাঁ সদরের বোয়ালিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত এই গ্রাম। ছায়া সুনিবিড় এই গ্রামে জন্ম শহীদ মাহফুজ আলম শ্রাবণের। তিনি ৩রা মে ২০০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মো: মোশাররফ হোসেন পেশায় একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। ব্যবসা আছে ওয়ার্কশপের। তার মা মোছা: বেবী নাজনীন একজন গৃহিণী। তিন ভাইয়ের মধ্যে দ্বিতীয় তিনি। বড় ভাই মোস্তাফিজুর রহমান বাপ্পি বাবার ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করেন। ছোট ভাই ইফতিয়ার রহমান মাহিদ ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে।

পেশায় মাহফুজ আলম ছিলেন ছাত্র ও চাকরিজীবী। তিনি রাইগা ডিগ্রি কলেজ, নওগাঁ থেকে মানবিক শাখা থেকে এইচএসসি শেষ করে অনার্সে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। পিতার পক্ষে দুই ছেলের পড়াশুনার খরচসহ সংসারের যাবতীয় খরচ নির্বাহ করা কষ্টসাধ্য বিধায় পড়াশুনার পাশাপাশি মাহফুজ আলম ঢাকার মিরপুর-৭ এ অবস্থিত রেনেটা লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেন এ বছরের ২৮ জানুয়ারি।

মাহফুজ আলম শ্রাবণ ভালো ক্রিকেটারও ছিলেন। তিনি থানা ও জেলা পর্যায়েও খেলেছেন। তার ইচ্ছা ছিল জাতীয় দলে খেলার। কিন্তু আর্থিক সমস্যা ও বিভিন্ন বাস্তবতার কারণে তা অপূর্ণই থেকে যায়।

শহীদ হওয়ার ঘটনা

জুলাই ২০২৪; কোটা সংস্কারের দাবিতে সারাদেশে শুরু হয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। শ্রাবণও ছাত্র হওয়ায় নিয়মিত এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেন। পরিবারের লোকজন তাকে ফোন

দিয়ে নিষেধ করলেও কারো বাধা তাকে ঘরে রাখতে পারেনি। শ্রাবণ তার মাকে বলতেন, "মা আমার যেসব ভাইবোন আন্দোলন করছে, তারাও তো কোনো-না-কোনো মায়ের সন্তান। তাদেরও তো মা আছে, তাদেরও তো পরিবার আছে। তারা যদি আন্দোলনে থাকতে পারে, আমি কেন পারব না? দোয়া করো মা, যেন আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও স্বৈরাচারের হাত থেকে দেশকে এবং দেশের মানুষকে রক্ষা করতে পারি।"

৫ই আগস্ট ২০২৪; স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের পতন হলে বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ করেন শ্রাবণ। সময় বিকাল ৩:৩০ মিনিট। মিরপুর মডেল থানার সামনে ছাত্র জনতার এ বিজয় মিছিলের উপরগুলি বর্ষণ করে পুলিশ। গুলিবিদ্ধ হন মাহফুজ আলম শ্রাবণ। পুলিশের ছোঁড়া গুলি তার বাম পাশের বুকের উপরের অংশ দিয়ে ভেদ করে ডান পাশের পেটের অংশ দিয়ে বের হয়ে যায়।

ঘটনাস্থল থেকে এক ব্যক্তি ফোন দিয়ে তার বড় ভাই মুস্তাফিজুর রহমানকে এ তথ্য জানান। তারপর শ্রাবণের সহকর্মী ও রুমমেট মাসুদ খবর পেয়ে দ্রুত হাসপাতালে পৌছান। অনেক খোঁজাখুঁজির পর কোথাও না পেয়ে অবশেষে মাটিতে পড়ে থাকা তিনটি মরদেহের মধ্য থেকে শহীদ মাহফুজ আলম শ্রাবণের লাশ সনাক্ত করা হয়। এরপর তাকে মিরপুর ৬ নাম্বারে অবস্থিত ডাক্তার আজমল হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

এরই মধ্যে পরিবারের সদস্যরা তাৎক্ষণিকভাবে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে রওনা দেন ঢাকার উদ্দেশ্যে। পথিমধ্যেই শুনতে পান শ্রাবণ আর বেঁচে নেই।

ঢাকায় পৌঁছে শ্রাবণের মৃতদেহ নিয়ে রাত তিনটায় তার পরিবার নওগার নিজ বাড়িতে গিয়ে পৌঁছান। পরের দিন ৬ই আগস্ট জানাজার নামাজ সম্পন্ন করে বেলা ১১টায় কবরস্থ করা হয় শহীদ মাহফুজ আলম শ্রাবণকে।

শহীদ শ্রাবণ সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্য

শ্রাবণ ছোটবেলা থেকেই ধার্মিক ছিলেন নিয়মিত মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করতেন সাহসী ও প্রতিবাদী অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি সব সময় প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করতেন।

শ্রাবণের পরিবারের আয়ের উৎস ছিল তার বাবার ওয়ার্কশপের ক্ষুদ্র ব্যবসা। তার বড় ভাই মোস্তাফিজুর রহমান তার বাবার সাথে ওই ব্যবসা পরিচালনা করতেন। তাদের আধাপাকা তিন রুম বিশিষ্ট টিনশেডের ছোট একটি বাড়ি আছে। দুই ছেলের লেখাপড়ার খরচ বহন করে সংসারের সকল খরচ মেটাতে প্রতিনিয়ত হিমশিম খেতে থাকেন তার বাবা মোশাররফ হোসেন। তাই শহীদ মাহফুজ আলম শ্রাবণ তার বাবার আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে লেখাপড়ার পাশাপাশি মিরপুর ৭-এ অবস্থিত জেনেটা লিমিটেড কোম্পানিতে যোগদান করেন। সেখানে তিনি ঔষধ প্যাকেজিং, মিক্সিং ইত্যাদি কাজ করতেন। তিনি ২৮শে জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে এই চাকরিতে যোগ দেন।

তার স্বপ্ন ছিল, তার উপার্জনের টাকা দিয়ে তার বাবা-মাকে হজ্ব করাবেন।

তার বাবার ব্যবসা মহাদেবপুর সদরে হওয়ায় একসময় তারা পরিবারের সবাই মহাদেবপুরেই থাকতেন। শ্রাবণ মহাদেবপুর সর্বমঙ্গলা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ করেন।

পরবর্তীতে রাইগা মহাদেবপুর ডিগ্রী কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। তার ছোট ভাই মাহিদ ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে।

শ্রাবণের পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস ছিল তার বাবার ওই ছোট্ট ব্যবসা। মহাদেবপুর সদরে তাদের অল্প আয়ে সংসার চালানো কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই তারা পরিবারসহ আবার তাদের গ্রামের বাড়ি দোগাছীতে চলে যান। এসএসসি পাশ করে শহীদ শ্রাবণ ঢাকায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তার পরিকল্পনা ছিল, চাকরির পাশাপাশি লেখাপড়াটা চালিয়ে যাবেন। তাই তিনি অনার্সে ভর্তির জন্য আবেদনও করেন। তার স্বপ্ন ছিল, তার উপার্জনের টাকা দিয়ে তার বাবা-মাকে হজ্ব করাবেন।

শহীদ শ্রাবণের মৃত্যুতে তার পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া। শ্রাবণ তার মাকে প্রায় বলতেন, "মা আমাকে নিয়ে তুমি একদিন গর্ব করবে। তোমাকে সবাই 'মাহফুজের মা' নামে জানবে। তুমি আমার জন্য দোয়া করো মা।"

শ্রাবণের মা ছেলে হারানোর ব্যথা সহ্য করতে পারছে না। তিনি সারাক্ষণ শহীদ শ্রাবণের বলে যাওয়া কথাগুলো বলছেন আর কাঁদছেন। মা-ভক্ত শ্রাবণ ঢাকায় থাকাকালীন ফোন দিয়ে জানাতেন মায়ের হাতের রান্না খেতে না পারার আক্ষেপ।

মা বেবী নাজনীন ছেলেকে বিয়ে দিবেন বলে মেয়েও ঠিক করে রেখেছিলেন। কিন্তু এসবকিছু এখন দুঃসহ স্মৃতি হয়ে রইল। কিন্তু মায়ের অবুঝ মন তো আর মেনে চলে না কোনো নিয়ম কিংবা ধারা। তাইতো ছেলের কবরে বারবার ছুটে যান ছেলে যদি একটিবার 'মা' বলে ডাকেন, এই মিছে আশায়।

শহীদের বড় ভাই মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, শহীদ শ্রাবণ একজন সাহসী সৎ ছেলে ছিল। শহীদের এক প্রতিবেশী আইনজীবী বলেন, শহীদ মাহফুজ আলম শ্রাবণ মিশুক, ধার্মিক ও নম্র স্বভাবের ছেলে ছিল। সে অন্যায় সহ্য করতে পারতো না। তাই তো বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যোগদান করে। সবাইকে কাঁদিয়ে সে আজ চির নিদ্রায় শায়িত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মাহফুজ আলম শ্রাবন
Name: MAHFUZ ALOM SRABON
পিতা: মোঃ মোশাররফ হোসেন
মাতা: মোছাঃ বেবী নাজনীন
Date of Birth: 03 May 2003
ID NO: 9176285014

এক নজরে শহীদ শ্রাবণের প্রোফাইল

নাম	: মাহফুজ আলম শ্রাবণ
জন্ম তারিখ	: ০৩.০৫.২০০৩
জন্মস্থান	: দোগাছি, নওগাঁ
পেশা	: ছাত্র ও চাকরিজীবী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: রাইগা ডিগ্রী কলেজ, নওগাঁ
কর্মস্থল	: রেনেটা লিমিটেড, মিরপুর, ঢাকা
পিতা	: মো: মোশাররফ হোসেন
মাতা	: মোছা: বেবী নাজনীন
বর্তমান ঠিকানা	: মিরপুর, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম-দোগাছি, ইউনিয়ন-বোয়ালিয়া, থানা-নওগাঁ সদর, জেলা-নওগাঁ
গুলিবিদ্ধের স্থান	: মিরপুর-২, মডেল থানার সামনে
ঘাতক	: পুলিশ
আঘাতের ধরন	: বুকে গুলিবিদ্ধ
গুলিবিদ্ধ হওয়ার তাং ও সময়	: ৫ই আগস্ট, ২০২৪; বিকাল ০৩:৩০
শহীদ হওয়ার তাং ও সময়	: ৫ই আগস্ট ২০২৪, বিকাল ০৪:০০টা
শহীদ হওয়ার স্থান	: মিরপুর-৬, ডাক্তার আজমল হসপিটালে নেওয়ার পথে
সমাধিস্থল	: গ্রামের কবরস্থান

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান

২. বড় ভাই মোস্তাফিজুর রহমানের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা

মা অঞ্জনা বেগম পাগলপ্রায়। তিনি রাসেলের রক্তমাখা জামাটি বুকে চেপে ধরে কাঁদতে থাকেন। সেই কান্নায় পুরো গ্রাম শোকের সাগরে ডুবে যায়। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলেন আমার ছেলে ছোটবেলা থেকেই কত কষ্ট করেছে! যেটুকু উপার্জন করত, তার অর্ধেক বাবাকে দিত। প্রতি ঈদে নতুন কাপড় নিয়ে আসতো। তার বোনটার চিকিৎসা করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অথচ সেই ছেলেটা আজ আর নেই।

শহীদ মো: রাসেল রানা

ক্রমিক : ২৬২

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৪

শহীদ পরিচিতি

নওগাঁ জেলার মান্দা থানার কসব ইউনিয়নের এক শান্ত সবুজে ঘেরা গ্রাম ভোলাগাড়ি। সেই গ্রামের পিন্টু রহমান আর অঞ্জনা বেগমের ঘরে একটি মাত্র ছেলে রাসেল রানার জন্ম হয়। তার জন্মের দিনটি ছিল ২রা মার্চ, ২০০৪ সাল। মাঘ মাসের শীতল হাওয়া তখনও পুরোপুরি বিদায় নেয়নি। পিন্টু আর অঞ্জনার তিন মেয়ের মধ্যে একমাত্র ছেলে ছিল রাসেল।

পিতা মো: পিন্টু রহমান পেশায় রিক্সাচালক ও দিনমজুর। মাতা মোছা: অঞ্জনা বেগম পেশায় গৃহিণী ও অন্যের বাড়িতে কাজ করেন। তিন বোনের বড়জন মোছা: শারমিন খাতুন বিবাহিতা। থাকেন শ্বশুর বাড়ি। মেজবোন মোছা: শাকিলা খাতুন তালাকপ্রাপ্তা। আর সবার ছোট বোন ১৩ বছর বয়সী মোছা: বৈশাখী খাতুন জন্ম থেকে প্রতিবন্ধী।।

পিতার রিক্সা চালনা আর মায়ের অন্যের বাসাবাড়িতে কাজের বিনিময়ে পাওয়া অর্থে চলতো এই অসহায় পরিবারের দিনকাল। পিতার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হওয়ায় ভাইবোনের কারো হয়নি পড়ালেখা করার সৌভাগ্য। বালক বয়সেই রাসেল রানা চলে যান নারায়ণগঞ্জে তার এক প্রতিবেশী চাচার কাছে। সেখানেই ২০১৯ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বিনা মজুরিতে শেখেন দর্জির কাজ। তারপর ২০২২ সাল থেকে মৃত্যুর পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত মাসিক ১৫০০ টাকা বেতনে কাজ করতে থাকেন।

রাসেল যেভাবে শহীদ হন

জুলাই ২০২৪; বৈষম্যের বিরুদ্ধে মানুষের চেতনা জেগে উঠেছিল দেশে। ততদিনে রাসেল হয়ে উঠেছে একজন সাহসী প্রতিবাদী তরুণ। অন্যায় না মানা অকুতোভয় প্রাণ।

১৯ জুলাই ২০২৪; নারায়ণগঞ্জে ছাত্ররা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নামলো। রাসেলও ছিল তাদের সঙ্গে। তার চোখে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার। সেই আন্দোলনে পুলিশ আর ছাত্রদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বাঁধে। হঠাৎ করেই পুলিশ গুলি ছোড়ে ছাত্রদের দিকে। এক মুহূর্তে সব স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, যখন একটি গুলি রাসেলের বুকে এসে বিদ্ধ হয়। রাসেল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সময় তখন বিকেল ৫:৩০মিনিট। অথচ ৩০ মিনিট পূর্বে বিকাল ৫টায় বাবার সাথে কথা হয় শহীদ রাসেলের।

অজ্ঞাত নাম্বার থেকে রাসেলের বাবার ফোনে কল যায়। তিনি খবর পান রাসেলের বুকে গুলি লেগেছে। ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য রাসেলের বাবা নারায়ণগঞ্জে রাসেলের সেই প্রতিবেশী চাচার সাথে যোগাযোগ করলে তিনি কিছুই বলতে পারেন না। অবশেষে পিন্টু ছুটে যান ঢাকায়। ২১ শে জুলাই তারা ঢাকা মেডিকেল কলেজে রাসেলকে খুঁজে পায়।

এদিকে গুলিবিদ্ধ রাসেলকে স্থানীয় লোকজন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ডাক্তার জানান, রাসেলের প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। তাকে বাঁচাতে রক্তের প্রয়োজন। কিন্তু কে জোগাড় করবে রক্ত! কে দেবে রক্ত!

আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হলেও রাসেলকে সঠিক চিকিৎসা দেওয়া হয়নি। প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে হাসপাতালের বেডে কাতরাতে কাতরাতে তিনদিন পর ২২ শে জুলাই, ২০২৪ সোমবার ভোর ৩টা ৩০ মিনিটে শহীদ হন রাসেল রানা।

শহীদ রাসেলের আরো কিছু তথ্য

শহীদ মোঃ রাসেল রানাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তার পিতা মোহাম্মদ পিন্টু রহমানই পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস ব্যক্তি। তিনি ফসলের মৌসুমে দিনমজুরের কাজ করেন এবং বছরের বাকি সময় ঢাকা শহরে রিকশা চালান। মা অন্যের বাসাবাড়িতে কাজ করেন। বর্তমানে মা-বাবা, দাদী ও দুই বোনসহ মোট ৫ জনের পরিবার রাসেল রানাদের। বাবা মোঃ পিন্টুর রহমানের চাচাতো শ্বশুর থেকে পাওয়া ১ শতক জমি ও তার সাথে কিছু খাস জমির উপর দুই রুমের ছোট্ট একটি মাটির ঘরে বসবাস তাদের।

রাসেল রানার তিন বোনের মধ্যে বড় বোন শারমিনের বিয়ে হয় পাশের গ্রামে। মেজ বোন শাকিলার জীবন সুখের ছিল না। বিয়ের মাত্র তিন মাসের মাথায় স্বামী তালাক দিয়ে বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। আর ছোট বোন জন্ম থেকেই শারীরিক প্রতিবন্ধী। হাঁটতে পারে না, চলাফেরা তো দূরের কথা। সেই বোন এখনো শয্যাশায়ী।

অনেক স্বপ্ন নিয়ে রাসেল শহরে আসে। একদিন বড় কিছু করবে সে। বাবাকে রিক্সা চালাতে হবে না, মা আর অন্যের বাড়িতে কাজ করবে না, ছোট বোনের চিকিৎসা হবে, আরো কত কী! কিন্তু স্বপ্নবাজ সেই বালকের জীবনকে থমকে দেয় স্বৈরাচারের একটি বুলেট।

আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নেওয়া হলে ডাক্তাররা বলেছিল, সে প্রচুর রক্ত হারিয়েছে। তাকে ইমার্জেন্সি রক্ত দিতে হবে। কিন্তু তার পাশে তো কেউ ছিল না! কে দিবে রক্ত? কে ব্যবস্থা করবে রক্ত? ক্ষুধায় পিপাসায় চিৎকার করেছিল রাসেল! কিন্তু একফোঁটা পানি পর্যন্ত কেউ তাকে দেয়নি। তারা রাসেলকে চিকিৎসা না করে নিঃশব্দে মেরে ফেলেছিল। ২২শে জুলাই ভোর ৩ টা ৩০ মিনিটে রাসেল শাহাদাত বরণ করেন। সেই সন্ধ্যায় তার মরদেহ গ্রামের বাড়ি ভোলা গাড়িতে আনা হয়। মা অঞ্জনা বেগম পাগলপ্রায়। তিনি রাসেলের রক্তমাখা জামাটি বুকে চেপে ধরে কাঁদতে থাকেন। সেই কান্নায় পুরো গ্রাম শোকের সাগরে ডুবে যায়। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলেন আমার ছেলে ছোটবেলা থেকেই কত কষ্ট করেছে! যেটুকু উপার্জন করত, তার অর্ধেক বাবাকে দিত। প্রতি ঈদে নতুন কাপড় নিয়ে আসতো। তার বোনটার চিকিৎসা করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অথচ সেই ছেলেটা আজ আর নেই।

রাসেলের বাবা পিন্টু রহমান কান্না জড়িত কণ্ঠে বলেন, "আমার ছেলেটা তো কোনো অপরাধ করেনি। সে তো শুধু অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। কেন তারা আমার ছেলেকে মেরে ফেলল? আমার একমাত্র ছেলেটা চলে গেল। আমার জীবন তো শেষ হয়ে গেল।"

রাসেলের প্রতিবন্ধী বোনের জন্য তার মা একটানা এক বছর রোজা রেখেছিলেন। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, মেয়েকে সুস্থ করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু আল্লাহ তার পরীক্ষা নিলেন অন্যভাবে। ছোট বোনের চিকিৎসার স্বপ্ন দেখা সেই রাসেলকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন।

রাসেলের দাদি বলেন, "রাসেল ফোন দিয়ে বলতো, 'দাদি, আর ঢাকায় ভালো লাগে না। একটা দোকান দিলে বাড়িতে চলে আসব।' আমার নাতি তো বাড়িতে ফিরল, কিন্তু সাদা কাপড়ে মোড়ানো অবস্থায়। তারা আমার নাতিকে হত্যা করেছে।"

গ্রামের সবাই কাঁদছে। প্রতিবেশীরাও শোকাহত। তারা চায় রাসেলের হত্যার বিচার। বৈষম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সেই সাহসী ছেলেটিকে এভাবে নির্মমভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হবে, কেউ কল্পনাও করেনি। তার পরিবার এখন শূন্য, অভাবের ভেতরে ডুবে গেছে। তার বাবা আর রিকশা চালায় না, তার মা কাঁদে, আর বোনটি অসুস্থতায় কাতর!

কিন্তু এই শোকের মধ্যে তারা একটি স্বপ্ন দেখে– একদিন যেন শহীদ রাসেল রানার মৃত্যুর ন্যায়বিচার হয়। যেন বৈষম্যের বিরুদ্ধে তার লড়াই বৃথা না যায়। যেন আর কোনো মায়ের কোল খালি না হয়।

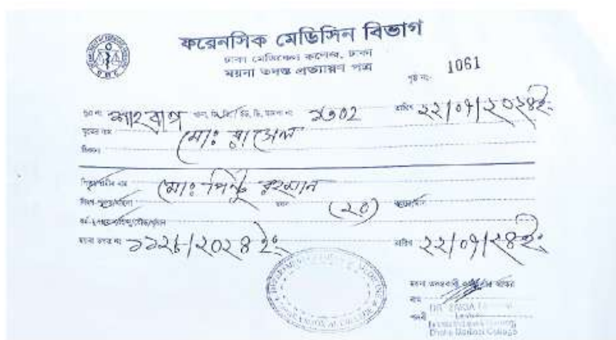

ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ

ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

ময়না তদন্ত প্রত্যায়ন পত্র

1061

শাহবাগ ... 2302 ... ২২/০৭/২০২৪ইং

মোঃ রাসেল

মোঃ পিন্টু রহমান

(২০)

... /২০২৪ইং ... ২২/০৭/২৪ইং

Dhaka Medical College

এক নজরে শহীদের প্রোফাইল

নাম	: মো: রাসেল রানা
জন্ম তারিখ	: ০২.০৩.২০০৪
জন্মস্থান	: ভোলাগাড়ি, নওগাঁ
পেশা	: দর্জি
কর্মস্থল	: নারায়ণগঞ্জ
পিতা	: মো: পিন্টু রহমান
মাতা	: মোছা: অঞ্জনা বেগম
বর্তমান ঠিকানা	: নারায়ণগঞ্জ
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ভোলাগাড়ি, ইউনিয়ন: কসব, থানা: মান্দা, জেলা: নওগাঁ
পরিবারের সদস্য	: ৫ জন
আঘাতের ধরন	: গুলিবিদ্ধ
গুলিবিদ্ধের স্থান	: নারায়ণগঞ্জ
ঘাতক	: পুলিশ
গুলিবিদ্ধ হওয়ার তাং ও সময়	: ১৯শে জুলাই, ২০২৪; বিকাল ০৫:৩০টা
শহীদ হওয়ার তাং ও সময়	: ২২শে জুলাই, ২০২৪ ভোর ৩:৩০টা
শহীদ হওয়ার স্থান	: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
সমাধিস্থল	: গ্রামের কবরস্থান, ভোলাগাড়ি

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. শহীদ রাসেল রানার পরিবারকে বসবাসের জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া
২. পিতা পিন্টু রহমানের জন্য একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
৩. প্রতিবন্ধী বোন মোছা. বৈশাখী খাতুনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা
৪। নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা।

"খুনি হাসিনা পালানোর কিছুদিন পর ভ্যানের উপর লাশের স্তূপের যে ভিডিওটি দেশব্যাপী ভাইরাল হয়েছিল, যে লাশগুলো লেগুনাতে তুলে পরবর্তীতে পেট্রোল ঢেলে পুলিশ পুড়িয়ে দিয়েছিল, সেই লাশগুলোর মধ্যে ছিলেন শহীদ আস সাবুর"

শহীদ আস সাবুর

ক্রমিক : ২৬৩

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৫

শহীদ পরিচিতি

শহীদ আস সাবুরের জন্ম ১৬ই ফেব্রুয়ারি ২০১০ সাল। নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর থানার উকিলপাড়া গ্রামে পিতা মো. এনাব নাজেজ (জাকী) ও মাতা মোছা: রাহেন জান্নাত ফেরদৌসীর ঘর আলোকিত করে আগমন ঘটে তার। পিতামাতার দুই সন্তানের মধ্যে তিনিই ছোট।

সাবুর বাবামায়ের সাথে আশুলিয়ার শিমুলবাগান এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। তার বাবা অবসরপ্রাপ্ত গার্মেন্টস কর্মী। বিগত সাত মাস আগে তিনি চাকরি থেকে অবসরে গেছেন। তার মা একজন গৃহিণী।

আস সাবুর ছিলেন মেধাবী ছাত্র। তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঐতিহ্যবাহী শাহীন কলেজ, ঢাকা (আশুলিয়া শাখা)। এই প্রতিষ্ঠানে তিনি বিজ্ঞান বিভাগে দশম শ্রেণিতে পড়াশোনা করতেন। অত্যন্ত মেধাবী সাবুর ছাত্রজীবনে কোনো ক্লাসে দ্বিতীয় হননি। সব সময় প্রথম স্থান অধিকার করে কৃতিত্বের সাথে পাস করতেন।

তার আর কোনো খোঁজ মিলছিল না। তখন থেকেই শুরু হয় তাকে খোঁজ করা। এলাকার সকল হাসপাতাল ক্লিনিক এবং আশেপাশের সকল বাসাবাড়িতে তাকে খোঁজা হয়। কিন্তু কোথাও পাওয়া যায় না।

পরবর্তীতে ৬ই আগস্ট সকাল থেকে তাকে খোঁজা হয়। বিকালে তার আগুনে পোড়া মরদেহ পাওয়া যায় আশুলিয়া থানার সামনে।

সাবুরের বাবার অবসরের পর তার বড় ভাই মো. রেজওয়ানুল ইসলাম প্রতিমাসে তার বাবাকে ১৫০০০ করে টাকা দিতেন। তা দিয়েই আশুলিয়ার ভাড়া বাসায় তাদের খরচ নির্বাহ হতো। তার বড় ভাই বগুড়ায় প্রিমিয়ার সিমেন্ট কোম্পানিতে কর্মরত আছেন। ২০২৫ সালে সাবুরের এসএসসি পরীক্ষার পর তার বাবা সপরিবারে তার বড় ভাইয়ের কাছে বগুড়ায় যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! সেই দিনটা সাবুরের জীবনে আর এলো না।

আস সাবুর যেভাবে শহীদ হলেন

৫ই আগস্ট ২০২৪; আস সাবুর সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হন। সকাল পৌনে ১১টা নাগাদ তার বড় ভাইকে ফোন দিয়ে জানান যে, তিনি আন্দোলনে গিয়েছেন এবং বাইপাইল মোড়ে অবস্থান করছেন। দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ আবারও তার বড় ভাইকে ফোন করে জানান যে, সেখানে প্রচন্ড গোলাগুলি চলছে। তার সামনে একজনের মাথায় গুলি লেগেছে, একজনের কোমরে গুলি লেগেছে, কিন্তু তিনি নিরাপদ জায়গায় আছেন।

পরবর্তীতে বেলা সাড়ে ৩টা নাগাদ তিনি তার বাসার এক ভাইকে জানান যে, তিনি নিরাপদ জায়গায় আছেন। তিনি তার নিরাপদ থাকার কথা তার মাকেও জানাতে বলেন। কিন্তু বিকেল ৫টা থেকে

যা ৫ই আগস্ট বিকালে কিছু পুলিশ আস সাবুরসহ আরো কিছু মানুষকে পায়ে গুলি করে লাঠি দিয়ে মেরে জীবন্ত অবস্থায় একটি ভ্যানে স্তুপ করে পরে লেগুনাতে তুলে পেট্রোল দিয়ে জ্বলিয়ে দেয়।

শেখ হাসিনার ক্ষমতা ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার বেশ কিছুদিন পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই ভিডিওটি চরম ভাইরাল হয়

এবং সারাদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেই ভিডিও ক্লিপে দেখা যায়, কয়েকজন পুলিশ সদস্য একটা ভ্যানের ওপর অনেকগুলো লাশ তুলে স্তূপ করেছে। তারপর বড় কাপড় দিয়ে লাশগুলোকে ঢেকে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে।

আসলে পুলিশ ওই লাশগুলো নিয়ে একটি লেগুনাতে তোলে। তারপর পেট্রোল ঢেলে সেগুলো পুড়িয়ে দেয়। অথচ তখনও বেঁচে ছিল কেউ কেউ। সেই পোড়া লাশের ভিডিও চিত্র ৬ আগস্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়। কিন্তু তখন মনে করা হয়েছিল, সেগুলো বোধহয় পুলিশের লাশ।

শহীদ আস সাবুরের আরো কিছু তথ্য

সাপুরের পিতা মোঃ এনাব নাজেজ সাভারের আশুলিয়ায় একটা গার্মেন্টসে কোয়ালিটি কন্ট্রোলার হিসেবে ১৪ বছর চাকরি করার পর ৭ মাস আগে অবসরে গিয়েছেন। এনাব নাজেজের দুই ছেলে। বড় ছেলে মোহাম্মদ রিজওয়ানুল ইসলাম পড়াশোনা শেষ করে বগুড়ায় প্রিমিয়ার সিমেন্ট কোম্পানিতে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত আছেন। সেখানে তিনি স্ত্রী সন্তান নিয়ে থাকেন। এনাব নাজেজ ভেবেছিলেন, আর তো মাত্র কয়েকটি মাস! সাবুরের এসএসসি পরীক্ষা হয়ে গেলে তিনি স্ত্রী সন্তান নিয়ে বড় ছেলের কাছে বগুড়া চলে যাবেন কিন্তু কে জানত এনাব নাজেজ যে ছেলের পরীক্ষার অপেক্ষা করছিলেন, সেই চলে যাবে এত তাড়াতাড়ি।

আস সাবুর সাদাসিধে ধার্মিক ছিলেন। নিয়মিত নামাজ কালাম করতেন। বাবা এনাব নাজেজ মুখের দাড়ি কাটতেন। দাড়ি না কাটতে আস সাবুর বাবাকে অনেকবার নিষেধ করেছেন।

আস সাবুর এতটাই মেধাবী ছিলেন যে, প্রত্যেক ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করতেন। আস সাবুরের মেধার স্বীকৃতি স্বরূপ এখনো বাসায় সাজানো রয়েছে তার অনেক পুরস্কার; সনদ ক্রেস্ট এবং

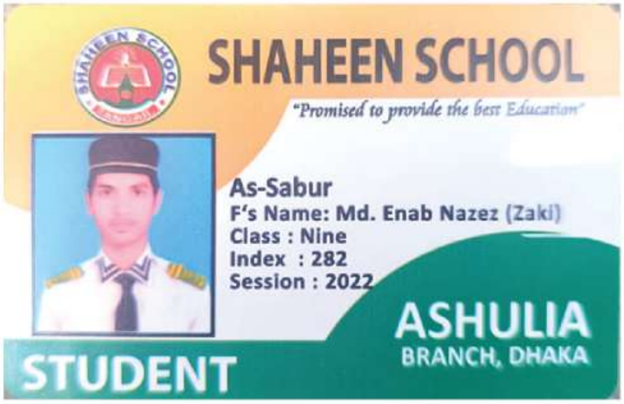

মেডেল। শুধু নেই আস সাবুর। আস সাবুরকে যেভাবে আগুনে পোড়ানো হয়েছিল, তাতে তাকে চেনার উপায় ছিল না। কিন্তু তার গলায় থাকা আইডি কার্ডের ফিতা, টি-শার্টের সামান্য কিছু অংশ এবং তার মোবাইলে থাকা সিম কার্ডটি ভালো থাকায় সেটার মাধ্যমেই তাকে সনাক্ত করা হয়।

পরবর্তীতে ৭ আগস্ট তার গ্রামের বাড়ি নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর থানার মহাদেবপুর কেন্দ্রীয় গোরস্থানে চিরনিদ্রায় তাকে শায়িত করা হয়।

আস সাবুরের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটামুটি। তার পিতা দীর্ঘ ১৪ বছর গার্মেন্টসের ভালো পদে চাকরি করে বর্তমানে অবসরে আছেন। তার গ্রামের বাড়িতে রয়েছে এক বিঘা ফসলী জমি। যেটা লিজ দিয়ে তিনি বছরে ১২ হাজার টাকা পান।

এক নজরে শহীদ আস-সাবুর

নাম	: আস সাবুর
জন্ম তারিখ	: ১৬.০২.২০১০
জন্মস্থান	: উকিলপাড়া, নওগাঁ
পেশা	: ছাত্র
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: শাহিন কলেজ (আশুলিয়া শাখা)
শ্রেণি	: দশম (বিজ্ঞান বিভাগ)
পিতা	: মো: এনাব নাজেজ (জাকী)
মাতা	: মোছা: রাহেন জান্নাত ফেরদৌসী
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: উকিলপাড়া, ইউনিয়ন: মহাদেবপুর সদর, থানা: মহাদেবপুর, জেলা: নওগাঁ
পরিবারের সদস্য	: ৫ জন
আঘাতের ধরন	: গুলিবিদ্ধ অতঃপর পুড়িয়ে মারা
গুলিবিদ্ধের স্থান	: আশুলিয়া থানার সামনে, বাইপাইল মোড়
ঘাতক	: পুলিশ
হত্যার তাং ও সময়	: ৫ই আগস্ট, ২০২৪; বিকাল ০৪:৩০টা
সমাধিস্থল	: মহাদেবপুর কবরস্থান, নওগাঁ

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারকে নিয়মিত ভাতা প্রদান করা

হাসিনা দেশ ছেড়ে পালানোর কিছুদিন পর ভ্যানের উপর লাশের স্তুপের যে ভিডিওটি দেশব্যাপী ব্যাপক ভাইরাল হয়েছিল, সেই লাশগুলোর মধ্যে ছিলেন শহীদ বায়েজিদ বোস্তামী।

শহীদ বায়েজিদ বোস্তামী
ক্রমিক : ২৬৪
আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৬

শহীদ পরিচিতি

বায়েজিদ বোস্তামীর জন্ম ২৮ এপ্রিল ২০০১ সালে গ্রামের বাড়ি কৈগ্রাম ফার্শি পাড়ায়। তার ইউনিয়ন উমার, থানা ধামুইরহাট, জেলা নওগাঁ। তার পিতার নাম মৃত সাখাওয়াত হোসেন। মাতা বেনু আরা।

বায়েজিদ বোস্তামীরা দুই ভাই এক বোন। বড় ভাই কারিমুল ইসলাম (২৪) দিনমজুর, ছোট বোন উম্মে সালমা (১৭) দশম শ্রেণির ছাত্রী। পড়াশোনা করেন কৈফতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে।

বায়েজিদ বোস্তামী বিবাহিত ছিলেন। তার স্ত্রীর নাম রিনা আক্তার। তিনি একজন গার্মেন্টস কর্মী। বায়েজিদ বোস্তামীর ৭ মাসের একটি ছেলে সন্তান রয়েছে। নাম রাফি আব্দুল্লাহ।

বায়েজিদ বোস্তামী বর্তমানে পেশায় গার্মেন্টস কর্মী ছিলেন। অফিস সহকারীর চাকরি করতেন ভেনেসো বাংলাদেশ লিমিটেড-এ। স্ত্রী সন্তান নিয়ে থাকতেন আশুলিয়া।

যেভাবে শহীদ হন তিনি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বায়েজিদ বোস্তামীর গার্মেন্টস বন্ধ থাকায় তিনি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। স্বৈরাচারের কবল থেকে নিজেকে, দেশকে, দেশের মানুষকে মুক্ত করতে ৫ই আগস্ট আশুলিয়া থানার সামনে ছাত্র জনতার

আন্দোলনে যোগ দেন তিনি। আনুমানিক বিকাল ৪টার সময় ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে ছাত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ গুলি করে এবং বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে। গুলিবিদ্ধ হন শহীদ বায়েজিদ বোস্তামী। তার সাথে নিহত হন আরো অনেকে। পুলিশ সদস্যরা সেই লাশগুলো একটি ভ্যানের উপর স্তুপ করে। যে ভিডিওটি সারাদেশে ব্যাপক ভাইরাল হয় এবং আলোড়ন সৃষ্টি করে। তারপর তাকেসহ সেই লাশগুলো আশুলিয়া থানার সামনে একটি লেগুনাতে তুলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। পুড়ে ঝলসে যায় শহীদ-বায়েজিদ বোস্তামীর সমস্ত দেহ।

৬ই আগস্ট শহীদ বায়েজিদ বোস্তামীর সাথে থাকা অধ্য পুড়ে যাওয়া কলেজের এইচএসসির আইডি কার্ড, মোবাইল ফোন ও স্ত্রীর ছবি দেখে মরদেহ সনাক্ত করা হয়। আশুলিয়া থানা থেকে শহীদ বায়েজিদ বোস্তামীর পরিবারের সাথে যোগাযোগ করা হয়। ফোন পেয়ে শহীদ বায়েজিদ বোস্তামির চাচাতো ভাই আলামিন, সালমানসহ তার স্ত্রী তৎক্ষণাৎ ছুটে যান আশুলিয়া থানায়। অতঃপর বিকেলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমন্বয়ক ও সেনাবাহিনীর মাধ্যমে শহীদের স্ত্রী রিনা আক্তারের কাছে তার পুড়ে যাওয়া মৃতদেহ হস্তান্তর করা হয়।

শেখ হাসিনার ক্ষমতা ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার বেশ কিছুদিন পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই ভিডিওটি ভাইরাল হয় এবং সারাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেই ভিডিওতে দেখা যায়, কয়েকজন পুলিশ সদস্য একটা ভ্যানের ওপর অনেকগুলো লাশ তুলে স্তুপ করেছে। তারপর বড় কাপড় দিয়ে লাশগুলোকে ঢেকে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ ওই লাশগুলো নিয়ে একটি লেগুনাতে তোলে। তারপর পেট্রোল ঢেলে সেগুলো পুড়িয়ে দেয়। পোড়া লাশের ভিডিও চিত্র ৬ আগস্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়।

শহীদ পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

বায়জিদ বোস্তামির বাবা মারা গেছেন ২০১৮ সালে। বাবা মারা যাওয়ার পর বায়েজিদের বড় ভাই কারিমুল ইসলাম লেখাপড়া বাদ দিয়ে সংসারের হাল ধরেন। বায়েজিদ তখন পড়াশোনা করতেন। বাবার রেখে যাওয়া কোনো সহায়-সম্পত্তি না থাকায় সংসার চালাতে দিনমজুরের কাজ করেন শহীদের বড় ভাই। মাঝে মাঝে বায়েজিদ বোস্তামীও কাজ করতেন। এভাবেই চলছিল ২ ভাই, ১ বোন ও মা'সহ ৪ জনের সংসার। যেখানে বায়েজিদ ও তার বোন পড়াশোনাও করতেন। বায়েজিদ ২০১৮ সালে এসএসসি পাস করে জীবিকার তাকিদে ঢাকায় আসেন। সাভার আশুলিয়ায় একটি গার্মেন্টসে অফিস সহকারীর চাকরি নেন। পাশাপাশি এসএসসিতে ভর্তি হন উত্তরা আইডিয়াল কলেজে। ২০২০ সালে এইচএসসি পাস করেন। এরপর অনার্সে ভর্তির জন্য আবেদন করেন। ২০২২ সালে রিনা আক্তারের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে খুব কষ্ট করে নিজের সংসার ও ছোট বোনের পড়াশোনার খরচ চালিয়ে যেতে থাকেন বায়েজিদ বোস্তামী। তিনি

শহীদ হওয়ায় ৭ মাসের শিশুসন্তানসহ তার স্ত্রী দারুণ অসহায় হয়ে পড়েছেন। বর্তমানে তিনি চাকরি হারিয়ে সাভারের আশুলিয়ায় বোনের বাসায় মানবেতার জীবনযাপন করছেন।

গ্রামের বাড়িতে বায়েজিদ বোস্তামীদের থাকার মতো মাত্র দুটি মাটির ঘর আছে। বসতভিটার ১৭ শতক জমি ছাড়া আর কিছুই নেই তাদের।

শহীদ সম্পর্কে সামগ্রিক বর্ণনা

বাজার থেকে খানিকটা দূরে আঁকাবাঁকা মেঠো পথ পেরিয়ে তবেই দেখা যায় ছোট্ট একটি গ্রাম– কৈগ্রাম। নওগাঁ জেলার ধামইরহাট থানার কৈগ্রামে ২৮শে এপ্রিল, ২০০১ সালে এক গরীব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এক ছেলেশিশু। মা বেনু আরা ও বাবা ছাকোয়াত হোসেন ছেলের নাম রাখেন বায়েজিদ বোস্তামী। ইতিহাসে মাতৃভক্ত বায়েজিদ বোস্তামীর কথা কে না জানে? এই শিশু বায়েজিদও ছিলেন পিতামাতা ভক্ত।

বায়েজিদ বোস্তামী ছিলেন পরিবারের দ্বিতীয় সন্তান। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন শান্ত প্রকৃতির। বাস্তবতাটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারতেন তিনি। পরিবারের আর্থিক সমস্যার কারণে তিনি লেখাপড়ার পাশাপাশি বড় ভাইয়ের সাথে মানুষের বাড়িতে কাজ করতেন। ২০১৮ সালে ফার্শিপাড়া মোজাফফর রহমানিয়া দাখিল মাদ্রাসা থেকে তিনি দাখিল পাস করেন।

ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! সেই ২০১৮ সালেই তার বাবা সাখাওয়াত হোসেন পাড়ি জমান পরপারে। পরিবারের দায়িত্ব চলে আসে দুই ভাইয়ের কাঁধে। তাই পরিবারের কথা চিন্তা করে ঢাকায় চলে আসেন তিনি। আশুলিয়ায় ভেনেসা গার্মেন্টসে অফিস সহকারী হিসেবে যোগদান করেন। চাকরির পাশাপাশি পড়ালেখা চালিয়ে যেতে থাকেন। উত্তরা আইডিয়াল কলেজে মানবিক বিভাগে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হন। চাকরির পাশাপাশি পড়ালেখা কষ্টকর হলেও তিনি ছোট বোন এবং নিজের পরিবারের কথা চিন্তা করে থেমে থাকেননি।

২০২০ সালে বায়েজিদ উত্তরা আইডিয়াল কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। পরবর্তীতে অনার্সে ভর্তির জন্য আবেদন করেন।

২০২২ সালের ১১ ডিসেম্বর বায়েজিদ বোস্তামী রিনা আক্তারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। দুজনেই গার্মেন্টসে চাকরি করতেন, যা দিয়ে তাদের সংসার ভালোই চলছিল।

২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারির ২ তারিখ, বায়েজিদের ঘর আলোকিত করে জন্মগ্রহণ করে ফুটফুটে এক পুত্র সন্তান। নাম রাখেন রাফি আব্দুল্লাহ। পরিবারের সবাই খুশি। অথচ এই খুশি অচিরেই বিলীন হয়ে যায়। পরিবারে নেমে আসে চরম শোকের ছায়া। ৫ই আগস্টের এক কালো বিভীষিকা ভেঙেচুরে চুরমার করে দেয় এই পরিবারের সকল স্বপ্ন, সকল আশা-ভরসা। শোকে পাথর হয়ে যান বায়েজিদের স্ত্রী। সাত মাসের শিশু আব্দুল্লাহ কি বুঝেছিল কিছু? সে কি বুঝতে পেরেছিল মাত্র ৭ মাস বয়সে সে এতিম হয়ে গেছে? সে কি বুঝেছিল আর কখনোই তার পিতার মুখটি তার চোখের সামনে ভাসবে না?

আশুলিয়া জামে মসজিদের সামনে শহীদ বায়েজিদ বোস্তামীর প্রথম জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। পরের দিন ৭ আগস্ট সকালে নওগার ধামুইরহাট থানার অন্তর্গত তার নিজ গ্রাম কৈগ্রামের ফার্শি পাড়াতে তার দ্বিতীয় জানাজার নামাজ শেষে সরকারি কবরস্থানে তাকে চিরদিনের জন্য সমাহিত করা হয়। এই পৃথিবীর আলো বাতাস থেকে হারিয়ে যায় সংগ্রামী বায়েজিদ। সন্তানহারা বায়েজিদের মায়ের ক্রন্দনে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে ওঠে!

শহীদের স্বজনদের হাহাকার

বায়েজিদের রেখে যাওয়া পোশাক নিয়ে জড়িয়ে ধরে কান্না করতে থাকেন তার বন্ধুর মতো বড় ভাই। তিনি ক্রন্দনরত কণ্ঠে বলতে থাকেন, "তারা আমার ভাইকে গুলি করলো, কিন্তু আগুনে পুড়িয়ে জ্বালিয়ে দিলো কেন? কী দোষ ছিল

আমার ভাইয়ের?" তিনি আরো বলেন, "আমার ভাইয়ের রেখে যাওয়া পোশাক আমি যত্ন করে রেখে দিব। তার ছেলে রাফি যখন বড় হবে, তখন তাকে দেখাবো। সে অনুভব করতে পারবে বাবার ঘ্রাণ আসলে কেমন হয়।" এ বলে পোশাকগুলো জড়িয়ে ধরে অবুঝের মতো কান্না করেন তিনি।

ছোট বোন পাগলের মতো কান্না করেছেন আর বলছেন, "কে আমার লেখাপড়ার খোঁজ নিবে? কে আমাকে আদর করবে?

বায়েজিদের মা বলেন, "বায়েজিদের মানিব্যাগে যে টাকাগুলো পাওয়া গিয়েছে, সে টাকাগুলো আমার কাছ থেকে নিয়েছিলেন বাড়িতে আসার জন্য।" তিনি বলেন, "আমার ছেলে বাড়িতে আসলো ঠিকই, কিন্তু সাদা কাফনে জড়িয়ে পোড়া শরীর নিয়ে।"

শহীদদের এক প্রতিবেশী চাচা এনামুল হক জানান, "শহীদ বায়েজিদ বোস্তামী খুবই পরিশ্রমী ও সাহসী ছেলে ছিলেন। বাবা মারা যাওয়ার পর তারা দুই ভাই খুব কষ্ট করে সংসার চালাতো।" তিনি তাদের সংসারের করুণ অবস্থা এবং শহীদ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন।

বায়েজিদ বোস্তামির পরিবারের সকরুণ অবস্থা দেখে তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো ভাষা তখন কারো ছিল না।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Omar Union Parishad
Dhamoirhat, Naogaon
(Rule 11, 12)
মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration 14/08/2024
Death Registration Number 20016412884111887
Date of Issuance 14/08/2024

Date of Birth : 28/04/2001 Sex : Male
Date of Death : 05/08/2024
In Word : Fifth of August Two Thousand Twenty Four

নাম	: বায়েজিদ বোস্তামী	Name	: Baygid Bosstame
মাতা	: বেনুয়ারা	Mother	: Banu Ara
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: ছাকোয়াত হোসেন	Father	: Shokowat Hossen
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
মৃত্যুস্থান	: নওগাঁ, বাংলাদেশ	Place of Death	: Naogaon, Bangladesh
মৃত্যুর কারণ	: আগুনে পুড়ে মৃত্যু	Cause of Death	: Death by fire

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
14 AUG 2024
Md. Ruhul Amin
Union Parishad Administrative Officer
04 No. Umar Union Parishad
Dhamoirhat, Naogaon.

4 No Umar UP, Dhamoirhat, Naogaon.

Seal & Signature
Registrar
14 AUG 2024
Md. Abu Jafor Siddque
Panel Chairman-01
04 No Umar Union Parishad
Dhamoirhat, Naogaon.

This certificate is generated from bdris gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code

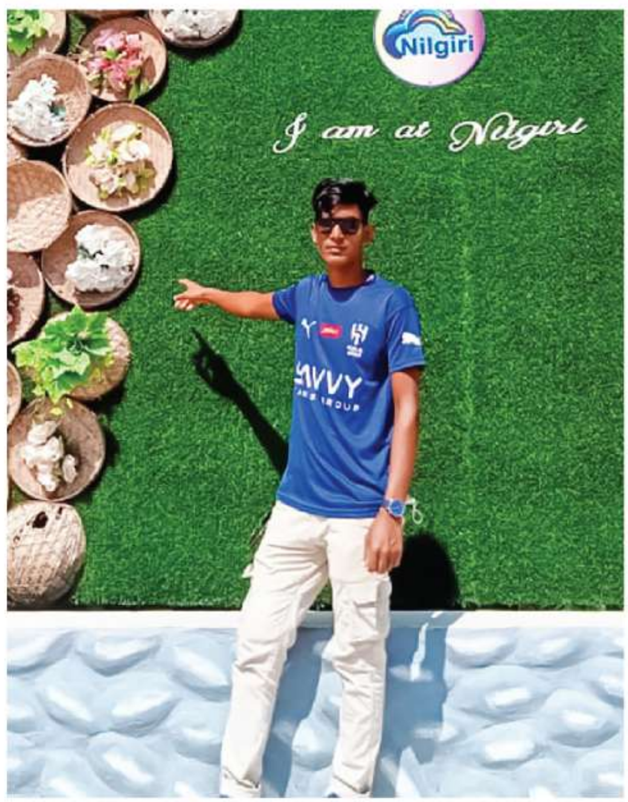

শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: বায়েজিদ বোস্তামী
জন্ম তারিখ	: ২৮.০৪.২০০১
শহীদ হওয়ার তারিখ ও সময়	: ৫ই আগস্ট, ২০২৪; বিকাল ০৪:৩০টা
আঘাতের ধরন	: গুলিবিদ্ধ অতঃপর পুড়িয়ে মারা
গুলিবিদ্ধের স্থান	: আশুলিয়া থানার সামনে
ঘাতক	: পুলিশ
সমাধিস্থল	: মহাদেবপুর কবরস্থান, নওগাঁ
পেশা	: গার্মেন্টস কর্মী
পিতা	: মৃত ছাকোয়াত হোসেন
মাতা	: বেনু আরা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: কৈগ্রাম (ফার্শিপাড়া), ইউনিয়ন: উমার, থানা: ধামুইরহাট, জেলা: নওগাঁ
বাড়িঘর ও সম্পদ	: গ্রামের বাড়িতে মাত্র ২টি মাটির ঘর ও ১৭ শতক জমি
স্ত্রী-সন্তান	: স্ত্রী রিনা আক্তার, বয়স: ২০, গার্মেন্টস কর্মী, সন্তান রাফি আব্দুল্লাহ, বয়স: ৭ মাস
ভাইবোন	: ১ ভাই, ১ বোন, ভাই কারিমুল ইসলাম (২৪) দিনমজুর, বোন উম্মে সালমা (১৭) ১০ম শ্রেণির ছাত্রী

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. শহীদের স্ত্রী রিনা আক্তারের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা

২. শিশুসন্তানের লালন পালনের জন্য নিয়মিত মাসিক সাহায্য করা

শহীদ মো: রায়হান আলী

ক্রমিক : ২৬৫

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৭

শহীদ পরিচিতি

পাখি ডাকা প্রভাত রাঙা ছায়া সুনিবিড় স্নিগ্ধ একটি গ্রাম পানিশাইল। এই গ্রামটি নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলায় অবস্থিত। এই গ্রামে স্ত্রী মোছা: রাণী বেগমকে নিয়ে বাস করতেন মো: মামুন সরদার নামক একজন ভ্যানচালক। সুন্দর একটি দিনে এই দম্পত্তির ঘর আলো করে জন্ম হয় সুন্দর একটি ছেলে শিশুর। নাম রাখা হয় মো: রায়হান আলী। সেই দিনটি ছিল ২০০৬ সালের ১লা মার্চ।

মায়ের কোল আলোকিত করে আসা রায়হান আলী একটু একটু করে বড় হতে থাকে চোখের সামনে। একসময় স্কুলে যাওয়া শুরু হয় তার। এক ক্লাস দুই ক্লাস করে উঠে যান দশম শ্রেণিতে। তার স্কুলের নাম ছিল অনুশীলন প্রি ক্যাডেট একাডেমী।

ইতোমধ্যে রায়হান আলীর একটা বোনেরও জন্ম হয়। বাবা-মা আর ভাইয়ের আদরে সেও বড় হতে থাকে। কিন্তু বিপত্তি বাঁধে ভ্যানচালক বাপের আর্থিক দৈন্যদশায়। পরিবারের খরচ মিটিয়ে দুভাইবোনের পড়াশোনা করানোর মতো সাধ্য তার আর হচ্ছে না। বাধ্য হয়ে রায়হান আলীর পড়াশোনা দশম শ্রেণিতেই ক্ষান্ত দিতে হয়। পরিবারের স্বচ্ছলতা আনতে এবং ছোট বোনটাকে পড়াশোনা করাতে কর্মের খোঁজে তাকে আসতে হয় গাজীপুর শহরে।

এক বুক স্বপ্ন নিয়ে রায়হান আলী এসেছিলেন এই শহরে কিন্তু স্বৈরাচার খুনি হাসিনা তার ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরে থাকার জন্য রায়হান আলীর মতো হাজারো নিরীহ প্রাণকে চিরজীবনের জন্য স্তব্ধ করে দিয়েছে। ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দিয়েছে হাজারো পরিবারের আশা ভরসা।

পাখি হয়ে যেভাবে উড়ে গেলেন রায়হান আলী

১৬ই জুলাই, ২০২৪ পুলিশের গুলিতে রংপুরের আবু সাঈদ নিহত হলে সারা দেশ তোলপাড় হয়ে যায়। সেই সাথে আন্দোলন পায় ভিন্নমাত্রা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন প্রবাহিত হয় ভিন্ন খাতে। ক্রমান্বয়ে তা এগিয়ে যায় ছাত্রজনতার স্বৈরাচার পতনের এক দফা গণ দাবিতে। ওই দিনের পর থেকে প্রতিদিনই সারাদেশে অনেক

ছাত্র জনতাকে খুনি হাসিনার নির্দেশে পাখির মতো গুলি করে মারছিল পুলিশ লীগ এবং ছাত্রলীগের ক্যাডাররা। তেমনই একটি দিন ১৮ জুলাই ২০২৪।

রায়হান আলী যে বাড়িতে ভাড়া থাকতেন, সেই বাড়িওয়ালাকে বলে তিনি গাজীপুর বোর্ড বাজারের দিকে যান। সে সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একটি মিছিল গাজীপুর বোর্ড বাজারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। রায়হান আলীও অংশগ্রহণ করেন সেই মিছিলে। ছাত্র জনতার সেই মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর নির্বিচারে পুলিশ রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড এবং গুলি বর্ষণ শুরু করে। গুলিবিদ্ধ হন রায়হান আলী। তার মাথার পিছনে আঘাত করে একটি বুলেট। তৎক্ষণাৎ শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে।

দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে রায়হান আলীর নাম্বার থেকে তার বাবার মোবাইলে ফোনকল যায় একটি। অপরিচিত একজন ব্যক্তি তার বাবাকে জানান, তার ছেলের রায়হান আলী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এ কথা শুনে আকাশ ভেঙ্গে পড়ে বাবা মামুন সরদারের মাথায়। বাবা অনুরোধ জানান রায়হান আলীর চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যত টাকার প্রয়োজন হোক না কেন, তিনি ম্যানেজ করবেন। এর ঠিক ১০ মিনিট পরে আরেকটি ফোনকলে তার বাবাকে জানানো হয়, রায়হান আলী আর বেঁচে নেই!

ছেলের মৃত্যুর খবর শোনার সাথে সাথে যেন হার্ট অ্যাটাকের মতো অবস্থা হয় বাবা মামুন সরদারের। যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকা বাবা নিরুপায় হয়ে ফোন করেন তার চাচাতো ভাই রেজাউল ও খালাতো ভাই নাজুকে।

রায়হান আলীর মৃত্যুর খবর শুনে তার বাড়িওয়ালার ছেলে ছুটে যান হাসপাতালে। মরদেহ বুঝে পেলেও গাজীপুর থেকে নওগাঁ নেওয়ার জন্য কোনো অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছিল না। কোনোভাবে একটি অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেলেও ড্রাইভার দেখায় চরম অমানবিকতা। ৫০,০০০ টাকার কমে সে যেতে রাজি হয় না। অবশেষে স্থানীয়দের সমঝোতায় ২৫,০০০ টাকা ভাড়া নির্ধারণ করা হয়।

১৮ তারিখ রাত ৩টায় শহীদ রায়হান আলীর মরদেহ তার গ্রামের বাড়িতে এসে পৌঁছায়। পরদিন ১৯ তারিখ সকাল ১১টায় জানাযা সম্পন্ন করার মাধ্যমে নিয়ামতপুর উপজেলার পানিশাইল গ্রামে শহীদ রায়হান আলীকে চির নিদ্রায় শায়িত করা হয়।

এক হৃদয়বিদারক অবস্থা

শহীদ রায়হান আলীর মৃত্যুতে তার এলাকায় তৈরি হয় এক হৃদয়বিদারক অবস্থা। পাড়াপড়শী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবার মাঝে হাহাকার পড়ে যায়। শোকে-কষ্টে কেঁদে কেঁদে ব্যাকুল হয়ে যায় স্বজনেরা।

সন্তান হারানোর তীব্র যন্ত্রণা এবং অসহ্য বেদনা মেনে নিতে পারেন না দুঃখ-শোকে পাথর হয়ে যাওয়া বাবা-মা। মা রাণী বেগম বারবার ছুটে যান কবরস্থানে, যেখানে শুয়ে আছে তার নাড়িছেঁড়া ধন রায়হান আলী। কবরস্থানের ভেতরে প্রবেশ করতে না পারলেও দূরে দাঁড়িয়ে থেকে বুক ভাসান অশ্রুজলে। সন্তানের রেখে যাওয়া বিভিন্ন স্মৃতির মধ্যে ডুবে থাকেন সারাদিন। তিনি জানান, তার উপার্জনের শেষ টাকা দিয়ে রায়হান আলীর ভবিষ্যৎ স্ত্রীর জন্য

একটি শাড়ি কিনে রেখেছিলেন। অভাবের সংসারে একটু একটু করে টাকা জমান। বিয়ের পর তা দিয়ে যেন ছেলেকে আসবাবপত্র কিনে দেওয়া যায়।

বাবা মো: মামুন সরদার দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণায় যেন স্তব্ধ হয়ে গেছেন। এক রুম থেকে অন্য রুমে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ান ছেলেকে। ঘরের বারান্দায় বসে থেকে কাটে মামুন সরদারের প্রত্যেকটি নির্ঘুম রাত। ছেলের মুখে বাবা ডাক শুনতে না পারার তীব্র যন্ত্রণায় কাটে তার প্রতিটি ক্ষণ। প্রতিটি সময়।

ছোট বোন মোছা: তাসলিমা ভাইকে হারিয়ে হয়ে গেছেন বাকরুদ্ধ। তার ছোট্ট মনে যেন জমে আছে কতশত অভিমান। তাকে দেয়া প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ না করেই চলে যাওয়ার অভিমান!

পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়াপড়শি কেউ আর ফিরে পাবে না মোহাম্মদ রায়হান আলীকে। তবুও তিনি সারা জীবন রয়ে যাবেন আমাদের মাঝে।

শহীদ রায়হান আলী সম্পর্কে আরো কিছু কথা

একসময় বাবা-মায়ের কর্মের সুবাদে রায়হান আলী রা সপরিবারে থাকতেন গাজীপুর বোর্ড বাজারের একটি ভাড়া বাসায়। বাবা মামুন সরদার কাজ করতেন ইউনিক ডিজাইনে। আর মা রানী বেগম ছিলেন অনন্ত নামক এক গার্মেন্টসের কর্মী।

কিন্তু শহরের এই কষ্টের জীবন তারা বয়ে বেড়াতে পারছিলেন না। তাইতো বছর তিনেক পূর্বে তারা সবাই নওগাঁয় তাদের গ্রামের বাড়িতে চলে যান। গ্রামে গিয়ে বাবা মামুন সরদার কিছুদিন দিনমজুরের কাজ করলেও সেই স্বল্প আয়ে দুই সন্তানের পড়াশোনার খরচ বহন করে সংসার চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। পরবর্তীতে ছেলে রায়হান আলীর পরামর্শে সাপ্তাহিক ১৩০০ টাকা কিস্তি পরিষদের শর্তে ৬৫,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে একটি মোটরভ্যান ক্রয় করেন। পূর্বের তুলনায় আয় রোজগার কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও দরিদ্র্যতা যেন পিছু ছাড়ছল না রায়হান আলীদের পরিবারের।

দশম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় নিজে থেকেই উপার্জনের দায়িত্ব কিছুটা কাঁধে তুলে নেন রায়হান আলী। ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে গাজীপুর বোর্ড বাজারের পূর্বের সেই ঠিকানায় চলে আসেন তিনি। প্রথমদিকে বাসের হেলপারি করে, কখনোবা ভ্যান চালিয়ে আয় রোজগার করার চেষ্টা করেন তিনি। পরবর্তীতে ছাত্র স্টুডিও নামক একটি দোকানে মাসিক ৫০০০ টাকা বেতনে চাকরি পান। পাশাপাশি কম্পিউটারের কাজও শিখতে থাকেন তিনি। এভাবে

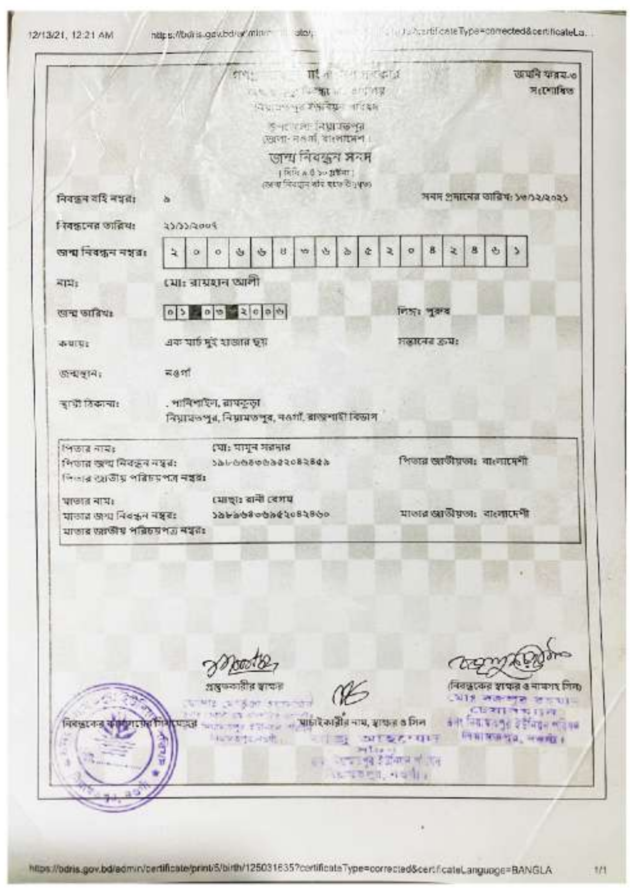

12/13/21, 12:21 AM

সংশোধিত

উপজেলা- নিয়ামতপুর
জেলা- নওগাঁ, বাংলাদেশ।

জন্ম নিবন্ধন সনদ
[বিধি ৯ ও ১০ দ্রষ্টব্য]
(জন্ম নিবন্ধন বহি হতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নম্বর: ৯

সনদ প্রদানের তারিখ: ১৩/১২/২০২১

নিবন্ধনের তারিখ: ২১/১১/২০০৭

জন্ম নিবন্ধন নম্বর: ২০০৬৬৪৩৬৯৫২০৪২৪৩১

নাম: মো: রায়হান আলী

জন্ম তারিখ: ০১ ০৩ ২০০৬

লিঙ্গ: পুরুষ

কথায়: এক মার্চ দুই হাজার ছয়

সন্তানের ক্রম:

জন্মস্থান: নওগাঁ

স্থায়ী ঠিকানা: . পানিশাইল, রামনুড়া
নিয়ামতপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ, রাজশাহী বিভাগ

পিতার নাম:	মো: মামুন সরদার	
পিতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর:	১৯৮৬৬৪৩৬৯৫২০৪২৪৫৯	পিতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী
পিতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:		
মাতার নাম:	মোছা: রানী বেগম	
মাতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর:	১৯৮৯৬৪৩৬৯৫২০৪২৪৬০	মাতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী
মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:		

প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর

নিবন্ধকের কার্যালয়ের সিলমোহর

যাচাইকারীর নাম, স্বাক্ষর ও সিল

(নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সিল)

https://bdris.gov.bd/admin/certificate/print/5/birth/125031635?certificateType=corrected&certificateLanguage=BANGLA 1/1

চলতে চলতেই এগিয়ে আসে সেই কালো দিন ১৮ জুলাই ২০২৪, যেদিনে স্বৈরাচারী গণখুনি হাসিনা নিভিয়ে দেয় তার জীবনের সকল আলো। পাঠিয়ে দেয় এই পৃথিবী থেকে পরপারে।

বর্তমানে শহীদ পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হচ্ছেন তার বাবা মামুন সরদার। ভ্যান চালিয়ে উপার্জিত অর্থই হচ্ছে পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস। স্ত্রী ও কন্যা সন্তানকে নিয়ে অত্যন্ত টানাপোড়েনের সংসার তার। এই অসচ্ছল পরিবারটি একটি খাস জমিতে ২টি মাটির ঘরে বসবাস করছেন।

শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

পূর্ণনাম	: মো: রায়হান আলী
জন্ম তারিখ	: ০১.০৩.২০০৬
শহীদ হওয়ার তাং ও সময়	: ১৮ জুলাই, ২০২৪; বিকাল ০৩:৩০টা
শহীদ হওয়ার স্থান	: গাজীপুর বোর্ড বাজার
আঘাতের ধরন	: মাথার পিছনে গুলিবিদ্ধ
ঘাতক	: পুলিশ
সমাধিস্থল	: গ্রামের বাড়ি পানিশাইল, নওগাঁ
পেশা	: স্টুডিও দোকানের কাজ
পিতা	: মো: মামুন সরদার
মাতা	: মোছা: রানী বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: পানিশাইল, ইউনিয়ন+থানা: নিয়ামতপুর, জেলা: নওগাঁ
বাড়িঘর ও সম্পদ	: গ্রামের বাড়িতে খাস জমির উপর মাত্র ২টি মাটির ঘর
	: ভ্যানচালক পিতার মাসিক ৫০০০ টাকা আয়
বোন	: মোসা: তাসলিমা, বয়স: ১০ বছর, শ্রেণি: ৪র্থ পানিশাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. শহীদের পিতা মামুন সরকারের জন্য একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা

২. শহীদের পরিবারের বসবাসের জন্য একটি ঘর নির্মাণ করে দেওয়া

শহীদ মোঃ তারিক বাবাকে বলতো

'অনেক ভালো ভালো ছাত্র মারা যাচ্ছে, তুমিও আন্দোলনে যোগ দাও'

শহীদ মোঃ তারিক হোসেন

ক্রমিক : ২৬৬

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৮

শহীদ পরিচিতি

শহীদ তারিক হোসেন ২০০৬ সালের ১লা জুন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর থানার চৌডালা ইউনিয়নের দক্ষিণ ইসলামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতা মো. আশাদুল ইসলাম ও মাতা ফিদুশি খাতুনের দ্বিতীয় সন্তান। তার বড় ভাই আসমাউল (২২) রিকশাচালক। ছোট বোন আছরিফা খাতুন (১৪) শিক্ষার্থী।

পেশায় তারিক হোসেন ছিলেন কাঠমিস্ত্রি। মাত্র ১১ বছর বয়সে ১৫০০ টাকা বেতনে কাঠমিস্ত্রির কাজে নিযুক্ত হয়ে সততা, দক্ষতা এবং যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে মাত্র ৭ বছরের ব্যবধানে তার পারিশ্রমিক ২৪ হাজার টাকায় উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শহীদ তারিক হোসেন কাঠমিস্ত্রির কাজ করতেন অন্যের ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে। তিনি বিগত ৭ বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। থাকতেন ঢাকার শেরেবাংলা নগর এলাকায় উজ্জলের বস্তিতে।

তারিক হোসেনের পিতা আশাদুল ইসলাম পেশায় রিক্সাচালক। তার মা ফিদুশি খাতুন গৃহিণী। বর্তমানে তার পিতা ও বড়ভাইয়ের রিকশা চালানো আয়ের ওপর তার পরিবারের ব্যয় নির্বাহ হচ্ছে।

শহীদ তারিক যেভাবে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেন

তারিক হোসেন নিয়মিত বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশ নিতেন। তার বাবা জানান, তারিক তাকে বলতো, 'অনেক ভালো ভালো ছাত্র মারা যাচ্ছে, তুমিও আন্দোলনে যোগ দাও।' ছেলের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে তার বাবা দুই/একদিন আন্দোলনে অংশ নেন।

৫ই আগস্ট তারিক বিজয় মিছিলে অংশ নেয় এবং বিকাল তিনটা পর্যন্ত গণভবনের সামনে অবস্থান করে। পরে বন্ধুদের সঙ্গে বাসায় ফিরে আসে। কিন্তু সন্ধ্যার পর আবার বাসার সামনে শেরেবাংলা নগর থানার পাশে বন্ধুদের সঙ্গে একত্রিত হয়। সেখানে কিছু পুলিশ থানার ভেতরে আটকা পড়েছিল। বাইরে ৩০ থেকে ৪০ জন শিক্ষার্থী নানারকম স্লোগান দিচ্ছিল। পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠলে পুলিশ শিক্ষার্থীদের কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং থানা থেকে তাদের বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ চায়। মানবিকতাবশত ছাত্ররা তাদের দাবি মেনে নেয়।

পুলিশ থানার বাইরে বের হয়, কিন্তু একটু সামনে চৌরাস্তা মোড়ে পৌঁছানোর পর শিক্ষার্থীরা স্লোগান দেয়া শুরু করলে তারা হঠাৎ পেছনে ঘুরে এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়তে শুরু করে। ঘটনাস্থলেই গুলিবিদ্ধ হন ৫ জন।

তারিকের নাভির নিচে চারটি গুলি এবং হাতের কব্জিতে একটি গুলি লাগে। দ্রুত তাকে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে টানা ৪ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর ৯ই আগস্ট শুক্রবার বিকেল ৪টায় তারিক হাসান শাহাদাত বরণ করেন।

পরিবারের কাছে তারিক ছিলেন একজন আদর্শ সন্তান ;সমাজের কাছে ছিলেন একজন সাহসী তরুণ, যিনি ন্যায় বিচারের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন।

বন্ধুর মুখে শহীদ হওয়ার নির্মম বর্ণনা

তারিকের শহীদ হওয়া সম্পর্কে তার বন্ধু লিমন বলেন, "আমি এবং তারিক ঘটনাস্থলে একসাথে ছিলাম। যখন পুলিশ চলে যাচ্ছিল, তখন আমরা পিছন থেকে স্লোগান দিচ্ছিলাম। হঠাৎ করেই পুলিশ পিছনে ফিরে গুলি করতে শুরু করে। সাথে সাথে তারিক রাস্তায় বসে পড়ে এবং বলে, 'আমার গুলি লেগেছে।' আমি প্রথমে বিশ্বাস করছিলাম না। মনে হচ্ছিল সে হয়তো মজা করছে। কিন্তু পরক্ষণে তার হাত এবং পেটে রক্ত দেখে আমি হতবাক হয়ে যাই। আমার মাথা ঘুরে ওঠে। মুহূর্তকাল পর লোকজনের সাহায্যে আমরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই।

সেই মুহূর্তটি আমার জীবন থেকে কখনো মুছে যাবে না। বিভীষিকাময় সেই কালো সন্ধ্যা আমি কখনোই ভুলবো না। আমার প্রিয় বন্ধুর শাহাদাতের এই নির্মম ঘটনা আমার মনে জেগে থাকবে অনন্তকাল।"

শহীদ তারিক সম্পর্কে আরো কিছু কথা

শহীদ তারিকের পরিবার একটি দরিদ্র্য পরিবার। পরিবারের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে খুব অল্প বয়সেই পড়াশোনার ইতি টানতে হয় তাকে। মাত্র ১১ বছর বয়সে ১৫০০ টাকা বেতনে কাঠমিস্ত্রীর কাজে নিযুক্ত হন তিনি। তারিক অল্প সময়ের মধ্যে তার দক্ষতা, যোগ্যতা এবং বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে শুরু করেন। মালিকও তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ধীরে ধীরে তার বেতন বাড়াতে থাকেন। শেষ মাসে ১৮ বছরের তরুণ তারিকের বেতন হয়েছিল ২৪,০০০ টাকা।

তার মা কখনো কোনো কাজে যুক্ত হতে চাইলে তিনি অনুমতি দিতেন না। প্রতিবেশীদের যেকোনো বিপদ আপদে তিনি সদা এগিয়ে আসতেন। তার মা ফিদুশি খাতুন বলেন, "করোনার সময় একজন ডায়রিয়া আক্রান্ত ব্যক্তি পড়ে ছিলেন। ভয়ে কেউ কাছে না গেলেও তারিক তার পাশে থেকে সেবা দিয়ে সুস্থ করে তুলেছিলেন।"

তারিখের বাবা বলেন, "আমার ছোট ছেলে আমাকে যতটুকু ডাকতো এবং খোঁজখবর নিত, বড় ছেলে তা করত না। পুরো পরিবারকে নিয়ে সে ভাবতো।"

তারিকের মৃত্যুর খবর তার পুরো পরিবারকে ভেঙে দেয়। তার মা-বাবা কাঁদতে কাঁদতে বলেন, "আমাদের ছেলে আন্দোলনে অংশ নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। সে আমাদের জন্য গর্বের কারণ ছিল।"

শহীদ তারিক হাসানের জীবন ও সংগ্রাম মনে করিয়ে দেয় সেই সময়ের বাস্তবতা, যেখানে স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে সাহসী ছাত্ররা প্রতিবাদ করেছিল। তার সাহসিকতা এবং অসাধারণ মানবিক গুণাবলি আজও আমাদের প্রেরণা দেয়। আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, মানবতার জন্য সংগ্রাম কখনো বৃথা যায় না।

ঋণে জর্জরিত শহীদ পরিবার

শহীদ তারিক হোসেনের পরিবার বর্তমানে কঠিন এক বাস্তবতার মুখোমুখি। তার বাবা-মা, বড় ভাই এবং ছোট বোন সবাই মিলে ঢাকায় একটি বস্তিতে ছোট্ট টিনের ঘর ভাড়া নিয়ে থাকেন। জীবনের সংগ্রাম যেন তাদের প্রতিদিনের সঙ্গী। আট বছর আগে তার পিতা ৩ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে একটি ট্রলার কিনেছিলেন। আশায় ছিলেন জীবনের সচ্ছলতা ফিরবে। কিন্তু মাত্র ১১ দিন চলার পর সেই ট্রলার ডুবে যায়। এরপর তিনি কাপড়ের ব্যবসায় হাত দেন, কিন্তু সেখানেও ক্ষতির সম্মুখীন হন।

তারিক হাসানের চিকিৎসা চালাতে আরো ২ লক্ষ টাকা ঋণ করতে বাধ্য হন তিনি। সব মিলিয়ে এখন তার ঋণের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে গেছে।

পরিবারটির দিন গুজরানের জন্য বড় ছেলেসহ পিতা বর্তমানে রিকশা চালাচ্ছেন। কিন্তু শহীদ তারিকের মৃত্যুর পর তাদের জীবনে নতুন দুঃখের অধ্যায় যোগ হয়েছে। পরিবারটি এখন ঢাকার কষ্টের জীবন ছেড়ে গ্রামে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেখানে শহীদের দাদির শোয়া দুই কাঠা জমি তাদের শেষ আশ্রয়স্থল।

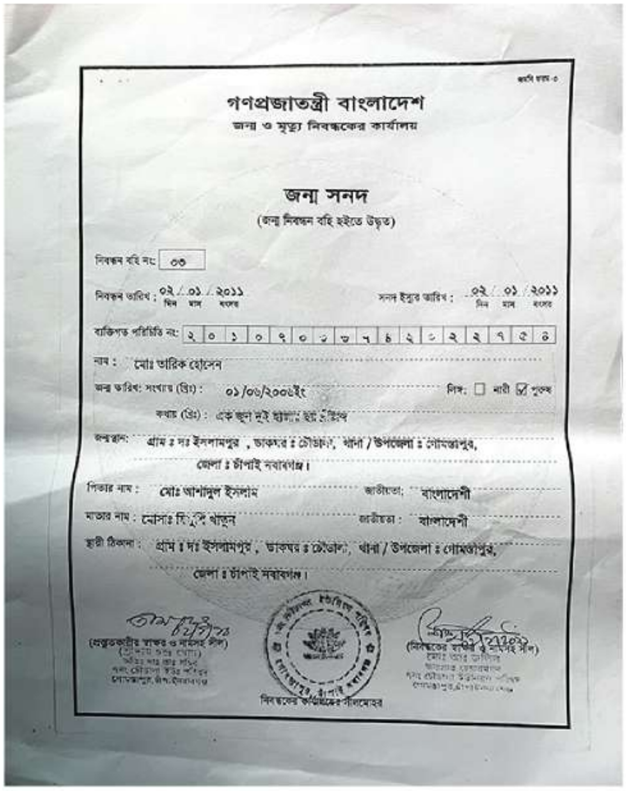

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়

জন্ম সনদ
(জন্ম নিবন্ধন বহি হইতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নং: ০৩

নিবন্ধন তারিখ : ০২ / ০১ / ২০১১ (দিন মাস বৎসর)

সনদ ইস্যুর তারিখ : ০২ / ০১ / ২০১১ (দিন মাস বৎসর)

ব্যক্তিগত পরিচিতি নং: ২ ০ ১ ০ ৭ ০ [illegible] ৩ ৭ ৮ ২ [illegible] ২ ২ ৭ ৫ ৩

নাম : মোঃ তারিক হোসেন

জন্ম তারিখ: সংখ্যায় (খ্রিঃ) : ০১/০৬/২০০৬ইং লিঙ্গ: ☐ নারী ☑ পুরুষ

কথায় (খ্রিঃ) : এক জুন দুই হাজার ছয় ইং

জন্মস্থান: গ্রাম : দঃ ইসলামপুর , ডাকঘর : চৌডাল, থানা / উপজেলা : গোমস্তাপুর,
জেলা : চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

পিতার নাম : মোঃ আশাদুল ইসলাম জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম : মোসাঃ [illegible] খাতুন জাতীয়তা : বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : দঃ ইসলামপুর , ডাকঘর : চৌডাল, থানা / উপজেলা : গোমস্তাপুর,
জেলা : চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

(প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)

নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর

(নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)

শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: তারিক হোসেন
জন্ম তারিখ	: ০১.০৬.২০০৬
শহীদ হওয়ার তাং ও সময়	: ৯ই আগস্ট, ২০২৪; বিকাল ৪টা
শহীদ হওয়ার স্থান	: সোহরাওয়ারদী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা
আঘাতের ধরন	: মাথার পিছনে গুলিবিদ্ধ
গুলিবিদ্ধের স্থান	: শেরেবাংলা নগর থানার সামনে
গুলিবিদ্ধ হওয়ার তাং ও সময়	: ৫ই আগস্ট, ২০২৪; সন্ধ্যা ৭টা
ঘাতক	: পুলিশ
সমাধিস্থল	: দক্ষিণ ইসলামপুর গোরস্থান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
পেশা	: কাঠমিস্ত্রী
পিতা	: মো: আশাদুল ইসলাম
মাতা	: মোছা: ফিদুশি খাতুন
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: দক্ষিণ ইসলামপুর, ইউনিয়ন: চৌডালা, থানা: গোমস্তাপুর, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ
বাড়িঘর ও সম্পদ	: গ্রামে দাদির দুই কাঠা জমি। বাপ ও ভাইয়ের রিকশাচালনার আয়
ভাইবোন	: ১ ভাই ও ১ বোন। বড় ভাই আসমাউল (২২) রিক্সাচালক। ছোটবোন আছরিফা খাতুন (১৪) শিক্ষার্থী

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. শহীদের পিতা এবং ভাই রিকশাচালক, তাদেরকে একটি রিকশা প্রদান করা যেতে পারে

২. গ্রামের বাড়িতে একটি ঘর তৈরি করে দেওয়া যেতে পারে

৩. পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেওয়া যেতে পারে

“সন্তান হারিয়ে বৃদ্ধা মা ডলি শোকে পাথর হয়ে গেছেন, মিনারুল মিনারুল বলে কেবলই মাতম করে চলেছেন তিনি”

শহীদ মো: মিনারুল ইসলাম

ক্রমিক : ২৬৭

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ০৯

শহীদ পরিচিতি

মো: মিনারুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি। তার পিতা মৃত এনামুল হক। জন্মের দুই বছরের মাথায় তিনি পিতাকে হারান। মাতা মোছা: ডলি। বর্তমানে তার মাতা ৬২ বছর বয়সী বয়স্ক নারী।

শহীদ মিনারুলের জন্মস্থান রাজশাহী জেলার রাজপাড়া (বর্তমানে কাশিয়াডাঙ্গা) থানার গোলজারবাগ গ্রামে। বাবামায়ের ৪ সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ তিনি। তার বড় ২ ভাই এবং ১ বোন রয়েছে। তারা সবাই বিবাহিত এবং সবার আলাদা সংসার। তার ভাইয়েরা রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন।

শহীদ মিনারুল ইসলাম পেশায় চাকরিজীবী ছিলেন। তার কর্মরত প্রতিষ্ঠান নারায়ণগঞ্জের হ্যামিল্টন মেটাল কর্পোরেশন লিমিটেড, যা বেঙ্গল গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান। এখানে সিনিয়র অপারেটর হিসেবে ২০১৮ সাল থেকে তিনি কর্মরত ছিলেন। নারায়ণগঞ্জে চাকরির কারণে মিনারুল ইসলাম সিদ্ধিরগঞ্জের একটি মেসে থাকতেন।

মিনারুল ইসলাম ছিলেন বিবাহিত। তার স্ত্রী নুরেসান খাতুন তার মায়ের সাথে গ্রামের বাড়িতে থাকতেন। মা আর স্ত্রীকে নিয়ে ছিল তার সংসার। তার স্ত্রী ছিলেন ৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা।। বিয়ের ৭ বছর পর আল্লাহ তার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান দিয়েছেন দেখে তাদের খুশির অন্ত ছিল না। কিন্তু এক খুনি স্বৈরাচারের রোষানলে পড়ে মিনারুলের তার অনাগত সন্তানকে দেখে যাওয়ার সৌভাগ্য হলো না।

যেভাবে শহীদ হন মিনারুল

জুলাই ২০২৪। দেশব্যাপী শুরু হয় কোটা সংস্কারের দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। ১৬ই জুলাই রংপুরে আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার পর থেকে উত্তাল হয়ে ওঠে সারাদেশ। আন্দোলন সংগ্রাম বাড়তেই থাকে প্রতিদিন। সেই সাথে প্রতিদিনই আইনশৃঙ্খলা ও আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতে শহীদ ও পঙ্গুত্ব বরণ করতে থাকে দেশের মুক্তিকামী ছাত্র জনতা।

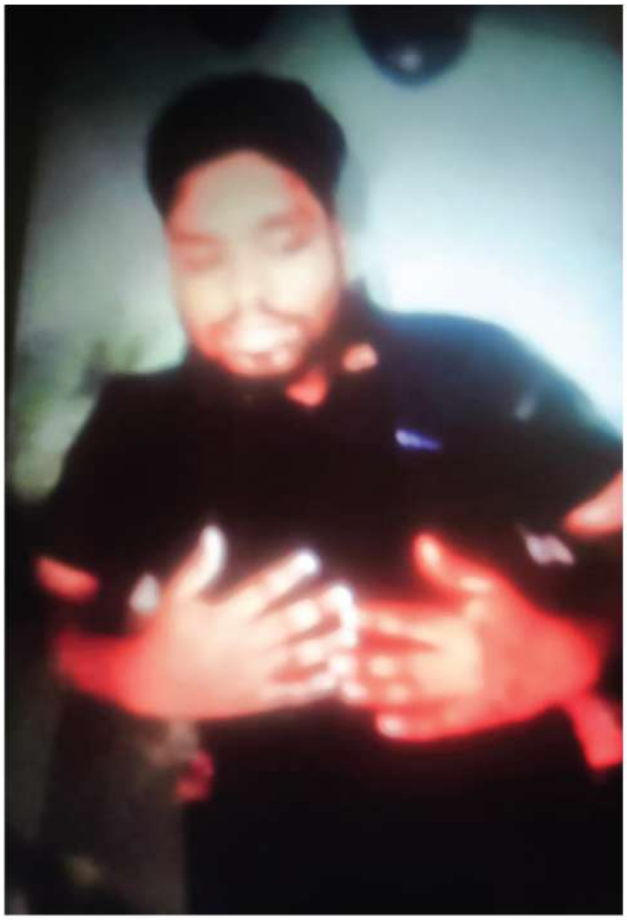

২০ শে জুলাই ২০২৪। মেসে থাকলে মেসের সদস্যদের পালা করে বাজার করতে হয় প্রতিদিন। সেদিন ছিল মিনারুলের বাজার করার দিন। মেসের গলি থেকে বের হয়ে প্রধান সড়কে মাত্রই পা রেখেছেন মিনারুল। সামনে ছিল বিজিবি বাহিনীর সদস্যরা। মিনারুলকে দেখা মাত্রই তার দিকে তারা গুলি ছোড়ে। সাথে সাথে পেটে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন তিনি।

স্থানীয় জনগণ মিনারুলকে ধরে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের তীব্র বাধার সম্মুখীন হয় তারা। সকল বাধা টপকে অবশেষে একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় মিনারুল ইসলামকে। সেখানে চিকিৎসা সেবা না পেয়ে খানপুর নারায়ণগঞ্জ ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে নেওয়ার সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে পথেই মারা যান তিনি। হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

পরের দিন ২১ তারিখ সকাল ৭ঃ৩০ মিনিটে মিনারুল ইসলামের শ্যালক সাব্বির রহমান মরদহ নিয়ে রাজশাহী পৌঁছান। বাদ জোহর জানাযা সম্পন্ন করে রাজশাহীর কাশিয়াডাঙ্গার হড়গ্রাম গোরস্থানে তাকে কবরস্থ করা হয়।

অনাগত সন্তানের মুখ দেখে যেতে পারেননি মিনারুল ইসলাম। এর আগেই স্বৈরাচারের বুলেট কেড়ে নিল তার প্রাণ। সন্তান হারা হলেন বৃদ্ধ মা মোছা. ডলি। বিধবা হলেন নুরেসান খাতুন। আর এতিম হয়ে গেল অনাগত সন্তান।

সন্তান হারিয়ে বৃদ্ধা মা ডলি শোকে পাথর হয়ে গেছেন। মিনারুল মিনারুল বলে কেবলই মাতম করে চলেছেন তিনি। কোনো

সান্ত্বনায় যেন শান্ত হচ্ছে না বৃদ্ধ মায়ের মন। অন্যদিকে স্বামীকে হারিয়ে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী নির্বাক, বাকরুদ্ধ। তিনি যেন বুঝতেই পারছেন না তার স্বামী নেই। কোথা থেকে কী হয়ে গেল তা ভাবতেই পারছেন না তিনি।

মিনারুলের সংগ্রামী জীবন

মিনারুলের যখন দুই বছর বয়স, তখন তার পিতা ইনামুল হক মারা যান। অল্প বয়সে পিতা হারানো মিনারুল ইসলাম সংসারের দরিদ্র্যতা, পরিবারের দুঃখকষ্টগুলো খুব কাছ থেকে দেখেই বড় হয়েছেন। প্রতিনিয়ত দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়েছেন পিতৃহারা এতিম এনামুল। সেইসব কষ্টের দিনগুলো কেবল তার মনের ভেতর গাঁথা ছিল।

সীমাহীন দরিদ্র্যতার কারণে পড়ালেখাটাও বেশিদূর এগোয়নি তার। ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছিলেন ইউসেফ স্কুলে। এরপর শুরু হয় তার সংগ্রামী কর্মজীবন।

২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মোছা: নুরেসান খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন মিনারুল ইসলাম। ২০১৮ সালে হ্যামিলটন মেটাল কর্পোরেশন লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেন। চাকরির সুবাদে থাকতেন নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের একটি মেসে।

প্রথমদিকে স্ত্রীকে সাথে নিয়ে থাকলেও স্ত্রী সন্তান সম্ভাবা হলে গ্রামে তার মায়ের কাছে রেখে যান স্ত্রীকে। তারপর তিনি ওঠেন মেসে। তাদের দাম্পত্য জীবনের ৭ বছরের মাথায় সন্তান সম্ভাবা হন স্ত্রী নুরেসান খাতুন। বিবাহের এতগুলো বছর পরে বাবা হতে যাচ্ছেন মিনারুল ইসলাম-এ কারণে আনন্দের যেন অন্ত ছিল না তার। কতশত পরিকল্পনা ছিল অনাগত সন্তানকে নিয়ে। সেই শত স্বপ্ন আর বহু দিনের অপেক্ষা যেন আক্ষেপ হয়েই রইল। শহীদ মো: মিনারুল ইসলাম ছিলেন পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস ব্যক্তি। তার বেতন ছিল মাসিক ১৮০০০ টাকা। এই অর্থেয় চলতো তার সংসার। রাজশাহীতে ছোট একটি দুই তলা বিশিষ্ট বাড়িতে তারা ৩ ভাই একসাথে থাকতেন। একসাথে থাকলেও তার ২ ভাইয়ের পরিবার ছিল আলাদা। মা এবং স্ত্রীকে নিয়ে মিনারুলের পরিবার ছিল আলাদা।

বর্তমানে তার সন্তান সম্ভবা স্ত্রী নূরেসান খাতুন তার বাবার বাসায় থাকছেন। স্ত্রীর বাবা-মা ও ৯ বছর বয়সি বোনসহ ৪ সদস্যবিশিষ্ট পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস তার স্ত্রীর বাবা। তিনি ভাড়ায় অটো রিক্সা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

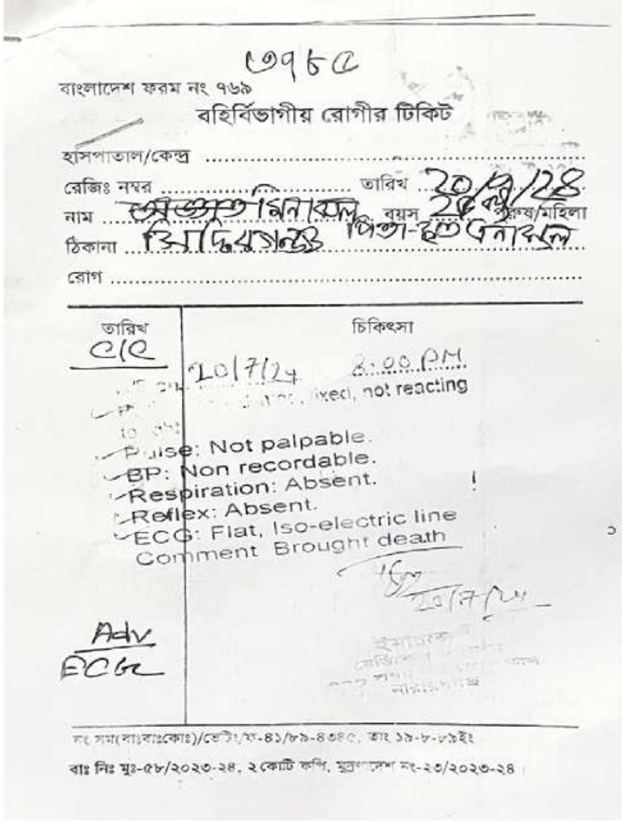

বাংলাদেশ ফরম নং ৭৬৯

বহির্বিভাগীয় রোগীর টিকিট

হাসপাতাল/কেন্দ্র ....

রেজিঃ নম্বর .... তারিখ 20/7/24

নাম .... মিনারুল বয়স 28 পুরুষ/মহিলা

ঠিকানা .... পিতা- মৃত এনামুল

রোগ ....

তারিখ	চিকিৎসা
C/C	20/7/24 8:00 PM fixed, not reacting Pulse: Not palpable. BP: Non recordable. Respiration: Absent. Reflex: Absent. ECG: Flat, Iso-electric line Comment Brought death
Adv ECG	

নং সম(বাঃবাঃকোঃ)/ভেটিং/ম-৪১/৮৯-৪৩৪৫, তাং ১৯-৮-৮৯ইং

বাঃ নিঃ মুঃ-৫৮/২০২৩-২৪, ২ কোটি কপি, মুদ্রণাদেশ নং-২৩/২০২৩-২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Government of the People's Republic of Bangladesh

জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card

নাম

মোঃ মিনারুল ইসলাম

Name

MD. MINARUL ISLAM

পিতা

মৃত এনামুল হক

মাতা

মোসাঃ ডলি

Date of Birth 01 Jan 1995

NID No. 240 983 4831

মিনারুল

শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: মিনারুল ইসলাম
জন্ম তারিখ	: ০১.০১.১৯৯৫
শহীদ হওয়ার তাং ও সময়	: ২০ শে জুলাই, ২০২৪; ৬টা ১৫ মিনিট।
শহীদ হওয়ার স্থান	: হাসপাতাল রোড, নারায়ণগঞ্জ
আঘাতের ধরন	: পেটে গুলিবিদ্ধ
গুলিবিদ্ধের স্থান	: সিদ্ধিরগঞ্জ
গুলিবিদ্ধ হওয়ার তাং ও সময়	: ২০ শে জুলাই, ২০২৪; বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট
ঘাতক	: বিজিবি
সমাধিস্থল	: হড়গ্রাম নতুন পাড়া গোরস্তান, কাশিয়াডাঙ্গা, রাজশাহী
পেশা	: চাকরিজীবী
পিতা	: মৃত এনামুল হক
মাতা	: মোছা: ডলি
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম-গোলজারবাগ, ইউনিয়ন-রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, থানা-রাজপাড়া (কাশিয়াডাঙ্গা), জেলা-রাজশাহী
বাড়িঘর ও সম্পদ	: নিজেদের দোতলা একটি বাড়ি।
স্ত্রী-সন্তান	: বিয়ের ৭ বছর পর ৮ মাসের সন্তান সম্ভাবা স্ত্রী নুরেসান খাতুন। বয়স ২৫। শিক্ষাগত যোগ্যতা-অষ্টম শ্রেণি পাস
ভাইবোন	: ২ ভাই, ১ বোন। তারা সবাই বিবাহিত এবং আলাদা সংসার আছে তাদের

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. শহীদ মিনারুলের অনাগত সন্তান এবং স্ত্রীর জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান

২. শহীদের মাকে আর্থিক সহায়তা প্রদান

মাকে উদ্দেশ্য করে সাকিব

'মা, কত মানুষ জীবন দিচ্ছে, আর আমি কি ঘরে বসে থাকতে পারি?'

শহীদ মো: সাকিব আনজুম

ক্রমিক : ২৬৮

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ১০

শহীদ পরিচিতি

সাজানো-গোছানো, ছিমছাম, শান্ত, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ছোট্ট শহর রাজশাহী। এই শহরের জেলা সদরের পাশেই বোয়ালিয়া থানা। আর এই থানার অন্তর্গত তালাইমারী গ্রাম। মায়াবতী পদ্মার কোলঘেঁষা স্নিগ্ধ গ্রাম তালাইমারী। এই গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক দম্পতি মো: মইনুল হক ও রোকেয়া খাতুন। এই দম্পতির ঘর আলোকিত করে, কোল জুড়ে আসে পরিবারের প্রথম সন্তান মো: সাকিব আনজুম। সেই দিনটি ছিল ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭।

সাকিবের জন্মের দিনটায় এই পরিবারটা সেজেছিল রঙিন সাজে। উপচে পড়েছিল খুশির ফোয়ারা। মিষ্টি বিতরণ হয়েছিল বাড়ি বাড়ি। ব্যবসায়ী পিতা আর গৃহিণী মাতার সব স্বপ্ন যেন পূরণ হয়েছিল সাকিবের আগমনে।

এরপর আদরে আহ্লাদে একটু একটু করে বেড়ে ওঠা সাকিবের। পাঠশালা থেকে হাতেখড়ি পড়াশোনার। তারপর স্কুল, কলেজ পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা। রাজশাহীর বিখ্যাত বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসসি বিভাগ থেকে স্নাতক শেষ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের বাহিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সাকিব।

বর্তমানে সাকিব ছিলেন চাকরিজীবী। ২০২০ সাল থেকে অর্গানিক কেয়ারে সেলস ডিপার্টমেন্টে কর্মরত ছিলেন। এছাড়াও তিনি তার বাবার মুদি দোকানের ব্যবসায় সাহায্য করতেন নিয়মিত।

সাকিব ছিলেন বিবাহিত। তার স্ত্রী নিশাত সালসাবিল রাজশাহী কলেজ থেকে স্নাতক শেষ করে স্নাতকোত্তরে অধ্যয়নরত। সাকিবের দুই ভাইয়ের একজন মো: আকিব আনজুম। তিনি বঙ্গবন্ধু কলেজে অনার্সে অধ্যয়নরত। কনিষ্ঠ ভাই মো: আসিফ আনজুম উত্তরায় একটি মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত।

যেভাবে শহীদ হন শাকিব আনজুম

শহীদ সাকিব বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এক লড়াকু সৈনিক। শুরু থেকেই ছিলেন এই আন্দোলনের সঙ্গে। ৫ আগস্ট ২০২৪, স্বৈরাচার পতনের দিন এবং ছাত্র জনতার গণআন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয়ের দিন। সেদিনও সকাল থেকে ছাত্র জনতার আন্দোলনে উত্তাল ছিল রাজশাহী নগরী। তার নিজ এলাকা রাজশাহী নগরীর তালাইমারী মোড় থেকে হাজার হাজার ছাত্র জনতার মিছিল শহরের প্রাণকেন্দ্র রায় সাহেব বাজার এলাকার দিকে রওনা হয়।

সময় দুপুর ১টা ১৫ মিনিট। ছাত্রজনতার এই মিছিলে আওয়ামীলীগ নেতা ডাবলু সরকারের নেতৃত্বে গুলি বর্ষণ শুরু হয়। শিক্ষার্থীরা প্রাণ বাঁচাতে দিগ্বিদিক ছড়িয়ে যায়। কিছু নারী শিক্ষার্থীর উপর আওয়ামী সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। এমতা অবস্থায় সাকিব আনজুম দৌড়ে গিয়ে একটা বাড়ির মধ্যে ওই নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য চেষ্টা করেন। অধিকাংশ নারী বাড়ির মধ্যে চলে গেলেও আওয়ামী সন্ত্রাসীরা দৌড়ে এসে সাকিব আঞ্জুমকে সামনে থেকে গলার নিচের অংশে এবং বুকের বাঁ-পাশের উপরের অংশে দুটো গুলি করে। তবুও সাকিব আনজুম ওই বাড়ির মধ্যে ঢুকে যেতে চেষ্টা করলে পেছন থেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা তার কাঁধে নির্মমভাবে কোপ মারে। গুলিবিদ্ধ এবং মারাত্মক জখম অবস্থায় সাকিব ওই বাড়িতে ঢুকে গেলেও প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে থাকে। আহত সাকিব আনজুমসহ অন্যান্য নারী শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি টের পেয়ে আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনী বাড়িটি অবরুদ্ধ করে রাখে।

এদিকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে সাকিব আনজুম ধীরে ধীরে নিস্তেজ হতে থাকেন এবং কিছু সময় পর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। অদূরেই ছিল রাজশাহী মেডিকেল কলেজ। কিন্তু আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনীর জন্য তাকে হাসপাতালে নেওয়া সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে সাকিবকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

পরদিন ৬ই আগস্ট বাদ জোহর এলাকায় প্রথম এবং বাদ আসর টিকাপাড়া গোরস্থানে দ্বিতীয় জানাজা শেষে সেখানেই কবরস্থ করা হয় শহীদ মো: আনজুম সাকিবকে।

পরিবারে শোকের মাতম

সাকিবের নিহত হওয়ার খবরে তার পরিবারে নেমে আসে এক গভীর কালো শোক-ছায়া। মা বাবার বুকের ধন আওয়ামী সন্ত্রাসী

বাহিনী দ্বারা নির্মমভাবে নিহত হওয়ার কথা শুনে মা রোকেয়া খাতুন বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। তার বুকের ভেতরটা হাহাকার করে

ওঠে। যেন কলিজাটা ছিঁড়ে বেরিয়ে যায় তার। তিনি বলেন, কয়েকদিন আগে মার্কেটে গ্যাসের সিলিন্ডারে আগুন লাগে। সেখানে আমার সাকিব দৌড়ে গিয়ে আগুন নেভায়। মানুষের কোনো বিপদ দেখলে সবার আগে সে ছুটে যেত। আমি বলতাম, 'বাবা, তুমি মানুষের জন্য এত চিন্তা করো, কিন্তু আমাদের কথা ভাবো না। তোমার কিছু হয়ে গেলে আমাদের কী হবে?' ও আন্দোলনে যাওয়ার আগে আমি বলি, 'বাবা, যদি কোনো বিপদ হয়?' আমার সাকিব আমাকে বলে, 'মা, কত মানুষ জীবন দিচ্ছে, আর আমি কি ঘরে বসে থাকতে পারি?' কথাগুলো বলতে বলতে মা রোকেয়া বেগম অঝোর ধারায় কাঁদতে থাকেন।

তার মৃত্যুর খবরে তার পিতা মাইনুল হকের দু চোখ যেন অশ্রুনদী হয়ে যায়। বাকরুদ্ধ পিতা সন্তানের বিচ্ছেদ বেদনায় হাহাকার করতে থাকেন। তার ছোট দুই ভাইয়ের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। প্রাণের প্রিয় বড় ভাইকে হারিয়ে তারা মনমরা হয়ে যায়। যেন তাদের হৃদয়টা ছিঁড়ে গেছে।

আর প্রিয়তমা স্ত্রী! তিনি নির্বাক নিস্তব্ধ! প্রিয়তম স্বামীর শোকে তার চেহারা হয়ে গেছে মলিন। রাতে তিনি স্বামীর শোকে ঘুমাতে পারেন না। তিনি অনুভব করেন তার বুকের ভেতরটা যেন শূন্য হয়ে গেছে। স্বামীর শোকে এখনো মাঝ রাতে তিনি ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠেন।

সাকিবের স্ত্রী নিশাত সালসাবিল কাঁদতে কাঁদতে বলেন, ৫ আগস্ট আন্দোলনে যাওয়ার সময় ও আমাকে বলে, 'আমার নতুন জামা বের করে দাও আমি ওটা পড়েই আন্দোলনে যাব।'

শহীদ সাকিব আনজুমের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদ সাকিব আনজুমের পরিবার অর্থনৈতিকভাবে বেশ স্বচ্ছল। তার পরিবারে বর্তমানে প্রধান আয়ের উৎস হলেন তার বাবা মাইনুল হক। তিনি রাজশাহী শহরে একটি মুদি দোকান পরিচালনা করেন। মুদি ব্যবসা থেকে তার আয় মাসিক প্রায় ৪০,০০০ টাকা। এছাড়া রাজশাহী শহরের তালাইমারী এলাকায় তাদের তিন তলা বিশিষ্ট একটি বাড়ি আছে।

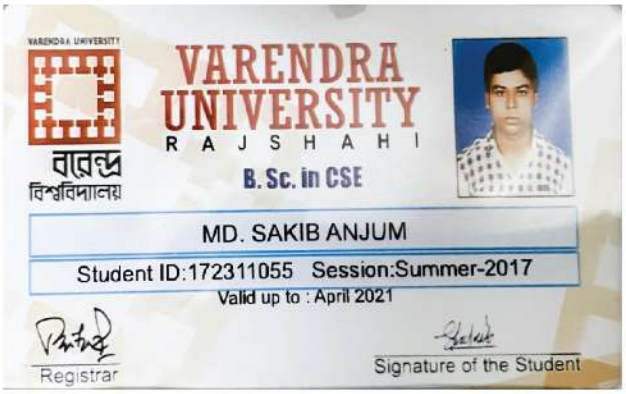

শহীদ সাকিবের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: সাকিব আনজুম
জন্ম তারিখ	: ০১.০২.১৯৯৭
শহীদ হওয়ার তাং ও সময়	: ৫ই আগস্ট, ২০২৪; ২টা ৩০ মিনিট
শহীদ হওয়ার স্থান	: তালাইমারী, রাজশাহী সদর
আঘাতের ধরন	: বুকের বাঁ পাশে ও গলার নিচে গুলিবিদ্ধ এবং ধারালো অস্ত্র দ্বারা জখম
হত্যাকারী	: সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ
সমাধিস্থল	: টিকাপাড়া গোরস্থান, রাজশাহী
পেশা	: ছাত্র ও চাকরিজীবী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
কর্মস্থান	: অর্গানিক কেয়ার, রাজশাহী
পিতা	: মো. মাইনুল হক
মাতা	: রোকেয়া খাতুন
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম-তালাইমারী, ইউনিয়ন-রাজশাহী সদর , থানা-বোয়ালিয়া, জেলা-রাজশাহী
বাড়িঘর ও সম্পদ	: নিজেদের তিনতলা একটি বাড়ি। পিতার মুদি ব্যবসা
স্ত্রী	: নিশাত সালসাবিল। রাজশাহী কলেজে স্নাতকোত্তরে অধ্যায়নরত
ভাইবোন	: ২ ভাই। আকিব আনজুম ও আসিফ আনজুম। উভয়েই ছাত্র

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. নিয়মিত শহীদ পরিবারের খোঁজখবর নেওয়া

রায়হানের ছোট ভাই ইন্টারমিডিয়েট শেষ করা রানা ইসলাম বলেন, "ভাইয়া আমায় অনেক ভালোবাসতেন, খেয়াল রাখতেন। ভাইয়া সব সময় পড়ালেখার খোঁজ নিতেন। আজ আমার ভাই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। আমি ভাই হত্যার সঠিক বিচার চাই"

শহীদ মোঃ রায়হান আলী

ক্রমিক : ২৬৯

আইডি : রাজশাহী বিভাগ ১১

শহীদ পরিচিতি

নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন এক তরুণ তুর্কি ছিলেন শহীদ মোহাম্মদ রায়হান আলী। ছিলেন ইসলামী আদর্শের এক আদর্শ সৈনিক। অকুতোভয় নির্ভীক এই তরুণ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে ছাড়া ভয় পেতেন না আর কারো।

আল্লাহর এই সৈনিকের জন্ম ১৯৯৭ সালের ২০শে অক্টোবর। পাখি ডাকা ছায়া ঢাকা শান্ত সুনিবিড় একটি গ্রাম মঙ্গলপাড়া। এই গ্রামটি রাজশাহী জেলার পুঠিয়া থানার অন্তর্গত শিলমাড়িয়া ইউনিয়নে অবস্থিত। এই গ্রামের এক গরীব দম্পতি মো. মুসলেম উদ্দিন ও মোছা. রুকসানা বিবি। এই দম্পতির কোলজুড়ে আগমন ঘটে তাদের প্রথম সন্তান রায়হান আলীর। কৃষক পিতা ও গৃহিণী মায়ের সেদিন খুশির সীমা ছিল না।

ছোটবেলা থেকেই রায়হান আলী ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। মেধার স্বাক্ষর রেখে একটার পর একটা ক্লাস টপকাতে থাকেন। সর্বশেষ তিনি রাজশাহী কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এমবিএ সম্পন্ন করেন।

ছাত্রজীবনে তিনি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাইতো তার জীবনটা ছিল ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত, আলোকিত। নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর আদর্শ সৈনিক হিসেবে।

শহীদ রায়হান আলীর পরিবারে বাবামা ছাড়াও রয়েছেন এক ভাই। নাম তার রানা ইসলাম। এইচএসসি শেষ করে তিনি এখন অনার্সে ভর্তিচ্ছু।

শহীদ রায়হানের পিতা একজন গরীব কৃষক। নিজস্ব কোনো কৃষি জমি নেই তাদের। তার বাবা অন্যের জমি বর্গাচাষ করেন। যা আয় হয় তা দিয়ে পরিবারের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানো কঠিন হয়ে পড়ে। সংসার চালানোর জন্য তাদের প্রতিনিয়তই নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। কৃষি থেকে পাওয়া সামান্য আয় দিয়ে তাদের শিক্ষা, চিকিৎসা এবং দৈনন্দিন খরচ সামলানো দুরূহ।

রায়হান আলীর শহীদ হওয়ার ঘটনা

জুলাইয়ের শুরুর দিকের কথা। সবেমাত্র বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু হয় রাজশাহীতে। আন্দোলনকে জোরদার করতে কিছু সিনিয়র ভাইয়েরা ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে এগিয়ে আসেন।

তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শহীদ রায়হান আলী। নেতৃত্বগুণে পারদর্শী রায়হান আলী শুরু থেকেই বৈষম্যবিরোধী ছাত্রআন্দোলনে সমন্বয়কদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করতেন। সাথে নিজেও থাকতেন মিছিলের সম্মুখভাগে।

ক্রমেই আন্দোলন জোরালো হতে থাকে এবং রায়হান আলী সার্বক্ষণিক আন্দোলনকারীদের পাশে থেকে ভূমিকা রাখতে থাকেন।

দিনটি ছিল সোমবার, আগস্টের ৫ তারিখ। স্বৈরাচার পতনের কিছুক্ষণ আগে।

রুয়েট গেইট সংলগ্ন নগরীর তালাইমারি মোড়ে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী জড়ো হয়ে সাহেব বাজারের দিকে রওনা দেয়। কিন্তু

আলুপট্টি নামক জায়গায় শিক্ষার্থীদের মিছিলটি গেলে রাজশাহীর আওয়ামী লীগ নেতা ডাবলু সরকার এবং তৎকালীন সিটি কর্পোরেশনের মেয়র খাইরুজ্জামান লিটনের ক্যাডার বাহিনী শিক্ষার্থীদের ওপর মুহুর্মুহু গুলি চালায়।

সময় তখন দুপুর ১:৩০। আওয়ামী সন্ত্রাসীদের ছোঁড়া একটি গুলি এসে রায়হান আলীর ঠিক মাথায় আঘাত করে। সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন রায়হান আলী। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা তাৎক্ষণিক তাকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার গুরুতর অবস্থা দেখে ডাক্তাররা তাকে ঢাকায় নেওয়ার পরামর্শ দেন। পরামর্শ মোতাবেক ঢাকায় রওনা দিয়েও আন্দোলনের ভয়াবহ পরিস্থিতির কারণে সামনে আগানো সম্ভব হয়নি। উপায়ান্তর না দেখে পুনরায় গুলিবিদ্ধ রায়হান আলীকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেই ভর্তি করানো হয়।

রায়হান আলীকে তৎক্ষণাৎ অপারেশন থিয়েটারে নেওয়া হয় এবং সন্ধ্যা ০৭:৩০টায় অপারেশন শেষ হয়। ডাক্তারদের ভাষ্যে, অপারেশন সফল হয়।

পরের দিন ৬ আগস্ট রায়হান আলী হাত পা নাড়াচ্ছিলেন, যা সবাইকে আশান্বিত করে। সবার প্রিয় রায়হান হয়তো ফিরে আসবেন! কিন্তু বিকাল সাড়ে ৪টার পরে তার ব্লিডিং হতে থাকে এবং জিসিএস স্কোর কমতে থাকে। আবার রাত ১০টার দিকে তার অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়।

৭ আগস্ট সকালে জিসিএস স্কোর ৬-এ নেমে আসে। রাত ১০টার দিকে তা আবার জিসিএস স্কোর ৮-এ উন্নীত হয়।

পরের দিন ৮ আগস্ট সকালে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তাকে ঢাকায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু সেদিন সকাল থেকেই রায়হান আলীর অবস্থা খারাপ হতে থাকে। জিসিএস স্কোর ১-এ নেমে আসে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলে অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যায়। এভাবে চলতে চলতে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় রায়হান আলী সকলকে কাঁদিয়ে চির বিদায় নেন। নিভে যায় দেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে চাওয়া মহান আল্লাহর একজন সৈনিকের জীবন প্রদীপ।

৯ আগস্ট রাজশাহী কলেজে বৃষ্টি উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

এরপর শহীদ রায়হান আলীর মরদেহ নেওয়া হয় গ্রামের বাড়ি পুঠিয়ার মঙ্গলপাড়া গ্রামে। সেখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত হন সকলের প্রিয় শহীদ রায়হান আলী।

শহীদ রায়হানের শোকাহত পরিবাররায়হান আলীর শহীদ হওয়ার খবরে এক গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে তার পরিবারে। পরোপকারী নিরহংকার তরতাজা যুবক ছেলের মৃত্যু যেন সইতে পারে না পরিবারটি।

২৭ বছর বয়সী শহীদ রায়হান আলী ছিলেন অমায়িক একজন মানুষ। ছোট থেকেই ছিলেন বিনয়ী, নম্রভদ্র, সচ্চরিত্রবান ও মেধাবী। রায়হানের ছোট ভাই ইন্টারমিডিয়েট শেষ করা রানা ইসলাম বলেন, "ভাইয়া আমায় অনেক ভালোবাসতেন, খেয়াল রাখতেন। ভাইয়া সব সময় পড়ালেখার খোঁজ নিতেন। আজ আমার ভাই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। আমি ভাই হত্যার সঠিক বিচার চাই।"

"আমার কোনো মেয়ে নাই। কিন্তু আমার বড় ছেলেটা মেয়ের অভাব পূরণ করত। রায়হান বাড়িতে আসলেই আমার জামাকাপড় পরিষ্কার করে দিত। হাতের নখগুলো কেটে দিত। আমার সোনার ছেলেকে ওরা কীভাবে গুলি করতে পারলো?" কান্না জড়িত কণ্ঠে কথাগুলো বলছিলেন শহীদ রায়হান আলীর পিতা মোঃ মোসলেম উদ্দিন। বাড়ির ১৩ শতক জমি ছাড়া আর তেমন কিছু নেই তার। অন্যের জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করেন। দরিদ্র কৃষক, বয়সটাও ৫৫ পার হয়ে গিয়েছে। দুই ছেলেকে নিয়ে তার কতই না স্বপ্ন। বড় ছেলে পড়ালেখা শেষ করে চাকরি করবে, সংসারে সচ্ছলতা আসবে, তাকে আর এত রোদে পুড়ে কাজ করতে হবে না! কিন্তু সন্ত্রাসীদের একটি বুলেট কৃষক মোসলেম উদ্দিনের সমস্ত স্বপ্ন কেড়ে নিল।

ছেলে হারানোর শোকে কাতর-বিধ্বস্ত শহীদ রায়হান আলীর মা রুকসানা বিবি বলেন, "যেদিন আমার রায়হান ফোন করে বলতো, 'মা আমি বাড়িতে আসবো।' ওইদিন সকালেই আমি রান্না করে বসে থাকতাম আর অপেক্ষা করতাম আমার রায়হান কখন বাড়িতে এসে মা বলে ডাক দিবে। আমার ছেলে রায়হান ছিল আমার শান্তি। ও বাড়িতে আসলে আমাদের হৃদয় ঠান্ডা হয়ে যেত। পড়াশোনার জন্য শহরে থাকতো, সেজন্য আমার বেটা অনেকদিন পর পর বাড়িতে আসতো। আমার রায়হান বাড়িতে এসে আর কখনো মা বলে ডাক দিবে না। আমি রান্না করে ওর জন্য খাবার নিয়ে বসে থাকলেও ওকে আর কখনো পাবো না।"

এভাবেই ছেলে হারানোর শোক বুকে নিয়ে দিন কাটে শহীদ রায়হান আলীর বাবা-মায়ের। অসহায় বয়স্ক মা-বাবা আজও রায়হানের রুমে গিয়ে ছেলেকে না পেয়ে অঝোরে কাঁদতে থাকেন। কাঁদতে থাকে শহীদ রায়হান আলীর পোষা বিড়ালটাও। এরুম থেকে ওরুমে খুঁজে বেড়ায় রায়হানকে।

শহীদ রায়হান আলী আজও আমাদের হৃদয়ে জীবিত, কিন্তু বাস্তবতার নির্মমতায় আমরা তাকে আর কোনদিন ফিরে পাবোনা।

শহীদ রায়হান সম্পর্কে অন্যান্য জনের বক্তব্য

শহীদ রায়হান আলীর রুমমেট হাসিবুর রহমান বলেন, "রায়হান আলী ভাই খুবই ভালো মানুষ ছিলেন। রুমমেট হিসেবে আমরা দীর্ঘদিন একসাথে ছিলাম। তার স্মৃতি আমার প্রতিনিয়ত মনে পড়ে। তিনি আল্লাহভীরু একজন মানুষ ছিলেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে মসজিদে গিয়ে আদায় করার চেষ্টা করতেন। জুমার দিন তিনি খুব দ্রুত মসজিদে চলে যেতেন। আল্লাহতায়ালা ভাইকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন।"

অন্য এক রায়হান

শহীদ রায়হান আলী ছিলেন ইসলামী ছাত্র শিবিরের একজন জনপ্রিয় নেতা। তার নেতৃত্বের গুণ ছিল অত্যন্ত প্রখর। তাই সহজেই সবার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন তিনি। তিনি তার শাখার শিবিরকে নিয়ে গিয়েছিলেন এক অনন্য উচ্চতায়। শিবিরের বিভিন্ন মিছিল, মিটিং প্রোগ্রামের নেতৃত্ব ভাগে থাকতেন তিনি। তার নেতৃত্বে চলতো সব আয়োজন।

শিবিরের কেউ যাতে কখনো কোনো অন্যায়, অপকর্মে, অশ্লীলতায় লিপ্ত হতে না পারে, সে দিকে ছিল তার সজাগ দৃষ্টি। তিনি শিবিরকে সবসময় কলুষতা মুক্ত রাখতে নিজের জীবন বাজি রাখতেন। শিবিরের প্রতিটি সদস্যকে ইসলামের সঠিক আদর্শে গড়ে তুলতে নিরলস প্রচেষ্টা চালাতেন। তিনি নিজে কখনো কোনো অন্যায়-অপকর্মে লিপ্ত হতেন না এবং তার সাথীদেরকেও লিপ্ত হতে দিতেন না।

তিনি চাইতেন আল্লাহ ও রাসূল (সা)-এর ভালোবাসায় নিজেকে, নিজের বন্ধুবান্ধব, নিজের সংগঠনের সদস্যদেরকে সিক্ত করতে। চাইতেন নিজের সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরকে নীতি ও আদর্শের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত করতে। এজন্য ছিল তার নিরলস প্রচেষ্টা। তাইতো সব সময় ইসলামের আদর্শ পথে অবিচল থাকতেন।। অন্যায়ের সাথে কখনো আপস করতেন না।

তিনি এই সংগঠনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে এমন অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন যে, ৯ই আগস্ট তার জানাযায় তুমুল বৃষ্টি উপেক্ষা করে রাজশাহী কলেজ প্রাঙ্গনে হাজার হাজার মানুষের স্থিতি তার প্রমাণ।

ইসলামের মহান আদর্শের এই সৈনিককে ওপারে আল্লাহ জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান বানিয়েছেন-সেই আশা এবং দোয়া আমাদের সকলের।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
Temporary National ID Card / সাময়িক জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ রায়হান আলী
Name: MD. RAYHAN ALI
পিতা: মোঃ মুসলেম উদ্দিন
মাতা: মোছাঃ রুকসানা বিবি
Date of Birth: 20 Oct 1997
ID NO: 7803496434

শহীদ রায়হানের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: রায়হান আলী
জন্ম তারিখ	: ২০.১০.১৯৯৭
শহীদ হওয়ার তাং ও সময়	: ৮ আগস্ট, ২০২৪; সন্ধ্যা ৬:৩০টা
শহীদ হওয়ার স্থান	: রাজশাহী মেডিকেল কলেজ
আঘাতের ধরন	: মাথায় গুলিবিদ্ধ
গুলিবিদ্ধের তাং ও সময়	: ৫ আগস্ট ২০২৪; দুপুর ০১:৩০টা
গুলিবিদ্ধের স্থান	: আলুপট্টি, রাজশাহী
হত্যাকারী	: সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী
সমাধিস্থল	: মঙ্গলপাড়া, পুঠিয়া, রাজশাহী
পেশা	: ছাত্র
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: এমবিএ (উত্তীর্ণ)
পিতা	: মো: মুসলেম উদ্দিন
মাতা	: মোছা: রুকসানা বিবি
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: মঙ্গলপাড়া, ইউনিয়না: শিলমাড়িয়া, থানা: পুঠিয়া, জেলা: রাজশাহী
বাড়িঘর ও সম্পদ	: ১৩ শতক জমিতে একটি বাড়ি। পিতার কৃষিকাজ
ভাইবোন	: ১ ভাই। রানা ইসলাম। বয়স ২১। ছাত্র

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. তার বাবার জন্য নিজস্ব কৃষি জমির ব্যবস্থা করা

২. তার ছোট ভাইয়ের পড়াশোনার ব্যবস্থার পাশাপাশি একটি চাকরির ব্যবস্থা করা

৩. শহীদ পরিবারকে নিয়মিত আর্থিক সহযোগিতা করা

" অনাগত সন্তানের মুখ দেখে যেতে পারলেন না অ্যাডভোকেট আলিফ "

শহীদ সাইফুল ইসলাম আতিক

ক্রমিক : ২৭০

আইডি : চট্টগ্রাম বিভাগ ১১০

শহীদ পরিচিতি

১৯৯৪ সালের মার্চের ১ তারিখ জন্যগ্রহণ করেন সাইফুল ইসলাম আলিফ। তার বাবার নাম মো: জামাল উদ্দিন ও মায়ের নাম হোসনে আরা বেগম। সম্প্রতি চট্টগ্রাম আদালতের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর নিযুক্ত হয়েছিলেন সাইফুল ইসলাম আলিফ (৩৫)। অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম আলিফের (৩৫) তাসকিয়া নামের তিন বছরের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। তার স্ত্রী ইসরাত জাহান তারিন চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা। দ্বিতীয় সন্তানের অপেক্ষায় ছিলেন আলিফ এবং তারিন দম্পতি। কিন্তু চট্টগ্রামে সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিনায় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে কারাগারে নিয়ে যাওয়ার সময় বাধাদানকারী ইসকন সর্মথকদের হামলায় ২৬ নভেম্বর মঙ্গলবার নিহত হন অ্যাডভোকেট আলিফ। ফলে অনাগত সন্তানের মুখ আর দেখে যেতে পারলেন না তিনি। সাত ভাইবোনের মধ্যে আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ চতুর্থ। চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার চুনতি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন নিহত সাইফুল ইসলাম আলিফ। ২০১৮ সাল থেকে চট্টগ্রামে প্রাকটিস শুরু করেন এবং পরবর্তী সময়ে হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে নিবন্ধিত হন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

জুলাই বিপ্লবের পরে শেখ হাসিনাসহ তার সন্ত্রাসী বাহিনী ভারতে পালিয়ে যায়। হাসিনা পালিয়ে গেলেও তার সহযোগী সংগঠনগুলো দেশ বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত বরাতে চেষ্টা করে। ইসকন ফুল ভারতের আশির্বাদপুষ্ট হিন্দুদের একটি সন্ত্রাসী সংগঠন। শেখ হাসিনা ইসকনকে ব্যবহার করা শুরু করে। তারা রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়। তাদের একটি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার অবমাননা করে। জাতীয় পতাকার অবমাননার অভিযোগে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র ও পুণ্ডরীক ধামের অধ্যক্ষ চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে কারাগারে নিয়ে যাওয়না সময় বাধাদানকারী ইসকন সমর্থকদের হামলায় নিহত হন সাইফুল ইসলাম আলিফ। মঙ্গলবার (২৬ নভেম্বর) বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে কোতোয়ালীর রঙ্গম সিনেমা হলের পাশের মেঘর পট্টি থেকে আহত অবস্থায় ওই আইনজীবীকে উদ্ধার করা হয়। পরে তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। প্রত্যক্ষদর্শী মোঃ হাসান নামে এক আইনজীবী বলেন, পুলিশ ও আইনজীবীদের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষের মধ্যে আইনজীবী আলিফকে বিক্ষোভকারীরা কোপায়। পরে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। অথচ নিহত আলিফ চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের মামলার সাথে যুক্তই ছিলেন না বলে নিশ্চিত করেছেন আইনজীবীরা।

কাজ শেষে আদালত থেকে বাড়ি ফেরার পথে এ হত্যাকান্ডের শিকার হন সাইফুল ইসলাম। ইসকন সন্ত্রাসীরা তার গলা কেটে ফেলে। পরদিন সকালে চট্টগ্রামের আদালত প্রাঙ্গণে একটি জানাজা এবং জামিয়াতুল ফালাহ মসজিদে আরেকটি জানাজা হয়েছে নিহত আলিফের। পরে জামিয়াতুল ফালাহ মসজিদের দ্বিতীয় জানাজায় ভূমি উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফ, চট্টগ্রামের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন,

জামায়াতে ইসলামীর চট্টগ্রাম নগরীর আমীর শাহজাহান চৌধুরী এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ ও সারজিস আলমসহ প্রচুর মানুষ অংশ নেন। বিকেলে গ্রামের বাড়ি চুনতিতে দাফন করা হয় নিহত আলিফকে।

চিন্ময়ের গ্রেফতারের পূর্ববর্তী ঘটনা

কেন চিন্ময়কে গ্রেফতার করা হলো? অনেকের মনে প্রশ্ন। প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে জানা গেল-স্বৈরাচারী সরকার আওয়ামীলীগকে ব্যবহার করে যারা নানাবিধ অপকর্ম করেছিল, মুসলিমদের লাঞ্ছনা ও নির্যাতন করেছিল, হামলা, মামলা, গুম, খুনের মাধ্যমে ঘর ছাড়া করেছিল, তাদের সম্পদ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জমি, হাসপাতাল প্রভৃতি দখলের সাথে যে অংশ জড়িত ছিল তারা বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক হিন্দু জনগোষ্ঠী। এরা আওয়ামীলীগকে ব্যবহার করে লাভবান হয়েছিল। তাই স্বাভাবিক ভাবে স্বৈরাচার সরকার পালিয়ে যাওয়ায় মজলুমরা তাদের নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে আসার পরে ১৫ বছর ধরে আওয়ামী লীগের আশ্রয়ে অপকর্ম করে বেড়ানো নির্যাতক স্থানীয় সন্ত্রাসীরা কোনঠাসা হয়ে পড়ে। অন্যায়ভাবে দখলকৃত সম্পদ ফেরত দিতে বাধ্য হয়। ভারতীয় মিডিয়া হিন্দু নির্যাতন করা হচ্ছে বলে এটাকে বাজেভাবে উপস্থাপন করা শুরু করে। ভারত ও আওয়ামীলীগ ইসকনকে ইশারা দেয় আন্দোলন শুরু করতে। ইসকন দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু নির্যাতন হচ্ছে আওয়াজ তুলে আন্দোলন কর্মসূচী ঘোষণা করে। চিন্ময় এর নেতৃত্ব প্রদান করেন।

ইসকন এর পরিচয় ও নানাবিধ বিতর্ক

ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেস (ইসকন), যা সাধারণভাবে হরে কৃষ্ণ আন্দোলন নামে পরিচিত। মূলত গৌড়ীয় বৈষ্ণব হিন্দু সংগঠন হিসেবে পরিচিত ইসকন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৬ সালের ১৩ জুলাই নিউইয়র্ক সিটিতে এ সিং ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের মাধ্যমে। এর লক্ষ্য ছিল বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণ চেতনা ছড়িয়ে দেওয়া। তবে, ইসকনের কার্যক্রমগুলো সবসময় বিতর্কমুক্ত ছিল না। অভ্যন্তরীণ সমস্যা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অভিযোগ এবং হিন্দু ধর্মের শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা দেওয়ার অভিযোগ নানা সময়ে উঠে এসেছে, যা সংগঠনটির বিরুদ্ধে একটি জটিল এবং প্রায়শই বিতর্কিত জনমত তৈরি করেছে।

বিতর্ক ও অভিযোগ

১। হিন্দু ধর্মগ্রন্থের ভুল ব্যাখ্যার অভিযোগ ইসকনের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের। একটি সমালোচনা হলো তাদের দ্বারা হিন্দু ধর্মগ্রন্থের প্রচলিত ব্যাখ্যার পুনঃবিবেচনা করা হচ্ছে। সমালোচকরা দাবি করেন, ইসকনের গ্রন্থগুলোতে কৃষ্ণকে সর্বোচ্চ দেবতা হিসেবে তুলে ধরা হয়, যেখানে শিব ও দুর্গার মতো অন্যান্য দেবতার অবমূল্যায়ন করা হয় এবং তাদের 'অর্ধদেবতা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

২। যুক্তরাষ্ট্রে মানসিক প্রভাব বিস্তার ও আইনি মামলা: ১৯৭০ এবং

১৯৮০-এর দশকে, ইসকন যুক্তরাষ্ট্রে 'ব্রেনওয়াশিং' বা মানসিক প্রভাব বিস্তার, অবৈধভাবে কারাগারে রাখা এবং তরুণ ভক্তদের অপহরণের অভিযোগে বিভিন্ন আইনি জটিলতায় পড়ে। ১৯৭৬ সালের চবড়ঢ়ষব া. গঁৎঢ়যু মামলায় নিউ ইয়র্ক আদালত হরে কৃষ্ণকে একটি বৈধ ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তবে পরবর্তী মামলাগুলো, যেমন ১৯৮৪ সালের এবড়ৎমব া. ওঝকঈঙঘ, সংগঠনের অভ্যন্তরে কথিত মানসিক প্রভাবের অভিযোগ তুলে ধরে। এই মামলায় এক তরুণী ইসকনে যোগ দেয় এবং অভিযোগ ছিল যে, ইসকন তার অবস্থান নিয়ে তার বাবা-মাকে বিভ্রান্ত করেছিল। মামলাটি বিভিন্ন রায়ের দিকে নিয়ে যায়; কিছু অভিযোগ - খারিজ করা হলেও শেষ পর্যন্ত ইসকন পরিবারটির মানসিক দুর্দশার জন্য দায়ী বলে সাব্যস্ত হয়।

৩। শিশু নির্যাতনের অভিযোগ: ১৯৯০-এর দশকে, ইসকনের অধীনস্থ বোর্ডিং স্কুলগুলোতে শিশু নির্যাতনের ব্যাপক অভিযোগ সামনে আসে। যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের ইসকন পরিচালিত

স্কুলগুলোতে ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে অনেক শিশু শারীরিক, মানসিক এবং যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিল বলে তদন্তে প্রকাশ পায়। বাংলাদেশে ইসকনের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ; সমালোচকরা অভিযোগ করছেন যে, ইসকন আধ্যাত্মিক কর্মকান্ডের বাইরে গিয়ে রাজনৈতিক বিষয়ে অংশ নিচ্ছে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইসকন বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশন

থেকে আর্থিক সহায়তা পায়, যা দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতিতে প্রভাব বিস্তারের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। সমালোচকদের মতে, ইসকন বাংলাদেশে, হিন্দু সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের একটি বানোয়াট চিত্র তুলে ধরছে। তারা মনে করেন, এই চিত্রটি আন্তর্জাতিক সহানুভূতি এবং সমর্থন লাভের জন্য অতিরঞ্জিত এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের কথা তুলে ধরে ইসকন আন্তর্জাতিক মতামত প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে এবং দেশটির ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে চাপ সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। (ইনকিলাব, ২৮ নভেম্বর ২০২৪)

পরিবারের বক্তব্য

আলিফের বড় বোন জান্নাত আরা বেগম টিবিএসকে বলেন, আমার ছোট ভাই আলিফের তিন বছরের একটি কন্যা সন্তান আছে। সে অকালে তার বাবাকে হারিয়েছে। অনাগত সন্তানও তার বাবার মুখ দেখবে না। আবার ভাইয়েরও তার দ্বিতীয় সন্তানকে দেখার সৌভাগ্য হলো না। এর চেয়ে কষ্টের আর কী হতে পারে। জামাল উদ্দিন বলেন, "আমি আমার ছেলে হত্যার বিচার চাই। যারা আমার ছেলেকে এমনভাবে মেরেছে আমি আল্লাহর কাছে তাদের বিচার দিলাম। আল্লাহ যেন তাদের বিচার করেন।" চট্টগ্রাম আদালতের সহকর্মীরা বলেন, অ্যাডভোকেট আলিফ পেশাগত

জীবনে খুবই সৎ ছিলেন। তার এমন মৃত্যু আমরা কোনভাবেই মেনে নিতে পারছি না। আলিফের ভাগিনা তাসলিমুল হাসান বলেন, আমার মামা খুবই ভালো ছিলেন। যখন আমার সাথে দেখা হতো পাড়াশোনা থেকে শুরু করে সব খোঁজ-খবর নিত। আমার মামাকে যারা হত্যা করেছে আমরা তাদের ফাঁসি চাই।

শহীদ ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: সাইফুল ইসলাম আলিফ
পেশা	: আইনজীবী
বাবা	: জামাল উদ্দিন
মা	: হোসনে আরা বেগম
স্ত্রী	: ইসরাত জাহান তারিন
স্থায়ী ঠিকানা	: ফারেঙ্গা, এম চর হাট, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
ঘটনার স্থান	: চট্টগ্রাম কোর্ট
আক্রমণকারী	: ইসকন
আহত হওয়ার সময়	: ২৬ নভেম্বর, মঙ্গলবার, বিকাল
আঘাতের ধরন	: কোপানো ও গলা কাটা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ২৬ নভেম্বর, মঙ্গলবার, বিকাল
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
প্রস্তাবনা	: ১. সন্তানদের ভরণপোষণ ও লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা

“শহীদ রেজাউল হক সরকার: আওয়ামী নির্মমতার বলি”

মো: রেজাউল হক সরকার

ক্রমিক : ২৭১

আইডি : রাজশাহী ১৩

শহীদ পরিচিতি

রেজাউল হক সরকার ১৯৬১ সালে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক শহর রাজশাহীর চারঘাট উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন। ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর একজন সক্রিয় পরিশ্রমী নেতা। সমাজের ও দেশের জন্য কাজ করার শপথ নিয়েছিলেন। দেশদ্রোহী, খুনি ও দূর্নীতিবাজদের সংগঠন আওয়ামী বাকশালীদের চোখে দেশপ্রেম ও দেশের মানুষের জন্য কাজ করা ছিল তার অপরাধ! আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের সময় দেশ থেকে পলায়নের আগে ইসলামী নেতৃবৃন্দের উপরে হামলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আওয়ামী নির্মমতার নিষ্ঠুর বলি হলেন শহীদ রেজাউল হক সরকার।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

শহীদ রেজাউল হক সরকার তার জ্ঞান হওয়ার পরে থেকে পাকিস্তান আমল দেখেছেন। দেখেছেন ১৯৭১ সালে ভারতের চক্রান্তের ফলে শক্তিশালী পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়া। তিনি দেখেছেন আওয়ামীলীগ অবৈধভাবে ৭২ থেকে ৭৫, ৯৬ থেকে ২০০১ এবং ২০০৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত অবৈধ পন্থায় ক্ষমতায় ছিল। ১৯৭৪ সালে বাকশালীদের নেতা শেখ মুজিবের এমপি-মন্ত্রীদের লুটপাটের ফলে দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছিল। সেই দূর্ভিক্ষে দেশের মানুষের না খেতে পেয়ে হাজারে হাজারে মৃত্যু খুব কাছ থেকে সরাসরি অবলোকন করেছেন। স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের ২০০৮ পরবর্তী বছর গুলোয় অত্যাচারের মাত্রা এতো তীব্র হয় যে সরকারের সমালোচনা করলেই জেল-জুলুম, গুম-খুন শুরু হয়ে যেত। রেজাউল হাসিনা বাহিনীর নির্মমতার ফলে জেলে গিয়েছেন। সেখানে দেখেছেন অগণিত নিরীহ ইসলামী ব্যক্তিদের আহাজারি! ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করতে শত শত আলেম-মুফাসসিরদের গুম ও খুন করেছে। যা ইতিহাসের ফেরাউন বা নৎসি বাহিনীর অত্যাচারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এমন অবস্থায় দেশের সচেতন সাধারণ মানুষ অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছু বলার সুযোগ না পেলেও মনে ছিল তীব্র ঘৃণা। জনতা সময়ের অপেক্ষায় ছিল। যার দেখা পেল কোটা আন্দোলনে। কোটা পদ্ধতি ২০১৮ সালে আন্দোলনের মুখে বাতিল করেছিলেন শেখ হাসিনা। তিনি নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করতে দলীয় সন্ত্রাসী, চাটুকার ও ভারতীয়দের সরকারি চাকুরীতে নিয়োগের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী সাবেক ধর্ষক ও সন্ত্রাসী আ ক ম মোজাম্মেল হক অর্থের বিনিময়ে নিজ দলের কর্মীদের মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট প্রদান করতেন। ২৫ জুন ২০১৯ সালের ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় দেশে ৮০ হাজার ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা রয়েছে। দেশের মানুষ বুঝেছিলেন হাসিনার পরিকল্পনা। তাই জুলাই মাস জুড়ে দফায় দফায় ছাত্র জনতার আন্দোলন কোটা থেকে পরিণত হয় ৯ দফার আন্দোলনে। এরপরে তা এক দফায় পরিণত হয়। ১ আগস্ট শেখ হাসিনা বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তারা বুঝতে পেরেছিল এ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে আছে জামায়াত ও শিবিরের কর্মীবাহিনী। পুলিশকে নির্দেশ দেয় গণহত্যা চালানোর। আওয়ামী সন্ত্রাসীরা এসময় বেছে বেছে জামায়াত-শিবির নেতাদের হত্যা করতে থাকে। ৪ আগস্ট সর্বত্র নিরস্ত্র ছাত্র-জনতা অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। স্বৈরাচারী সরকার এদিন বুঝতে পারে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার শেখ হাসিনা ও তার ঘৃণিত বাহিনীকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন। তিনি তাদের দেশ ত্যাগের সুযোগ করে দেন। হাসিনা ও তার সন্ত্রাসীরা পালিয়ে গেলেও আগের নির্দেশনানুযায়ী রাজপথে পুলিশ জনতার উপরে নির্মমভাবে গুলি বর্ষণ শুরু করে হত্যা করতে থাকে। খুনি হাসিনার পলায়নে ৫ আগস্ট দেশ দ্বিতীয়বার স্বাধীন হয়। এদিন সন্ধ্যায় বড় বোনের বাসা থেকে মাগরিবের নামাজ শেষ করে নিজ বাড়িতে যাওয়ার সময় আগে থেকে ঘাপটি মেরে অপেক্ষায় থাকা আওয়ামী গুন্ডারা দা, কিরিচ, ছুরি নিয়ে তার উপরে ঝাপিয়ে পড়ে। মারা গেছে ভেবে তারা রাস্তায় ফেলে রেখে চলে যায়। রাজশাহী মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৭ আগস্ট তিনি শাহাদাত বরণ করেন। জানাজা শেষে শিবপুর পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

কেমন আছে তার পরিবার

রেজাউল হক সরকারের মৃত্যুর পর শোকাচ্ছন্ন তার পরিবার। তার পরিবার এই হত্যার বিচার চায়। শহীদ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। আওয়ামী লীগ দেশ থেকে পালানোর সময় ইসলামী ঘরানার ব্যক্তিদের উপর হামলা করা শুরু করে। রেজাউল হক তাদের হিংস্রতার বলি হলেন।

একনজরে ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: রেজাউল হক সরকার
পেশা	: অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা
জন্ম তারিখ	: ০৯/১১/১৯৬১
পিতা	: মৃত জব্বার সরকার
মাতা	: রাহেলা খাতুন
স্ত্রী	: মোসা: নাজমা আক্তার লাবণী
আহত ও শহীদ হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪, সোমবার, মাগরিবের নামাজের সময়, ৭ আগস্ট ২০২৪, সকাল ১১ টা
ঘটনার স্থান	: হাট শিবপুর
শাহাদাত বরণের স্থান	: রাজশাহী মেডিকেল কলেজ
দাফন করা হয়	: বানেশ্বর-সারদা রোডের শিবপুর বটমুল নামক স্থানের দক্ষিণে গিয়ে পশ্মিমে ২০০-২৫০ গজ পশ্চিমে পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। https://maps.app.goo.gl/XjEsrqsq54GLmkG4A?g_st=iw GPS LOCATION: (24.3581794, 88.7522947)
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: শিবপুর, সীমারপাড় থানা/উপজেলা: চারঘাট , জেলা: রাজশাহী
ঘরবাড়ি ও সম্পদের অবস্থা	: বাড়িতে ঘর আছে, সামান্য জমি আছে।
সন্তান	: ছেলে ৩ জন ১. মো: নাজমুস সাকিব, বয়স: ৩৭, পেশা: চাকুরী ২. মো: নাজমুল হাসান, বয়স: ৩২, পেশা: ব্যবসা ৩. মো: নাজমুন নুর, বয়স: ২৮, পেশা: চাকুরী
প্রস্তাবনা	: ১. স্ত্রীকে মাসিক বা এককালীন সহযোগিতা করা

"বাবা, তুমি তো আমাকে এত শাসন করো, আমি না থাকলে তখন অনেক মনে পড়বে।"

শহীদ মো: মাহবুব হাসান নিলয়

ক্রমিক : ২৭২

আইডি : রাজশাহী ১৪

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মাহবুব হাসান নিলয় সিদ্দিক মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের নবম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। ফুটবল খেলতে ভালোবাসতেন। ফুটবলে দারুণ পারদর্শী ছিলেন। শহীদের বাবা আনসার বাহিনীর একজন সদস্য। তাদের তিন তলা বিশিষ্ট একটা বাড়ি আছে। শহীদের বড়ো ভাই সৌদি প্রবাসি ছিলেন। বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থান করছেন।

ঘটনার বিবরণ

৪ আগস্ট ২০২৪ তারিখে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে সকাল ১১টায় পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ থেকে মিছিল বের হওয়ার কথা ছিল। সকাল ৮টা বাজতেই শহীদ নিলয়ের মন মিছিলের জন্য ছটফট করতে থাকে। সদ্য সৌদি আরব থেকে ফেরা বড়ো ভাই মেহেদী হাসান মিলন, বোন মাহবুবা নাজনীন এবং মাহবুব হাসান নিলয়– তিন ভাইবোনই মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। মা দিল আফরোজা ছেলেকে বললেন, "তোমরা মিছিলে যাবে, তাহলে তোমাদের লাঠি কোথায়?" মায়ের কথা শুনে মাহবুব যেন আরও সাহস পায়, নিজেই তিনটি লাঠি বানিয়ে নেয়।

সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে দিল আফরোজা গরম ভাত ও কচু ভর্তা রান্না করেন। এরপর তিন সন্তানকে খাবার টেবিলে ডেকে নেন। কেউই নিজের হাতে খেতে চায় না, তিন ভাইবোনের একই অভ্যাস- মায়ের হাত থেকেই খাওয়া যেন তাদের নিত্যদিনের অধিকার।

মাহবুবের কচু ভর্তা তেমন পছন্দ না। দুই গাল ভাত মুখে নিয়ে সে বলল, "খাবো না।"

বড়ো ভাই মিলন টাকা দিয়ে তাকে দোকানে পাঠান গাড়ি ভাড়ার জন্য খুচরা করে আনতে। মাহবুব টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে স্থানীয় অন্যান্য ছেলেদের আন্দোলনে যাওয়ার জন্য ডাকতে গেল। কিছুক্ষণ পর মাহবুব বাড়িতে ফিরে এসে দেখল, দেরি দেখে মিলন ও মাহবুবা রিকশা নিয়ে আন্দোলনের স্থানে চলে গেছেন।

মাহবুব বাড়িতে এসে মাকে বলল, "আম্মু, আমি কচু ভর্তা দিয়েই খাবো।" মা তাকে খাইয়ে দিলেন। কে জানতো, সেটাই হবে মায়ের হাতে তাঁর শেষ খাওয়া। এরপর মাহবুব পাবনা সরকারি এডওয়ার্ড কলেজের সামনে চলে গেল। ইতোমধ্যে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী সেখানে জমায়েত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে পাবনা ট্রাফিক মোড়ে অবস্থান নিয়েছে।

শিক্ষার্থীরা সেখানে বসে বা দাঁড়িয়ে দেশাত্মবোধক গান গাচ্ছিলেন। প্রায় ৪০ মিনিট পর হঠাৎ পাবনা সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও ভাঁড়ারা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আবু সাঈদ খান তার জিপগাড়ি নিয়ে মিছিলের উত্তর পাশের রাস্তায় এসে উপস্থিত হয়। গাড়ি থেকে নেমে চেয়ারম্যান এবং তার সহযোগী নাসির অস্ত্র হাতে নেয়। সেখান থেকেই শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি চালাতে শুরু করে। শিক্ষার্থীরা দিগ্বিদিক ছুটতে শুরু করেন। কেউ বুকে, কেউ পিঠে, কারও মাথায়, আবার কারও চোখে গুলি লাগে। মুহূর্তেই চিৎকার-আর্তনাদে ভারী হয়ে ওঠে পাবনা ট্রাফিক মোড়ের বাতাস। রাজপথ হয় রক্তাক্ত।

সাঈদ খানের ছোড়া একটি গুলি এসে শহীদ মাহবুবের বুকে লাগে। তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এভাবেই শেষ হয়ে যায় মাহবুব হাসান নিলয় নামের এক তরুণের অধ্যায়।

সেদিন ঘটনাস্থলেই জাহিদুল ইসলাম নামে আরো একজন শিক্ষার্থী শহীদ হন।

শহীদ মাহবুব তাঁর বাবা আবুল কালাম আজাদের শাসন ভয় পেতো। একদিন সাহস করে বলেছিল, "বাবা, তুমি তো আমাকে এত শাসন করো, আমি না থাকলে তখন অনেক মনে পড়বে।" আজ বাবা আবুল কালাম আজাদ তাঁর ছেলের কথা মনে হলেই অঝোরে কাঁদতে থাকেন। মা দিল আফরোজা ভাত নিয়ে বসে থাকেন মাহবুবের জন্য, কিন্তু মাহবুব আর আসবে না। চিরদিনের জন্য চলে গেছে, রেখে গেছে তাঁর সকল স্মৃতি টুকরো।

শহীদ মাহবুব নিলয় সম্পর্কে জানতে চাইলে তাঁর এক প্রতিবেশী চাচা বলেন, "মাহবুব নিলয় ছিল অত্যন্ত ভালো ছেলে। ছোটোবেলা থেকেই খেলাধুলার প্রতি ছিল গভীর আগ্রহ। সে খেলাধুলা করতে ভালোবাসতো এবং প্রায়শই মাঠে সময় কাটাতো।"

শহীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম	: মো: মাহবুব হাসান নিলয়
জন্ম তারিখ	: ১৮.০৭.২০১১
জন্মস্থান	: ব্রজনাথপুর, দোগাছী, সদর, পাবনা
পেশা	: ছাত্র
শ্রেণি	: ৯ম
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	: সিদ্দিক মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, পাবনা
আহত হবার স্থান	: পাবনা ট্রাফিক মোড়, পাবনা
শহীদ হবার স্থান	: পাবনা ট্রাফিক মোড়, পাবনা
আঘাতের ধরণ	: গুলি বিদ্ধ
আক্রমণকারী	: ভাড়ারা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সাইদ খান ও তার সহযোগী নাসির
আহত হবার সময় ও তারিখ	: দুপুর ১২:৩০ মিনিট, ৪ আগস্ট ২০২৪
শহীদ হবার সময় ও তারিখ	: দুপুর ১২:৩০ মিনিট, ৪ আগস্ট ২০২৪
শহীদের কবরস্থান (জিপিএস লোকেশনসহ)	: পাবনা সদর গোরস্থান (২৪.০০৩২৫৩, ৮৯.২৫২১৫১)
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ব্রজনাথপুর, ইউনিয়ন: দোগাছী, থানা: পাবনা সদর, জেলা: পাবনা

পরিবারসংক্রান্ত তথ্য

পিতা	: মো: আবুল কালাম আজাদ
পিতার পেশা ও বয়স	: আনসার বাহিনী, ৬২ বছর
মাতা	: দিল আফরোজা
মাতার পেশা	: গৃহিণী,বয়স, ৫২ বছর।
মাসিক আয়	: ৪০,০০০
আয়ের উৎস	: শহীদের বাবার চাকুরী ও বাসা ভাড়া বাবদ আয়
শহীদের সাথে সম্পর্ক	: পিতা
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ৪

পরিবারের অন্যান্য সদস্য

ভাই : মেহেদী হাসান মিলন, বয়স : ২৭
বোন : ওয়াকিয়া নাজনীন, বয়স ও পেশা : ২৩, ছাত্রী (বিবাহিত)
বোন : মাহবুবা নাজনীন, বয়স ও পেশা : ১৬, ছাত্রী (দশম শ্রেণি)

পরামর্শ

১. শহীদের পরিবারের খোঁজখবর রাখা দরকার

"আমি বাবা-মা'র বড়ো ছেলে, আমার বাবা-মাকে আপনারা দেখে রাখবেন।"

শহীদ মো: জুলকারনাইন

ক্রমিক : ২৭৩

আইডি : রাজশাহী ১৫

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: জুলকারনাইন জেএল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির ছাত্র ছিল। থাকতো সাভারে। তাঁর গ্রামের বাড়ি পাবনার স্বরপ গ্রামে। গ্রামে বৃদ্ধ দাদা, দাদি এবং তিন চাচার পরিবারের বসবাস। জুলকারনাইনের পরিবার ঈদে গ্রামে এলে তাঁর চাচার বাড়িতে থাকেন।

শহীদের বাবা আব্দুল হাই আল হাদি সাভারে একটি ছোট্ট হোমিওপ্যাথির দোকান চালান। তাঁর আয়ের ওপরই নির্ভর করে পরিবারের ভরণপোষণ। বাসা এবং দোকান ভাড়া বাবদ প্রতি মাসে তাঁদের ১২ হাজার টাকা প্রদান করতে হয়।

শহীদ জুলকারনাইন অনেক বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখতো। তাঁর ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন ছিল। নিজস্ব একাডেমিতে নিয়মিত খেলতো। এছাড়া বড়ো ব্যবসায়ী হওয়ার ইচ্ছাও পোষণ করতো। সে বলতো, "আমি কখনো কারও অধীনে চাকরি করব না। যদি চাকরি করতে হয়, তাহলে আমি সেনাবাহিনীতে যোগ দেবো।"

শহীদ জুলকারনাইন শুধু স্বপ্নদ্রষ্টা ছিল না, সে ছিল একজন সংগ্রামীও। শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছিল। স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার প্রশাসনের নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তাঁর ভেতরে ছিল অদম্য সাহস। যখন বাবা তাকে নিষেধ করতেন, তখন সে বলতো, "বাবা, যদি কিছু ঘটে, আমি আবু সাঈদের মতো শহীদ হবো। তুমি তো সারাজীবন আমাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছ, আজ কেন আমাকে থামতে বলছ?"

ঘটনার বিবরণ

শহীদ জুলকারনাইন ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে তাঁর মায়ের কাছ থেকে আন্দোলনে যাওয়ার অনুমতি নেয়। বাবার নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সে বলেছিল, "বাবা, আজ আমি কোনো বাধা মানবো না।"

সেদিন বিকেলে ছাত্র-জনতার সাথে জুলকারনাইন বাইপাইল মোড়ে অবস্থান নেয়। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার পতনের সেই ঐতিহাসিক দিনেও পুলিশ আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর সরাসরি গুলি চালায়। বিকেল ৩টা ৪৫ মিনিটে জুলকারনাইনের গলায় গুলি লাগে। শিক্ষার্থীরা দ্রুত তাকে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে। হাসপাতালে বিকেল ৫টা ৩৭ মিনিটে সংগ্রামী এই তরুণ শাহাদাত বরণ করেন।

শাহাদাতের পূর্বে জুলকারনাইন বলেছিল, "আমি বাবা-মা'র বড়ো ছেলে, আমার বাবা-মাকে আপনারা দেখে রাখবেন।"

ছেলেহারা মায়ের হৃদয় ভাঙা আর্তনাদ যেন থামতে চায় না। তিনি বলেন, "আমার ছেলে সবসময় ঘরেই থাকতো। আমি এখন বারবার ঘরের চেয়ারের দিকে তাকাই, মনে হয় আমার ছেলে বসে আছে।"

জুলকারনাইনের বৃদ্ধ দাদা আব্দুর রহিম শোকের সাগরে ভাসছেন। তাঁর কথাগুলো ভারী হয়ে আসে, "আমার নাতিটা অনেক ভালো ছিল। যখনই গ্রামে আসতো, অনেক চুপচাপ থাকতো। ওরা আমার নিরীহ নাতিটাকে মেরে ফেলল।" তিনি আরো বলেন, "শেষ কুরবানির ঈদে বাড়ি আসছিল, এরপরে আর নাতির মুখ দেখি নাই। আর এখন আমার নাতি আসলো লাশ হয়ে। এত শান্ত শিষ্ট, ভদ্র একটা ছেলেরে ওরা কেমনে গুলি কইরা মাইরা ফেলল!"

শহীদের পিতা দৈনিক সমকালকে বলেন, "আমি নামাজে ছিলাম। ছেলেটা আমার মুখের দিকে এক নজর চেয়ে চলে গেল, আর ফিরে আসলো না। ছেলেটা শরীরে গুলি নিয়েই কবরে চলে গেল, কিয়ামতের দিন গুলি নিয়েই উঠবে। ছেলেকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল, সব শেষ হয়ে গেল।"

শিক্ষার্থীদের এই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ছিল স্বৈরাচার শেখ হাসিনার সরকারের অন্যায়, দুর্নীতি ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে একটি সোচ্চার প্রতিবাদ। শেখ হাসিনার নিষ্ঠুরতা জুলকারনাইনের মতো অনেক স্বপ্নবাজ তরুণের জীবন কেড়ে নিয়েছে।

"আমি নামাজে ছিলাম। ছেলেটা আমার মুখের দিকে এক নজর চেয়ে চলে গেল, আর ফিরে আসলো না। ছেলেটা শরীরে গুলি নিয়েই কবরে চলে গেল, কিয়ামতের দিন গুলি নিয়েই উঠবে। ছেলেকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল, সব শেষ হয়ে গেল।"

আমার মুখের দিকে চেয়ে চলে গেল, আর ফিরল না

■ সাঁথিয়া (পাবনা) প্রতিনিধি

ছেলেকে বললাম বাইরের পরিবেশ ভালো না, মিছিলে যেও না। সে বলল, তুমি নিষেধ কর কেন বাবা, তুমিই তো ছোটবেলা থেকে শিখিয়েছ অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে। তুমি আজ আমাকে বাধা দিও না। আমার ভাইবোনেরা মারা গেছে, আমি বিজয় মিছিলে যাব। আমি নামাজে ছিলাম। ছেলেটা আমার মুখের দিকে এক নজর চেয়ে চলে গেল, আর ফিরে আসলো না। ছেলেটা শরীরে গুলি নিয়েই কবরে চলে গেল, কিয়ামতের দিন গুলি নিয়েই উঠবে। ছেলেকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল, সব শেষ হয়ে গেল।

কেঁদে কেঁদে কথাগুলো বলছিলেন পুলিশের গুলিতে নিহত পাবনার সাঁথিয়ার নন্দনপুর ইউনিয়নের স্বরপ গ্রামের স্কুলছাত্র জুলকারনাইনের (১৭) বাবা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক আব্দুল হাই আল হাদী। নিহত জুলকারনাইন সাভার আশুলিয়া থানার বাইপাইল পলাশ বাড়িতে ভাড়া বাসায় তার বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকত। সে সাভারের পলাশবাড়ি জে.এল মডেল স্কুল অ্যান্ড গার্লস কলেজে নবম শ্রেণির ছাত্র ছিল। দুই ভাই ও এক বোনের মধ্যে সে দ্বিতীয়। ছেলের মৃত্যুর শোকে তার মা হালিমা খাতুন বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন এবং বেশির ভাগ সময় অচেতন হয়ে আছেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঘটনায় সাবেক

নিহত জুলকারনাইন

সাভারে পুলিশের গুলিতে নিহত স্কুলছাত্রের বাবার আহাজারি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগের খবরে গত সোমবার সাভার আশুলিয়া থানার বাইপাইল পলাশবাড়ীতে মিছিলে যোগ দেন জুলকারনাইন। বিকেল ৫টার দিকে জুলকারের বন্ধুরা তার বাবার মোবাইল ফোনে জানায় তাঁর ছেলের গলায় গুলি লেগেছে, তাঁকে দ্রুত এনাম হাসপাতালে আসতে বলে তারা। আব্দুল হাই হাসপাতালে গিয়ে দেখেন, তাঁর ছেলের নিথর দেহ পড়ে আছে। ওইদিন রাতেই তার মরদেহ সাঁথিয়ায় নিজ বাড়িতে আনা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে সাঁথিয়ার স্বরপ গ্রামে নিজ বাড়িতে জানাজা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। তার অকাল মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এবং স্বজনদের আহাজারিতে এক হৃদয়বিদারক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। জুলকারনাইনের বাবা তাঁর ছেলের হত্যাকাণ্ডের বিচার চান।

শহীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম	: মো: জুলকারনাইন
জন্ম তারিখ	: ২৯.০১.২০০৭
জন্মস্থান	: স্বরপ, নন্দনপুর, সাথিয়া, পাবনা
পেশা	: ছাত্র
শ্রেণি	: ৯ম
বিভাগ	: বানিজ্য
বর্ষ	: ২০২৪-২৫
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	: জে.এল মডেল স্কুল অ্যান্ড গার্লস কলেজ।
আহত হবার স্থান	: আশুলিয়া থানার অন্তর্গত বাইপাইল মোড়
শহীদ হবার স্থান	: এনাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
আঘাতের ধরন	: গুলি বিদ্ধ
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হবার সময় ও তারিখ	: বিকাল ৩:৪৫ মিনিট; ৫ আগস্ট, ২০২৪
শহীদ হবার সময় ও তারিখ	: বিকাল ৫:৩৭ মিনিট; ৫ আগস্ট, ২০২৪
শহীদের কবরস্থান (জিপিএস লোকেশনসহ)	: তেতুলিয়া গোরস্থান, পাবনা (২৪.০৭২৬৪৯, ৮৯.৫১৬৯৬৭)
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: স্বরপ, ইউনিয়ন: নন্দনপুর, থানা: সাথিয়া, জেলা: পাবনা, বর্তমান ঠিকানা
বাসা/মহল্লা	: পলাশবাড়ি কাঁঠাল তলা, থানা : আশুলিয়া, জেলা : ঢাকা

পরিবার সংক্রান্ত তথ্য

পিতা	: মো: আ: হাই আল হাদি
পিতার পেশা ও বয়স	: হোমিও ডাক্তার (উগঅঐ), ৫৪ বছর
মাতা	: মোছা: হালিমা খাতুন
মাতার পেশা ও বয়স	: গৃহিণী, ৩৭ বছর
মাসিক আয়	: ২২,০০০/-
আয়ের উৎস	: হোমিও চিকিৎসা
শহীদের সাথে সম্পর্ক	: পিতা
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন

পরিবারের অন্যান্য সদস্য

ভাই: হামজা, বয়স: ৬ বছর, শ্রেণি: প্রথম শ্রেণি
বোন: তোহফা, বয়স ও পেশা : ২৬ বছর, গৃহিণী (বিবাহীতা)

পরামর্শ

১. শহীদ পরিবারকে নিয়মিত ভাতা প্রদান করা
২. ছোট ভাইয়ের পড়াশোনার দায়িত্ব নেওয়া

“মা, তুমি গ্রামে চলে যাও, আমি টাকা পাঠাব”

শহীদ মো: খোকন সরদার
ক্রমিক : ২৭৪
আইডি : রাজশাহী ১৬

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: খোকন সরদারের গ্রামের বাড়ি পাবনার নেউলাইপাড়া। পিতামাতার স্বপ্ন ছিল তাকে পবিত্র কুরআনের হাফেজ বানাবেন। তাই শহীদ খোকনকে ভর্তি করানো হয়েছিল মানিকনগর হাফিজিয়া মাদ্রাসায়। অবসরে একটি মোবাইল সার্ভিসিং-এর দোকানে কাজ শিখতো। ২০ পারা কুরআন মুখস্ত করতে পেরেছিল সম্ভাবনাময় এই কিশোর।

বোন ও কাজিনদের মধ্যে একমাত্র ছেলে খোকনকে সবাই ভালোবাসতো। এজন্যই নাম রাখা হয়েছিল খোকন।

খোকনের পরিবারের আর্থিক অবস্থা ছিল সংকটাপন্ন। সরকারি খাস জমিতে ছোট্ট বাড়ি। তাঁর পিতা-মাতা দুজনেই আশুলিয়ায় গার্মেন্টসে কাজ করতেন। খোকনের ছোটো দুই বোন আজমিন

(৮) ও হুমায়রা (৬), ঢাকায় থাকতো। বৃদ্ধা দাদি থাকেন গ্রামে। পরিবারটি শহীদ খোকনকে একজন প্রখ্যাত আলেম বানানোর স্বপ্ন দেখতেন।

বর্তমানে শহীদের পিতা-মাতার কর্মস্থল বন্ধ অবস্থায় আছে। এখন তাদের কোনো আয়ের উৎস নেই।

চাকরি হারিয়ে স্বপরিবারে পাবনায় গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন শহীদের পিতা-মাতা। তাদের দুটি ছোটো মেয়ে আছে, যারা ঢাকায় একটি স্কুলে পড়তো। কিন্তু গ্রামে ফিরে আসার পর এখনো তাদের কোনো স্কুলে ভর্তি করানো সম্ভব হয়নি।

ঘটনার বিবরণ

জুলাই মাস থেকেই চলছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। ছাত্র-জনতার স্লোগানে উচ্চারিত হচ্ছিল অধিকারের কথা। কেউ অধিকার চাইতে গিয়ে কেউ জীবিকার তাগিদে বাইরে গিয়ে লাশ হয়ে ফিরছিল। ছাত্র, শিক্ষক, আলেম, শ্রমিক, রিকশাচালক, ভিক্ষুক, শিশু-বৃদ্ধ কেউই বাদ যায়নি এ লাশের মিছিল থেকে। ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন 'লং মার্চ টু ঢাকা'-র ডাক দেয়। সকালে মসজিদের মাইক থেকে বারবার লং মার্চে অংশ নিতে ডাকা হচ্ছিল। প্রতিদিনের মতো এ দিনও মাদ্রাসার ছাত্ররা আন্দোলনে যোগ দেয়। খোকনও মাদ্রাসার ছাত্র। মাদ্রাসার সহপাঠীদের সঙ্গে ছিল নিবিড় সম্পর্ক। তাই এ আন্দোলন দেখে সে ঘরে বসে থাকতে পারেনি। খোকন মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের সাথে আন্দোলনে যোগ দেয়। শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে বাইপাইল মোড়ে অবস্থান নেয়। স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার দলীয় পুলিশ আন্দোলন ভণ্ডুল করতে বিনা উস্কানিতে নির্বিচারে গুলি চালায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই মরণঘাতী একটি বুলেট খোকনের পেটে ঢুকে পেছন দিয়ে বেরিয়ে যায়। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ১৬ বছরের এই নির্ভীক তরুণ। ততক্ষণাৎ শিক্ষার্থীরা খোকনকে হাবিব হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তাররা তাকে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্থানান্তর করেন। সেখানে প্রথমে তাকে স্যালাইন দেওয়া হয়। স্যালাইন দেওয়ার সময় খোকন বাবাকে বলেছিল, "আব্বা, আমার খুব ক্ষুধা লেগেছে, আমাকে খাবার দাও!"

কিন্তু স্যালাইন থাকার কারণে তাকে খাবার দেওয়া সম্ভব হয়নি। এরপর মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যেই শহীদ খোকনের জীবন প্রদীপ নিভে যায়। শহীদ খোকন শেষ ক্ষুধাটাও নিবারণ করতে পারেনি। তার আগেই মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়েছে। হাফেজ এই কিশোর গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে দুপুর ১২:৩০ মিনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শহীন হন। শহীদের লাশ গ্রামের বাড়ি নেওলাইপাড়া দারুল বাকি কবরস্থানে দাফন করা হয়।

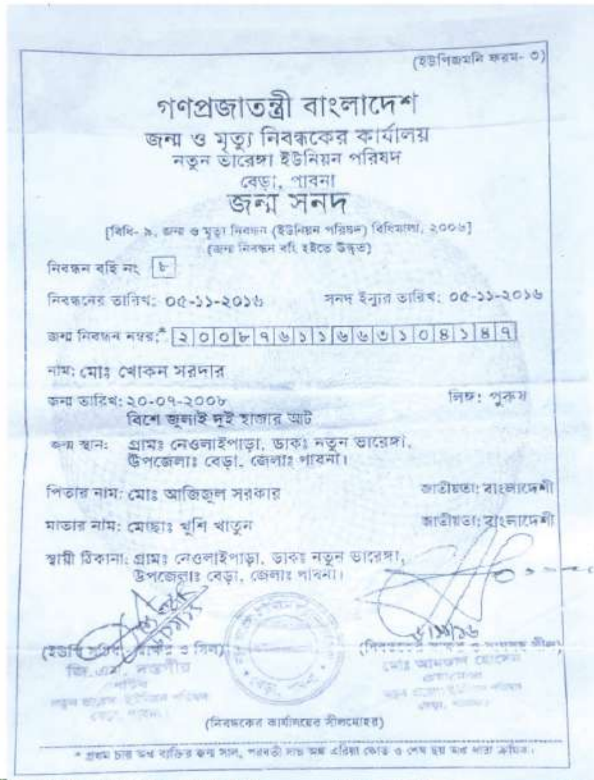
(ইউনিক্রমনি ফরম- ৩)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
নতুন ভারেঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ
বেড়া, পাবনা

জন্ম সনদ

[বিধি- ৯, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (ইউনিয়ন পরিষদ) বিধিমালা, ২০০৬]
(জন্ম নিবন্ধন বহি হইতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নং ৮

নিবন্ধনের তারিখ: ০৫-১১-২০১৬ সনদ ইস্যুর তারিখ: ০৫-১১-২০১৬

জন্ম নিবন্ধন নম্বর:* ২০০৮৭৬১১৬৬৩১০৪১৪৭

নাম: মোঃ খোকন সরদার

জন্ম তারিখ: ২০-০৭-২০০৮ লিঙ্গ: পুরুষ
বিশে জুলাই দুই হাজার আট

জন্ম স্থান: গ্রামঃ নেওলাইপাড়া, ডাকঃ নতুন ভারেঙ্গা, উপজেলাঃ বেড়া, জেলাঃ পাবনা।

পিতার নাম: মোঃ আজিজুল সরকার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: মোছাঃ খুশি খাতুন জাতীয়তা: বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা: গ্রামঃ নেওলাইপাড়া, ডাকঃ নতুন ভারেঙ্গা, উপজেলাঃ বেড়া, জেলাঃ পাবনা।

(নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর)

খোকনের বাবা আজিজুল হক সরদার বলেন, "আল্লাহ আমাকে ধৈর্য দিয়েছিলেন। আমার ছেলের শেষ কথা ছিল, 'আব্বু, আমার ক্ষুধা লেগেছে।' আমি একজনকে দোকান থেকে খাবার আনতে বললাম, কিন্তু নার্স বলল, স্যালাইন লাগানো আছে, খাবার দেওয়া যাবে না। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার আমাকে বললেন, 'আপনার ছেলে মারা গেছে।' আমি হাত তুলে দোয়া করলাম- 'আল্লাহ, তোমার দেওয়া জিনিস তুমি নিয়ে গেছো, আমার কিছু করার নেই।"

খোকনের মা খুশি খাতুন প্রতিদিন ছেলের কথা মনে করে কাঁদেন। তিনি বলেন, "আমি অসুস্থ ছিলাম, আর কাজ করতে পারছিলাম না। খোকন আমাকে বলতো, 'মা, তুমি গ্রামে চলে যাও, আমি টাকা পাঠাব।' কিন্তু আজ আমার ছেলেই নেই।"

এভাবেই শহীদ হলো খোকন, চলেন গেল চিরতরে, রেখে গেলো পরিবার অশ্রু আর বেদনার দীর্ঘ গল্প।

শহীদ খোকনের দাদা আব্দুল হাই সরদার বলেন, "খোকন আমার বংশের একমাত্র নাতি, ওর মৃত্যুর কথা শুনে আমি ওখানেই বেহুশ হয়ে পড়ে যাই। ভাবতাম আমি মারা গেলে আমার নাতি আমার জানাজা পড়াবে, আমার জন্য দোয়া করবে। কিন্তু ওর জানাজাই এখন আমার পড়তে হলো। আমি একজন শহীদের দাদা, এজন্য গর্ববোধ করি। কিন্তু ওর কথা মনে হলে তো ঠিক থাকতে পারি না, এ কষ্টের কথা ক্যামনে বুঝায়ে বলবো?"

গণস্বাস্থ্য সমাজ ভিত্তিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

মৃত্যুর সনদপত্র

রোগীর নাম: Khokon

গ্রাম: Newlapara

Brought dead.

Brought dead

Dr. Rana

শহীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম	: মো: খোকন সরদার
জন্ম তারিখ	: ২০. ০৭. ২০০৮
জন্মস্থান	: নেওলাইপাড় া, বেড়া, পাবনা
পেশা	: শিক্ষার্থী
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	: মানিকনগর হাফিজিয়া মাদ্রাসায়
আহত হবার স্থান	: সাভার বাইপাইল মোড় (আশুলিয়া থানার সামনে)
শহীদ হবার স্থান	: গণস্বাস্থ্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
আঘাতের ধরণ	: গুলিতে জখম
আক্রমণকারী	: ঘাতক পুলিশ
আহত হবার সময় ও তারিখ	: সকাল ১০.৩০ মিনিট; ৫ আগস্ট ২০২৪
শহীদ হবার সময় ও তারিখ	: দুপুর ১২.৩০ মিনিট; ৫ আগস্ট ২০২৪
শহীদের কবরস্থান	: নেওলাপাড়া দারুল বাকি গোরস্থান, পাবনা
স্থায়ী ঠিকানা ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: নেওলাইপাড়া, ইউনিয়ন: নতুন ভারেঙ্গা, থানা: বেড়া, জেলা: পাবনা

পরিবারসংক্রান্ত তথ্য

পিতা	: মো: আজিজুল সরদার
পিতার পেশা ও বয়স	: বেকার, ৩৯ বছর
মাতা	: মোছা: খুশি খাতুন
মাতার পেশা ও বয়স	: গৃহিণী, ৩২ বছর
শহীদের সাথে সম্পর্ক	: পিতা
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ৫ জন

পরিবারের অন্যান্য সদস্য

বোন: আজমিন, বয়স ও পেশা: ৯ বছর, শিক্ষার্থী (১ম শ্রেণি)
বোন: হুমায়রা, বয়স ও পেশা : ৬, শিক্ষার্থী (প্লে)

পরামর্শ

১. শহীদের বাবার জন্য একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
২. পরিবারের জন্য একটি ঘর নির্মাণ করে দেওয়া
৩. শহীদের ছোটো দুই বোনের পড়ালেখার ব্যবস্থা করা
৪. শহীদের মায়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم
مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

মুমিনদের মধ্যে কিছু বান্দা কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যু বরণ করেছে (শাহাদাত বরণ) এবং কেউ কেউ মৃত্যুর জন্য প্রতিক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি।

-সুরা আহযাব-২৩

জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

চতুর্থ খণ্ড

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী